সেবা রোমান্টিক

অরণ্যের গান

দুই খণ্ড একত্রে

খন্দকার মজহারুল করিম

সেবা প্রকাশনী

সেবা রোমান্টিক

অরণ্যের গান

[দুই খণ্ড একত্রে]

খন্দকার মজহারুল করিম

সুন্দরবনে গবেষণার কাজে এসে রহস্যজনক ভাবে
মারা যান ড. আবুল হাশিম। মেয়ে, তারানা,
কঠিন পণ করেছে: যেমন করে হোক,
বাবার মৃত্যুর কারণ সে বের করবেই।
গাইড ফারুকের সাহায্য নিয়ে কাঙ্গায় এসে
হাজির হলো তারানা।
ওখানে ওদের ঘিরে ধরল একদল দুষ্কৃতকারী।
ওদের একজনের গলায় ঝুলছে ড. হাশিমের লকেট।
মহা বিপদেই পড়েছে ওরা।
সাপ বাঘ ঝড় জলোচ্ছ্বাস…
আর জলোচ্ছ্বাসের মতই এলো ভালবাসা…

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

সেবা রোমান্টিক

অরণ্যের গান

(দুই খণ্ড একত্রে)

খন্দকার মজহারুল করিম

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 - 16 - 0090 - 0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯০
দ্বিতীয় প্রকাশ: ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আসাদুজ্জামান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন : ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ARONNYER GAN
A Novel
By: KHANDKAR MAZHARUL KARIM

সেবা প্রকাশনী

ছাব্বিশ টাকা

কালাম ও শাহানা—
প্রীতিভাজনেষু।

ক'টি সেবা রোমান্টিক

খন্দকার মজহারুল করিম: সেই চোখ, তোমার জন্যে, জানিনা কখন, আমরা দুজনে, চন্দনের বনে, নও শুধু ছবি, সোনালী গরুল, অনুরূপা, তুমি আছ আমি আছি, এক প্রহরের খেলা, দূর আকাশের তারা, অরণ্যের গান ১ ও ২, অতল জলের আহ্বান, একটি মাধবী, হাতে রাখো হাত, একটুখানি চাওয়া, ছায়া ঘনায়, বর্ষারাতের শেষে, ময়ূরী রাত, নীল ধ্রুবতারা, ফাগুনের ফুল, হংস পাখায় লেখা, আমার এ ভালবাসা, কেন ডাকো, সন্ধ্যার মেঘমালা, এসো আমার ঘরে; ঝড়ের রাতে, তোমাকে ভালবেসে, কঙ্কাবতী, করবী গরবিনী, কথা রাখো, জোনাকি ঝিকিমিকি। **রোকসানা নাজনীন:** বন্দী অপ্সরা, ফিরিয়ে দাও ১, ২, অন্ধকারে একা ১, ২, স্বপ্নপুরুষ, এ মণিহার। **বাবুল আলম:** স্বপ্ন নিয়ে, লাল রিবন, সংশয়। **মোস্তাফিজুর রহমান:** ছলনাময়ী। **বিশু চৌধুরী:** অচেনা পরবাসী। **খসরু চৌধুরী:** তবু অচেনা। **শেখ আবদুল হাকিম:** নগ্ন প্রাচীর ১, ২, সে আমার, একা আমি, অন্তরা, হায় চিল, রজনী চঞ্চলা, বান্ধবী, সুচরিতাসু, মধুযামিনী, তমা, তুমি চিরকাল, কি শুভক্ষণে, তুমি সুন্দর, প্রিয়, যে ছিল আমার, প্রথম প্রেম, চন্দ্রাহত, হৃদয়ে তুমি, দাও বিদায়, কে তুমি এলে। **শাহরিয়ার শামস:** স্বপ্নের অপরাহ্ণ। **মিলা মাহফুজা:** তোমার দু-চোখে, সুধাবিষে। **হেলেন নওশীন:** নিঝুম।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

অরণ্যের গান ১

এক

হোটেল শিবসার সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এল তারানা হাশিম। পায়ে ক্রেপ সোলের জুতো, হাঁটতে শব্দ হচ্ছে না। পরনে ঢিলা সালোয়ার-কামিজ। এই পোশাকেই সে বেশি স্বচ্ছন্দ। বিশেষ করে যে-কাজে এসেছে, তাতে আর যে-পোশাকই চলুক, শাড়ি চলবে না। এখান থেকে মাত্র দশ মাইলের মধ্যেই সুন্দরবনের শুরু। এই অজানা, অচেনা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে পেরোতে হবে প্রায় ষাট মাইল পথ। পৌঁছুতে হবে হিরণ পয়েন্ট থেকে ষোলো মাইল পুবে, গভীর জঙ্গলের ভিতরে, যেখানে মানুষ যেতে ভয় পায়। তারানার বেড়াতে ভাল লাগে। ছোটকাল থেকেই বেড়াচ্ছে। ওর বাবা ছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ। সুযোগ পেলেই ওকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। দেশ-বিদেশের অন্তত পঞ্চাশটা শহর দেখার সৌভাগ্য হয়েছে ওর। বাদ দেয়নি মিশরের পিরামিড, আগ্রার তাজমহল, বার্মার প্যাগোডা। ষোলো বছর বয়সে তাঁর সঙ্গে শেষবারের মত গিয়েছে মালদ্বীপে। এরপর বাবা আর তাকে সঙ্গে নেননি। বলেছেন, 'অনেক বড় হয়ে গেছিস তুই। এবার অপেক্ষা কর, তোর বিয়ে দিই। বরের সঙ্গে বেড়াবি।'

দশটা বছর কেটে গেল। বাবা ব্যস্ত রইলেন তাঁর গবেষণায়, তারানা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স শেষ করল। ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রি নিয়ে যখন নিয়মিতভাবে টেলিভিশনের সিরিজ নাটকে অভিনয় করছে, আর ভাবছে ডক্টরেট করবে, তখন ছোট্ট একটা সংবাদ এল বজ্রাঘাতের মত। ছাব্বিশ বছরের তারানা জানে, তার বিয়ের কথা আর কখনও কেউ ভাববে না, তাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতেও যাবে না। সে নিজেও বেড়ানোর আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে চিরদিনের জন্যে। খুব সম্ভব এটাই তার শেষ ভ্রমণ।

মংলা বন্দর ভাল লাগল তারানার। বন্দরের নাম শুনলেই এক নোংরা, গা ঘিন-ঘিন করা শহরের কথা মনে হয়। কিন্তু মংলা ব্যতিক্রম। সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠছে শহরটা। চওড়া রাস্তা, দু'পাশে নতুন নতুন বাড়িঘর, অফিস, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর হোটেল। ট্যুরিস্ট, শিল্পোদ্যোক্তা আর ব্যবসায়ীদের ভিড় চোখে পড়ে।

কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও নৌকা ভাড়া করে ঘুরল তারানা। বিচিত্র অনুভূতিতে ছেয়ে গেল মন। একটা বন্দর গড়ে ওঠা মানে শুধুই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নয়, আরও অনেক কিছু। মানুষের একটা নতুন মিলনকেন্দ্র গড়ে ওঠা; বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন শহরের হরেক প্রকৃতির মানুষের সমাবেশ। তারানা মুগ্ধ চোখে পথের সেইসব মানুষদের মুখের পানে তাকাল, কান পাতল বিচিত্র সব ভাষা

শোনার আশায়।

হোটেলে ফিরে নিচের তলায় লবির শেষ প্রান্তে রেস্তোরাঁর দিকে এগিয়ে যায় তারানা। একজন গাইড দরকার। মংলা পর্যন্ত একা আসতে পেরেছে, কোন অসুবিধে হয়নি। কিন্তু এরপর গাইড ছাড়া আর এগুতে পারবে না। এখানে আসার পর থেকেই সবার মুখে একজনের নাম শুনছে: আনোয়ার ফারুক। ওয়েটার থেকে শুরু করে পুলিশের এস. পি. পর্যন্ত—সবাই প্রথমে উচ্চারণ করেছেন ওই নাম। সবচেয়ে দুর্গম জায়গাগুলোতে তার যাতায়াত। ভয়-ডর বলে কিছুই নাকি নেই তার! যেসব জায়গার নাম শুনেই লোকে আঁতকে ওঠে, সেসব জায়গায় গাইড হিসেবে শুধু সে-ই যায় ট্যুরিস্টদের সঙ্গে। কাল রাতেই তারানা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ওই লোককে সঙ্গে নেবে। টাকার কথা ভাববে না। সে যা চায়, দেবে। একটা টেবিল দখল করে বসল তারানা।

একটা বাজে। রেস্তোরাঁয় ভিড় নেই। বোর্ডারদের খাওয়ার সময় হয়নি এখনও। একজন ওয়েটার এগিয়ে এল তার দিকে। হাতের ইশারায় তারানা জানাল, সে একজনের জন্য অপেক্ষা করবে। হোটেল ম্যানেজার তাকে বলেছিলেন, সোয়া একটা থেকে দেড়টার মধ্যে হোটেলে খেতে আসে ফারুক।

ব্যাগ খুলে চিরুনি বার করল তারানা। চুল আঁচড়ে নিয়ে ঘাড়ে, মুখে পাউডার বুলাল। রিসেপশন ক্লার্ক তাকিয়ে আছে তার দিকে। সে কি টিভি দেখে? চিনতে পেরেছে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় টিভি সিরিয়ালের নায়িকাকে? দৃষ্টি বদলে যায়। মুখ ঘুরিয়ে মেনু বই তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করল তারানা।

মিনিট দশেক পর কাঁধ ঘুরিয়ে চারদিকে তাকাল সে। চার-পাঁচজন আগন্তুক ঢুকে পড়েছে রেস্তোরাঁয়। এদের মধ্যে আনোয়ার ফারুক আছে? দক্ষিণের জানালার লাগোয়া টেবিলে দুর্ধর্ষ চেহারার এক যুবককে দেখতে পায় সে। লোকটার যে-বিবরণ শুনেছে, তার সঙ্গে মিল আছে ওই যুবকের চেহারার। তারানা উঠে পড়ল। ওয়েটারকে ডেকে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, উনিই কি আনোয়ার ফারুক সাহেব?'

ওয়েটার যুবকের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলায়। 'না, ম্যাডাম, ফারুক সাহেব বসেছেন আপনার পেছনের টেবিলে। ওই যে!'

তারানা অবাক। ওই নিরীহ, ভালমানুষ গোছের লোকটা আনোয়ার ফারুক! ভাবাই যায় না। তারানা লোকটার দিকে ভাল করে তাকাল। অনেক মানুষকেই প্রথম দর্শনে ভালমত বুঝতে পারা যায় না; ফারুক ঠিক সে-ধরনের। কিন্তু এখন তারানার মনে হচ্ছে, লোকটা ভাল। নির্ভরযোগ্য।

ওয়েটার অনুচ্চ স্বরে বলল, 'হ্যাঁ, ম্যাডাম, উনিই মিস্টার আনোয়ার ফারুক।'

আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় তারানা। এগিয়ে যায় আনোয়ার ফারুকের টেবিলের দিকে। টেবিলে খাসির ভুনা মাংস আর গোটাকয়েক চাপাতি। একমনে খাচ্ছে সে। বয়স বত্রিশ-চৌত্রিশের মাঝামাঝি কোথাও হবে। তার ফ্লানেলের শার্টের দুটো বোতাম খোলা। বুকের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছে তারানা। বুঝতে পারছে, ওর গায়ের রং একসময় ফর্সা ছিল, রোদে পুড়ে লালচে হয়ে গেছে। মাথা ভর্তি কোঁকড়ানো চুল। তার ভিতরে বোধহয় কিছু পয়সাও রাখা চলে। সরল, সাদাসিধে

মুখে একজোড়া অন্তর্ভেদী চোখ। পেশিতে শক্তির স্পষ্ট প্রমাণ। ফারুক মুখ তুলল। পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল তারানার দিকে। তারানা বিব্রত বোধ করে।

ফারুক চোখ সরাল না। বরং খাওয়া বন্ধ করল। তার টেবিলে পেট ছুঁইয়ে দাঁড়াল তারানা। 'আপনিই আনোয়ার ফারুক?'

ফারুকের কপালে একসঙ্গে তিনটে ভাঁজ পড়ল। তারপর ভাঁজের সংখ্যা বাড়ল। বিরক্তির ভাব স্পষ্ট। অন্যের মুখে নিজের নাম শুনতে কার না ভাল লাগে? কিন্তু এ-লোকটা ব্যতিক্রম। প্রথম থেকেই তারানা তার কাছে অনাহূত।

'হ্যাঁ। কেন, বলুন তো?'

তারানা চারপাশে চোখ বুলায়। রেস্তোরাঁর অন্য খরিদ্দাররা কেউ এদিকে তাকাচ্ছে না, নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। শুধু ওই রিসেপশন ক্লার্কের মুখেই যত আগ্রহের ছাপ। চোখ ফেরাচ্ছে না সে তারানার দিক থেকে। কথাবার্তা তাড়াতাড়ি সারা দরকার, কিন্তু লোকটার দিক থেকে এমন শীতল ব্যবহার সে আশা করেনি। শক্ত হতে হবে। নার্ভাস হওয়া চলবে না। তারানা হাতগুলো টেবিলের ওপর রাখল।

'আমার নাম তারানা হাশিম।'

ভেবেছিল, এবার চিনতে পারবে। টিভিতে অনেকগুলো নাটকে অভিনয় করেছে তারানা। মংলার লোকেও টিভি দেখে। কিন্তু কারও মুখ দেখে মনে হয়নি, তাকে কেউ চিনতে পেরেছে। অবশ্য তারানা এতে অবাক হয়নি। এমন তো হতেই পারে! অনেক সময় পর্দার প্রিয়, পরিচিত মুখ বাস্তবে দেখে চিনে উঠতে কষ্ট হয়। কিন্তু নাম বলার পরও লোকটা তাকে চিনতে পারল না দেখে তারানা একটু অবাক হলো। ও কি টেলিভিশন দেখে না? সিনেমা-থিয়েটার বিষয়ক পত্রিকার পাতাও ওল্টায় না?

'আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'বসতে বলবেন না?'

এতক্ষণে যেন ভদ্রতার কথা মনে পড়ল ফারুকের। বলল, 'ও, হ্যাঁ, বসুন।'

তারানা চেয়ার টেনে বসল। 'আজ বেশ গরম!'

ফারুক বলল, 'কোল্ড ড্রিংকস্ চলবে?'

তারানা উত্তর দেবার আগেই দেখল, আনোয়ার ফারুক ওয়েটারকে ইঙ্গিতে ডাকছে। কোল্ড ড্রিংকস্-এর অর্ডার দিচ্ছে।

'আমাকে আপনি চেনেন?' নিরাসক্ত সুরে ফারুক প্রশ্ন করল।

তারানা বলল, 'আগে চিনতাম না। এখানে এসে আপনার কথা শুনেছি।'

ফারুক রুটির টুকরো মাংসের ঝোলে ডুবিয়ে মুখে পুরল। একটু চিবিয়ে গালের একপাশে ফেলে বলল, 'গাড়ির ড্রাইভারদের কাছ থেকে?'

'না। হোটেলের ম্যানেজার বলেছেন আপনার কথা। এখানকার প্রত্যেকেই আপনার ভক্ত। সবার মুখেই আপনার নাম। শুনলাম, রোজ এই সময়ে এই রেস্তোরাঁয় খেতে আসেন।'

ওয়েটার কোকাকোলার বোতল, গ্লাস আর আইস কিউব রেখে গেল।

'নিন।'

তারানা গ্লাসে কোকাকোলা ঢেলে বরফ মেশাল। একবার চুমুক দিয়ে গ্লাস

নামিয়ে রাখল। আনোয়ার ফারুক আবার খাওয়ায় মন দিয়েছে।

'আপনাকে দেখে ঠিকাদার কিংবা ব্যবসায়ী, কোনটাই মনে হচ্ছে না। শুধু শুধু কেউ এখানে ট্যুরেও আসে না। আপনার আসার কারণটা জিজ্ঞেস করতে পারি?' মাথা উঁচু না করেই জিজ্ঞেস করল ফারুক।

তিন সেকেণ্ড নীরব রইল তারানা। তারপর বলল, 'আমি কাঙ্গা যেতে চাই।'

খাওয়া ফেলে ফারুক আবার তারানার দিকে তাকাল। ধীরে ধীরে বলল, 'এ-জন্যেই আমার কাছে এসেছেন?'

তারানা কোকাকোলার গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলল, 'বুঝতেই পারছেন।'

ফারুক নীরবে মাথা দোলাল।

তারানা চমকে ওঠে। 'না মানে?'

ফারুক চাপা স্বরে দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, 'ট্যুরিস্টদের কাঙ্গা পয়েন্টে নিয়ে যেতে আপত্তি আছে আমার।'

হতাশা ফুটে ওঠে তারানার মুখে। মনে হলো, লোকটা তার কথা শেষ করে ফেলেছে। কিন্তু তারানা এত সহজেই হার মানতে পারে না। বিড়বিড় করে বলল, 'কেন, জানতে পারি?'

'কাঙ্গা পয়েন্ট খুব খারাপ জায়গা।'

'তবু আমি যেতে চাই।'

'মাফ করবেন। অন্য কোন গাইডকে বলে দেখুন।'

তারানা মিনতি মাখানো চোখে ফারুকের দিকে তাকাল। 'দেখুন, আমি অনেকের সঙ্গে কথা বলেছি। আপনি ছাড়া অন্য কেউ এ-দায়িত্ব নিতে রাজি হবে না।'

খাওয়া শেষ করে ফারুক একটা টুথ পিক তুলে নিল। তারানা বিব্রত স্বরে বলল, 'যদি টাকার কথা ভাবেন, তো বলতে পারি···'

ফারুক বাধা দিয়ে বলল, 'টাকার কথা হচ্ছে না। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আপনার অনেক টাকা। এক কাজ করুন না। হিরণ পয়েন্ট থেকে বেড়িয়ে চলে আসুন। কাল সকালে "আনন্দ ভ্রমণ লিমিটেডের" একটা দল যাচ্ছে। যদি চান, ওদের সঙ্গে যাবার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি।'

'আমি কাঙ্গা পয়েন্টেই যাব, আনোয়ার ফারুক সাহেব।'

হাত ঝাড়ার ভঙ্গি করে ফারুক বলল, 'ওখানে আমি ট্যুরিস্টদের নিয়ে যাই না। খুবই বিপজ্জনক জায়গা। মেয়েদেরকে নিয়ে যাবার তো প্রশ্নই ওঠে না। আপনার সঙ্গে কে আছেন?'

'কেউ নেই। একা।'

ফারুক ভাল করে তাকাল তারানার দিকে। তারানা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে।

'আমি লিখিত বিবৃতি দিতে রাজি। আমার কোন বিপদ ঘটলে আপনার বা আপনার সংস্থার কোন দায়িত্ব থাকবে না। কিন্তু কাঙ্গায় আমি যাবই। আপনি অমত করবেন না, ফারুক সাহেব।'

ফারুক অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে তো বলেছি, ওখানে কোন ট্যুরিস্টকে নিয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কেন নয়? আপনি নিজে তো যাচ্ছেন সেখানে!'

ফারুক কঠোর দৃষ্টিতে তারানার দিকে তাকাল। তারানার মনে হলো, আগুন বেরুচ্ছে লোকটার চোখ থেকে। পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সে।

'অনেক খবরই রাখেন দেখছি।'

তারানা সুযোগ পেয়ে বলল, 'খবরটা সত্যি হলে আমাকে নিয়ে যেতে আপত্তি করবেন না নিশ্চয়ই!'

ফারুক বলল, 'আমি যাব নিজের কাজে। বেড়াতে নয়, একেবারে অন্য উদ্দেশ্যে। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে সেটা পণ্ড করতে চাই না।'

তারানা ছলছল চোখে ফারুকের দিকে তাকাল। 'কেন কাঙ্গায় যেতে চাই, শুনলে আপনি আপত্তি করতে পারতেন না।'

ফারুকের ভাবান্তর ঘটল না। 'সুন্দরবন এক রোমান্টিক জায়গা। একে ঘিরে অনেকের অনেক গল্প ছড়িয়ে আছে। আপনার গল্প অন্য একদিন শুনব।'

তারানা তেতে উঠল। 'গল্পটা আমার নয়, ফারুক সাহেব, আমার বাবার। ড. আবুল হাশিমের। কাঙ্গায় পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে রহস্যজনকভাবে খুন হয়েছেন তিনি। আমি তাঁর কবর দেখতে চাই।'

ফারুক উঠতে যাচ্ছিল। স্থির হয়ে বসল। মাথা নিচু করল। বলল, 'ড. আবুল হাশিম আপনার বাবা?' মাথা তুলে ওয়েটারকে ডাকল সে। 'দু'কাপ কফি আনো।'

তারানা বাধা দিয়ে বলল, 'আমি এখনও লাঞ্চ করিনি। আপনার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

'ও! মাফ করবেন। ওয়েটার, এই লেডির জন্যে খানা আনো।'

'খানার চেয়ে অনেক জরুরী বিষয় আমার কাঙ্গা ট্যুর। বাবা মৃত্যুর আগে আমাকে চিঠি লিখে মংলায় আসতে অনুরোধ করেছিলেন। আমি তখন সিরিজ নাটকে অভিনয় করছি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আসতে পারিনি। কে জানে, যদি আসতে পারতাম, হয়তো এভাবে প্রাণ খোয়াতেন না বাবা।' তারানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'আপনি সিরিজ নাটকে অভিনয় করেন?' প্রশ্ন করল ফারুক। 'টেলিভিশনে?'

'হ্যাঁ।'

ফারুকের কৌতূহল লক্ষ করল তারানা। কিন্তু সেটা সামান্যই। মুহূর্তের মধ্যেই তার উৎসাহ ফুরিয়ে গেল।

তারানা বলল, 'প্রযোজক আসিফুল হক চৌধুরী আমাকে পরামর্শ দিলেন নাট্যকার আক্কাস ফিরদাউস রাজার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সিরিজ নাটকের অভিনেত্রীকে ছুটি দেবার ক্ষমতা শুধু নাট্যকারের। দেখা করলাম তাঁর সাথে। তিনি কথা দিলেন, একটা ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু তার আগেই প্রয়োজন ফুরোল। প্রেসিডেন্টের শোকবার্তা এনে আমার হাতে দিলেন তাঁর বিশেষ দূত। জানতে পেলাম, কাঙ্গার গভীর জঙ্গলে আকস্মিকভাবে মৃত্যু হয়েছে বাবার।'

তারানার দু'চোখে টলমল করে উঠল বেদনার জল। কথাটা বলার সময় অন্তরের চোখ দিয়ে সে ঘটনাটা দেখতে পায়। নৃশংস ঘাতকের গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছেন সিংহ পুরুষ ড. আবুল হাশিম। সারাজীবন শুধু জ্ঞানের সাধনা করেছেন

ভদ্রলোক; কখনও কোন শত্রু ছিল না তাঁর। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সেই নির্বান্ধব পরিবেশে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন, একা। তারানা অনুভব করল, তার দু'গালে উষ্ণ অশ্রুর ধারা নামছে এঁকেবেঁকে। মৃত্যুপথযাত্রী বাবাকে যদি একবার দেখতে পেত সে! কিন্তু সেটা দূরে থাক, ড. আবুল হাশিমের মৃতদেহ সভ্য লোকালয়ে নিয়ে আসাও সম্ভব হয়নি কারও পক্ষে। নৌবাহিনীর এক বিশেষ দল অতি কষ্টে সেখানে পৌঁছে মৃতদেহ সমাহিত করতে পেরেছে মাত্র।

ফারুক তাকিয়ে রইল সদ্য পরিচিতা মেয়েটির দিকে। তার গভীর, কালো চোখে বেদনার নীল ছায়া। ড. আবুল হাশিম ফারুকের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন একসময়। দশ বছরের পেশাগত জীবনে এমন অদ্ভুত সফরসঙ্গীর সঙ্গে আর কখনও পথ চলেনি সে। তারানার চোখের দিকে তাকিয়ে সেই উদার, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা, জ্ঞানতাপস নিরলস কর্মী পুরুষকে দেখতে পাচ্ছে ফারুক। অসময়ে স্ত্রীকে হারিয়েছিলেন তিনি। তাঁর জীবনের অবলম্বন ছিল দুটো। মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে জ্ঞান সাধনা করা আর এই মা-হারা মেয়েটিকে রোজ চিঠি লেখা। বলতেন, 'মেয়ের কাছে লেখা চিঠি জোড়া দিয়েই পণ্ডিত নেহেরু রচনা করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাস। আমি যদি সেভাবে সুন্দরবনের ইতিহাসও খানিকটা লিখতে পারি, জীবনটাকে ধন্য মনে করব।' জীবনের শেষদিকে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিলেন আত্মভোলা ডক্টর। কাঙ্গা মোহনার কাছে এক অতি প্রাচীন, সমৃদ্ধ জনপদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছিলেন। মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত শুরু করলেন জঙ্গলের নানা দুর্গম জায়গায়। ফারুক অনেক সময় বাধা দিয়েছে। শোনেননি জ্ঞানতাপস। হিরণ পয়েন্টের ডাক বাংলোয় বসে যখন তাঁর অপঘাতে মৃত্যুর খবর পেল, তখন একটুও অবাক হয়নি সে। মনে মনে এরকম একটা ঘটনার জন্যেই বোধ হয় অবচেতন মনে সে তৈরি হচ্ছিল। ওইসব জায়গায় যাবার উপযোগী সরঞ্জাম না নিয়েই ড. হাশিম অভিযানে বেরিয়ে পড়েছিলেন। একটা অমূল্য জীবনের ইতি ঘটল অকালে। তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যও সমাহিত হলো কাঙ্গার মাটির নিচে। কেউ জানে না, ঠিক কি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। আজ একই ভুল করতে যাচ্ছে তাঁর মেয়ে। বাপের মতই জেদি, একগুঁয়ে, অকপট। ফারুক ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইল তারানার দিকে। টিভিতে নাটক করে এই মেয়ে! সিরিজ নাটক! এসব নাটকের পাত্র-পাত্রীরা খুব জনপ্রিয় হয়ে থাকে।

'ভালই তো ছিলে ওসব নিয়ে! বাবার কবর দেখার ভূত ঘাড়ে চাপল কেন হঠাৎ? বাবার মতই প্রাণটা খোয়াতে চাও নাকি?' মনে মনে বলল ফারুক।

মেয়েটা অবশ্য বেশ সুন্দর, ফারুক স্বীকার করতে বাধ্য। সে টেলিভিশন দেখে না। পর্দায় তাকে কেমন দেখায়, সে জানে না। কিন্তু বাস্তব জীবনে নায়িকাটি পরমাসুন্দরী। এমন একটা মেয়েকে জেনেশুনে বাঘের মুখে ঠেলে দেয়ার কোন মানে হয় না।

ফারুক ধীরে ধীরে বলল, 'আপনার বাবার মৃত্যু দুঃখজনক। আমিও খুব কষ্ট পেয়েছি। কিন্তু কাঙ্গায় গিয়ে এখন কোন লাভ নেই, মিস তারানা হাশিম।'

কাঁপা কাঁপা গলায় দীর্ঘশ্বাসের শব্দে তারানা বলল, 'বাবার কবর দেখব। বিদায় জানাব।'

ফারুক ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। 'আপনাকে আমি ভাল করে চিনি না, জানি না। তবু একটা কথা বলি, মিস তারানা হাশিম, ব্যাপারটা মেলোড্রামাটিক হয়ে যাচ্ছে।'

তারানা আহত দৃষ্টিতে ফারুকের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফারুক ঢোক গিলল। 'আপনার সঙ্গে এভাবে কথা বলার অধিকার অবশ্য আমার নেই। কিন্তু ভেবে দেখুন…'

বাধা দিল তারানা। তার চোখে এখন অন্য এক ধরনের দ্যুতি। 'আমার এ-প্রতিক্রিয়া একজন কন্যার; অভিনেত্রীর নয়।'

তারানার চোখ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে আনল ফারুক। টিকাল নাক, পুষ্ট ঠোঁট, মসৃণ গলা আর চোখ-ধাঁধানো বাদবাকি সম্পদে সমৃদ্ধ তার তনুদেশ। ওর শরীরের বেশির ভাগটাই টেবিলের আড়ালে, তবু অনুমান করতে পারছে ফারুক। কয়েক মিনিট আগের মুহূর্তটার কথা মনে করতে চেষ্টা করল। সুন্দর, লম্বা দুখানি পা ফেলে এগিয়ে আসছে এক নারী। তখন জানত না, সে ড. আবুল হাশিমের মেয়ে। কোন শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির সন্তানের প্রতি মানুষের মমতা জাগা স্বাভাবিক। ফারুকের মমতা জাগছে তারানার প্রতি।

'দূর থেকেও একজন মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো যায়, মিস তারানা হাশিম। কী হবে অকারণে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে?'

কপালের ওপর এক গোছা চুল এসে পড়েছিল। সজোরে মাথা ঝাঁকিয়ে সেগুলো মাথার পেছনদিকে সরিয়ে তারানা বলল, 'আরও একটা উদ্দেশ্য আছে আমার। আমি জানতে চাই কাঙ্গায় তিনি কী আবিষ্কার করেছিলেন! কেন, কীভাবে মারা গেছেন! আমার তো মনে হয়, তিনি খুন হয়েছেন।'

'খুন হয়েছেন কিনা কে জানে! হয়তো স্বাভাবিকই ছিল মৃত্যুটা।'

'আপনিও তো সঠিক কিছু জানেন না। কেউ জানে না। তাই নিজেই যেতে চাই কাঙ্গায়। জানার চেষ্টা করতে চাই।'

'দেখুন, আমি এসব জটিল ব্যাপারে জড়াতে চাই না।' কথাটা নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বললেও ফারুকের সমব্যথী কণ্ঠস্বর তারানার কান এড়াল না। ফারুকের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইল স।

'আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি,' নরম সুরে বলল তারানা, 'ধরুন, ড. আবুল হাশিম আমার নয়, আপনারই বাবা। কী করতেন আপনি? এটাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে মেনে নিতেন? নাকি, যে-কোন মূল্যে আসল তথ্য খুঁজে বের করতে চেষ্টা করতেন?'

এতক্ষণে ফারুকের ঠোঁট সামান্য ফাঁক হয়ে হাসি বেরুল। 'আমি আলেয়ার পেছনে ছুটতে পছন্দ করি না। সহজভাবেই নিতাম ব্যাপারটাকে।'

'কিন্তু আমি এত সহজভাবে নিতে পারছি না। অলরেডি কয়েকটা তথ্য পেয়েছি। সেগুলো খটকা লাগার মত।'

'যেমন?'

'বাবার এই হঠাৎ মৃত্যুর কোন তদন্ত হয়নি। কিন্তু কর্তব্যরত কোন সরকারি কর্মকর্তার মত্য হলে তদন্ত হবেই। এটা নিয়ম। তা ছাড়া যেখানে বাবার লাশ

পাওয়া যায়, সেখান থেকে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল বেশ দূরে। কোন এক্সপ্লোরেশন হয়নি সেখানে।'

চমকে উঠেছে ফারুক। তারানা স্পষ্ট দেখতে পায়।

'এসবই সত্যি। কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে?'

'খুলনার স্পেশাল ব্রাঞ্চের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বলেছেন আমাকে।'

মাথা নিচু করে নীরবে অনেকক্ষণ বসে রইল ফারুক। এ-মেয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া খুব সহজ হবে না।

'তার মানে এটা মেনে নিচ্ছেন যে আমার সামনে একটা পথই খোলা আছে! সেটা বাবার পথ ধরেই কাঙ্গার দিকে এগিয়ে যাওয়া···'

'আর বাবার মতই বেঘোরে প্রাণ হারানো?'

তারানা দ্রুত ফারুকের চোখের দিকে তাকাল। এটা কি শুধুই কথার পিঠে কথা, নাকি নির্মম সত্য? সে আবার স্মরণ করিয়ে দেয় ফারুককে। 'আপনি নিজে কিন্তু যাচ্ছেন।'

'আমি একজন প্রফেশনাল। বনে-বাদাড়ে ঘুরে রুজি রোজগার করি। আপনার বাবা অ্যাডভেঞ্চার করতে গিয়ে মারা গেছেন, আপনিও একই পরিণতির দিকে এগুতে চাইছেন।'

'আমার বাবা মারা যাননি, ফারুক সাহেব, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। আমি চাই তাঁর হত্যাকাণ্ডের কারণ খুঁজে বের করতে।'

বিরক্তির সঙ্গে ফারুক বলল, 'যা-ই হোক, সে ব্যাপারে আমি আর তর্ক করতে চাই না, কিন্তু এ-ব্যাপারে আর কোন অনুরোধ করবেন না। সুন্দরবন খুব খারাপ জায়গা।'

'ভয় দেখাচ্ছেন? ভেবেছেন আমি পিছিয়ে যাব?'

'কিছুই ভাবিনি আমি। শুধু এই ভয়ঙ্কর জায়গাটা সম্পর্কে মন্তব্য করেছি।' কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর ফারুক আবার বলল, 'মিস তারানা হাশিম, বুঝতে চেষ্টা করুন। আমি আপনার বাবার অতি প্রিয় মানুষ ছিলাম, তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম। তিনি দাবি করেছিলেন, কাঙ্গার কাছে এক প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার নিদর্শন পেয়েছেন। এসব শুনে লোকে খুব হেসেছে, পাগল বলেছে তাঁকে। কিন্তু আমি জানি, তিনি কত উঁচুদরের মানুষ! কোন প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন যদি তিনি আবিষ্কার করেও থাকেন, সেটা শুধু অন্য প্রত্নতত্ত্ববিদদের আগ্রহের বিষয় হতে পারে। তার জন্যে তিনি খুন হবেন কেন? আসল কথা, কাঙ্গা সুন্দরবনের সবচেয়ে রহস্যময়, বিপজ্জনক এলাকা। জায়গাটা সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানতে পারিনি। আপনার বাবাকে বারবার সাবধান করেছি, শোনেননি।'

'এখন আমাকেও সাবধান করছেন?'

'দ্যাটস্ রাইট। মংলায় এসেছেন, ভাল কথা। শিবসা হোটেলটা চমৎকার। খাওয়া-দাওয়া করুন, বন্দর দেখুন। সাম্পান ভাড়া করে এদিক-ওদিক বেড়িয়ে আসতে পারেন। এখানে অসহায়, এতিম বাচ্চাদের জন্যে একটা স্কুল আর হাসপাতাল খোলা হয়েছে। দেখে আসুন। ড. আবুল হাশিমের নামে কিছু চাঁদা দিতে ভুলবেন না। ফটোগ্রাফার ডেকে কয়েকটা ছবি তুলিয়ে নিন। তারপর বাড়ি

ফিরে যান। ড. আবুল হাশিমের মৃত্যু অস্বাভাবিক হলেও কিছু করার নেই।'

তারানা ধীরে ধীরে, দৃঢ় স্বরে, অনেকটা স্বগতোক্তির ঢঙে বলল, 'আমার বাবা রাস্তার বেওয়ারিশ লাশের মত কাঙ্গার জঙ্গলে একা শুয়ে থাকবেন, আর আমি শিবসা হোটেলে বসে দান-খয়রাত করে বাড়ি চলে যাব, এটা হয় না, ফারুক সাহেব। খুনের রহস্যের কিনারা করতে যদি না-ও পারি, অন্তত তাঁর কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়াব। কাঙ্গায় আমাকে যেতেই হবে।'

'আমি দুঃখিত।'

'আপনি মোটেই দুঃখিত নন,' মেঝেয় পা ঠুকে উঠে দাঁড়াল তারানা। 'এটা আপনার ভান। যাক, চলি। আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট হলো।'

ফারুক তাকিয়ে রইল তার চলার পথের দিকে। খুব খারাপ লাগছে, কিন্তু কিছু করার নেই। কেন যেন মনে হচ্ছে, এই অপরূপা তরুণী তার জীবনকে জটিল করে তুলবে। সারাজীবন সে জটিলতা এড়িয়ে চলতে চেয়েছে। জীবনের চলার পথে বারবার এসেছে নারী; কিন্তু মনের জানালা ধরে উঁকি দিয়ে ফিরে গেছে তারা, ফারুক দরজা খোলেনি। নিবিড় সখ্য গড়ে ওঠেনি কারও সাথে। ফারুক কষ্টকে ভয় পায় না, ভয় পায় দুঃখকে। তার ছেলেবেলার বন্ধু, বিজনেস পার্টনার কামার ফরিদ আর শাকিলার প্রেমোপাখ্যান জানে সে। ভালবেসে দুঃখ পাওয়ার সেই মর্মান্তিক ব্যাপারটাকে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছে। তার চেয়ে, এই তো বেশ ভাল আছে! একলা।

বিল মিটিয়ে উঠে পড়ল ফারুক। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কপালটা এখনও কুঁচকে আছে। পারতপক্ষে সে কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে চায় না। পেশার কথা বিবেচনা করলেও এটা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

দরজার কাছে বাধা পেল সে। হোটেল ম্যানেজার আলাউদ্দিন তার কাঁধ আঁকড়ে ধরল। 'একটু ভুল হয়ে গেল, তাই না, ব্রাদার?'

আলাউদ্দিন ঠিক কি বলতে চায়, বুঝতে চেষ্টা করল ফারুক। তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে। আলাউদ্দিন বলল, 'কোন সুন্দরী মেয়ে এভাবে অনুরোধ করলে আমি আস্ত সুন্দরবন কেটে এনে তার পায়ের নিচে জড়ো করতাম!'

আলাউদ্দিনের মনটা নরম আর ভাল। তারানা হাশিমের এমন একটা সকরুণ আবেদন প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারটা তাকে কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু সে রেস্তোরাঁয় কখন ঢুকল, কখন শুনল এত কথাবার্তা, ফারুক ভেবে পেল না। মংলায় তার কয়েকজন প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী আছে, শিবসা হোটেলের ম্যানেজার আলাউদ্দিন তাদের একজন।

ফারুক কিছু না বলে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

আলাউদ্দিন বলল, 'কথা বলছ না কেন? বাঘ আর কুমিরের সঙ্গে তোমার মিতালি ঈর্ষা করার মত। মেয়েটিকে নিয়ে কাঙ্গা যেতে, আর যা-ই হোক, নিশ্চয়ই "ভয়" পাচ্ছ না! তাহলে এড়িয়ে যাচ্ছ কেন?'

ফারুক এবারও কোন উত্তর দিল না।

আফসোসের সুরে আলাউদ্দিন বলল, 'আহা! আমার যদি গাইডের অভিজ্ঞতা থাকত!'

ফারুক ওর কাঁধে গাট্টা বসাল। ককিয়ে উঠল আলাউদ্দিন। কাঁধ ম্যাসাজ করতে করতে বলল, 'তুমি একটা হারামি!'

'আর তুমি লোভী!'

চোখ বড় করে বন্ধুর দিকে তাকাল আলাউদ্দিন। মুখে সবজান্তার হাসি। 'টের পেয়ে গেছি, ফারুক সাহেব। তোমার অবস্থা টাইট।'

ওকে বিশ্রী একটা গাল দিয়ে ফারুক বলল, 'তুমি টের পেয়েছ আমার ঘণ্টা!'

দুই

তারানা হোটেল রুমের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দু'চোখে তখনও আগুন জ্বলছে। লোকটা এভাবে তাকে ফিরিয়ে দেবে, কল্পনা করতে পারেনি। শুধু ফিরিয়ে দেয়ার জন্যেই নয়, রাগ হচ্ছে তার ব্যবহারের জন্যেও। এটা একটা আচরণ হলো? রীতিমত উপহাস আর তাচ্ছিল্যের ভাব ছিল লোকটার কথায়। উনি নাকি আবার ড. আবুল হাশিমের ভক্ত, অনুরাগী! ভণ্ডামির জায়গা পায় না! তারানার ব্যাপারটা সে মোটেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেনি। ঠিকই গুরুত্ব দেবে, যখন দেখবে মেয়েটা অসহায় নয়, গাইড জোগাড় করে রওনা হয়েছে কাঙ্গার দিকে। তারপর যদি হত্যাকাণ্ডের কোন কিনারা করতে পারে, লোকটার মুখ চুন হয়ে যাবে। অনেক কষ্টে রাগ দমন করল তারানা।

সাড়ে তিনটে বাজে। এখন ঘুমোনোর চেষ্টা করা বৃথা। শুধু শুধু ঘুমটা পণ্ড হবে। তারানা একটা বই খুলে পাতা ওল্টাল। ভাল লাগছে না। জানালার পর্দা সরিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। বেশি ভিড় নেই। রোদের তেজ আর একটু কমলে সে বেরুবে। মংলায় গাইড বলতে শুধু আনোয়ার ফারুককে বোঝায় না। অনেক ট্র্যাভ্‌ল্ এজেন্সি আছে। এখান থেকেই দুটো অফিস দেখতে পাচ্ছে তারানা। গাইড নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। হয়তো সে ফারুকের মত দক্ষ হবে না, কিন্তু উপায় নেই, কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

রাস্তায় ভিড় নেই, তবু গাড়ির ড্রাইভাররা হর্ন বাজিয়েই চলেছে! বিশ্রী এক বদভ্যাস! হর্ন ছাড়া গাড়ি চালিয়ে সুখ পায় না আমাদের দেশের লোকজন, বিরক্তির সঙ্গে ভাবল তারানা। অবশ্য পথচারী আর রিকশাওয়ালারাও কম দায়ী নয়, সে স্বীকার করতে বাধ্য। উপর্যুপরি হর্নের শব্দে দশদিগন্ত মুখর না-হওয়া পর্যন্ত পথ ছাড়তে রাজি নয় কেউ। বাবা প্রায়ই আক্ষেপ করতেন ব্যাপারটা নিয়ে, তারানার মনে পড়ল।

মনে পড়ল দিনের পর দিন তাঁর সঙ্গে দেশভ্রমণের কথা। হয়তো দেশ দেখতে দেখতেই বাবার মত আন্তর্জাতিক চরিত্র অর্জন করেছে সে। ধর্ম, বর্ণ, জাতীয়তা, আঞ্চলিকতা, এসব হাজার অজুহাতে দুনিয়াটাকে ভাগ করার কোন যুক্তি খুঁজে পায় না সে। তার কেবলই মনে হয়, যদি গোটা দুনিয়া হত তার দেশ, বেশ হত। পাঁচ লাখ কোটি জীবাণু একসঙ্গে বাস করে, পাঁচশো কোটি মানুষ ঐক্যবদ্ধ হতে পারল না। দুনিয়াটা তাহলে সর্বনাশা যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে বাঁচত। যে টেলিভিশন সিরিজে

অভিনয় করছে সে, তাতেও বলা হয়েছে বিশ্বমানবতার কথা, গ্রহজুড়ে অভিন্ন লোকালয় গড়ে তোলার কথা। হাতের কাজটা শেষ করার তাগিদ অনুভব করল তারানা। অসভ্য লোকটা একটা কথা ঠিক বলেছে। নায়িকাকে খুব বেশিদিন অনুপস্থিত রাখার ক্ষমতা নাট্যকারেরও নেই। দর্শকের কাছে জবাব দিতে হবে তাঁকে।

তারানার অভিনয়ের ব্যাপারে ড. হাশিমের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু আপত্তি তুলেছিলেন তাঁর বোন ফাতেমা বানু। পনেরো বছর ধরে আবুল হাশিমের সংসারটা তিনিই আগলে আছেন, বলা চলে। তারানা তাঁর কথামত পড়াশোনা শেষ করে বিয়ে করবে, সংসারী হবে, এই ছিল ফাতেমা বানুর প্রত্যাশা। কিন্তু তারানা সে-আশা পূরণ করতে পারেনি। একটা শৌখিন থিয়েটার গ্রুপের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে সে। বেশ কয়েকটা চরিত্রে অভিনয় করে সাড়া জাগিয়েছিল। তারপর টেলিভিশনের অফার পায়। এ-সুযোগ হাতছাড়া করেনি তারানা। পরে অবশ্য ফাতেমা বানু মেনে নিয়েছেন তারানার পেশা বাছাইয়ের ব্যাপারটা। ইতিহাসে বি.এ. অনার্স পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাট চুকিয়ে দিল সে। বেশ সিরিয়াস হয়ে উঠল অভিনয় সম্পর্কে। ফাতেমা বানু বাধা দিলেন না। জানতেন, বাধা দিয়ে লাভ হবে না। ভাইকে চেনেন তিনি। মেয়েটা তাঁর মতই হয়েছে।

দীর্ঘ বিরতির পর একটা চিঠি এল তারানার নামে। তখন বেশ নাম-ডাক হয়েছে তার। কাগজে ছবি ছাপা হয়, সাক্ষাৎকার নিতে আসেন সাংবাদিকেরা। আর আসে ভক্তদের চিঠি। অনেক চিঠি। রোজ সবগুলো পড়ারও সময় পায় না তারানা। এই ভিড়ের মধ্যেই ড. আবুল হাশিমের শেষ চিঠি এল। তার শুরুটা এরকম:

'মা তারানা,

কতদিন দেখি না তোকে! কেমন আছিস? প্রায়ই মনে হয়, ঢাকা চলে যাই আবিষ্কারের নেশা বাদ দিয়ে। টেলিভিশনে খুব নাম করেছিস, শুনলাম। যখন তখন নাকি লোককে কাঁদাতে পারিস! বুড়ো বাপটার কথা একেবারেই ভুলে গেলি? এবার আসল খবরটা বলি। কাঙ্গায় এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি, যার কথা শুনলে দেশবাসী আমাকে মাথায় তুলে নাচবে। এই মুহূর্তে একজন বিশ্বস্ত সাহায্যকারী দরকার আমার। তোকে ছাড়া কারুর কথা ভাবতে পারছি না। কয়েকটা দিনের জন্যে আসতে পারবি? ফেরত ডাকে মতামত জানাস।...'

তারানার ইচ্ছে হয়েছিল পাখি হয়ে সুন্দরবনে উড়ে যেতে। তখন তার টাইট শিডিউল; কিছুতেই সময় করতে পারেনি। ভেবেছিল, টেলিভিশনের পরবর্তী 'প্রান্তিকে' তাদের সিরিজ যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে মাস তিনেক পর বাবার আহ্বানে সাড়া দিতে পারবে। কিন্তু তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল। আর কখনই সেই জ্ঞানান্বেষী মানুষটি কোন সাহায্যের জন্যে তারানাকে ডাকবেন না। নিজের আবিষ্কার, উপলব্ধি আর ছোট ছোট সুখ-দুঃখের কথা জানিয়ে লিখবেন না পাতার পর পাতা চিঠি।

মানুষটিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায় তারানা। নিজের জন্মদাতা বলে নয়,

আবিষ্কারের জন্যে। কী আবিষ্কার করেছিলেন সাধকটি, কেন কাউকে জানাতে পারেননি, তারানা জানতে চায়। ঠিক কীভাবে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর? কেন? আবিষ্কারের সঙ্গে এই মৃত্যুর কোন সম্পর্ক আছে? এসব প্রশ্নের উত্তর চায় তারানা।

আনোয়ার ফারুকের স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের পর জেদ বেড়ে গেছে। গাইড জোগাড় করতেই হবে। একান্তই যদি গাইড পাওয়া না যায়, একলা-চলো নীতি অনুসরণ করবে সে।

হোটেল শিবসার ইনফরমেশন রুমে একটা বই পাওয়া গেল। তাতে স্থানীয় গাইড আর কয়েকটা ট্র্যাভল্ এজেন্সির নাম আছে। একটা কাগজে নোট নিল তারানা। তারপর বেরিয়ে পড়ল হোটেল থেকে। ভেবেছিল, অনায়াসে একজন গাইড পেয়ে যাবে।

কিন্তু দু'ঘণ্টা প্রাণপণ আয়াসেও যখন কাউকে কাঙ্গা ট্যুরে রাজি করানো গেল না, তারানা দুর্ভাবনায় মুষড়ে পড়ল। শেষ পর্যন্ত তাকে একলা যেতে হবে সেই ভয়ঙ্কর জঙ্গলে! প্রথম দুটো ট্র্যাভল্ এজেন্সিতে গিয়ে একই অভিজ্ঞতা হলো। কাঙ্গার নাম শুনেই তারা কথাবার্তা বলা বন্ধ করল। তারানার এ-অভিযানের কারণ শোনার কোন আগ্রহ নেই তাদের। তৃতীয় অফিসের সেলস্ম্যান অবশ্য ধৈর্য সহকারে তার বাবার কথা শুনল।

'ড. আবুল হাশিম! আহা! বড় ভাল লোক ছিলেন।'

কিন্তু ওই পর্যন্তই। ড. হাশিমের মেয়েকে কাঙ্গায় নিয়ে যাবার কথা কেউ ভাবতে পারছে না। আরও কয়েকটা জায়গায় ঘোরাফেরা করার পর তারানা বুঝতে পারল, অকারণে সে নিজের বিপদ ডেকে আনছে। আনোয়ার ফারুক ছাড়া কেউ কাঙ্গার ত্রিসীমানা মাড়ায়নি।

বিশেষ করে স্ট্যাণ্ডার্ড ট্র্যাভল্স্ নামের এক অফিসে গিয়ে যে হোঁচটটা খেতে হয়েছে তাকে, তারপর আত্মবিশ্বাস রাখাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোটামতন, কালো একটা লোক কাউন্টারে বসেছিল। সে নিজেকে ফার্মের মালিক বলে দাবি করল। তারানা একা এবং কাঙ্গা যেতে চায় শুনে তার চোখে আগুন জ্বলে উঠেছে। তারানা পথে পথে ঘুরছে ছ'বছর বয়স থেকে। এ-চাহনি চিনতে তার ভুল হয়নি। কিন্তু অতি লোভে লোকটা বড় রকমের ভুল করে বসল। তারানার কাঙ্গা যাবার কারণ জিজ্ঞেস করল না।

'একটুও ভাববেন না, ম্যাডাম। সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমাদের কোম্পানির সঙ্গে যারা একবার কাজ করেছে, জীবনেও ভুলবে না। আমি নিজেই গাইডের কাজ করি। আমাকে পছন্দ হয় আপনার? হে হে, কাজে খুব পাকা। সময়মত দেখতে পাবেন। কবে রওনা হবেন? চলেন, আজ রাতেই যাই। আমাদের বোটে থাকার ব্যবস্থা খুব ভাল।'

তারানা আহত বিস্ময়ে লোকটার দিকে তাকিয়ে রইল। বলে কি! লোকটা তারানার চাহনির কি অর্থ করল, কে জানে? তার কানের কাছে মুখ বাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'আমার বোটে বিশেষ লোকজন থাকে না। আলটিমেটলি আমরা দু'জনাই। হে হে হে। চিন্তা করবেন না, বোটে সব রকমের বন্দোবস্ত আছে।'

তারানা শীতল, অথচ দৃঢ় স্বরে বলল, 'আপনি কাঙ্গা গিয়েছেন কখনও?'
'আরে, ম্যাডাম বলে কি! প্রায়ই তো যাই! খুব ভাল জায়গা।'
'যেতে কতক্ষণ লাগে?
'কতক্ষণ লাগবে? তা, ধরেন, রাত পোহালেই পৌঁছে যাব আমরা।'
তারানা উঠে পড়ল।
'কী ব্যাপার, ম্যাডাম? উঠে পড়লেন যে!'
'হ্যাঁ।'
'কাঙ্গা যাবেন না?'
'না।'
লোকটা তারানার হাত জড়িয়ে ধরল। মুখের হাসিটা কুৎসিত আকার ধারণ করেছে। গলার স্বর আরও নামিয়ে বলল, 'আমি শুধু আমার সাইড থেকে বললাম। আপনার সাইড থেকে তো কিছু বললেন না!'
তারানা রাগে কাঁপছিল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'আমার পক্ষ থেকে যা বলার, পুলিশ এসে বলবে। পুলিশ যদি না পারে, তাহলে আর্মি···। হাত ছাড়ুন। আমি যাব।'
লোকটা ঘাবড়ে গেল। হাত ছেড়ে সরে দাঁড়াল। প্রায় ছুটতে ছুটতে অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল তারানা। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিল। খুব বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছিল সে।
হোটেলে ফিরে সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল সে। বুঝতে পেরেছে, আনোয়ার ফারুক ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু লোকটার জেদ ভাঙা যায় কীভাবে? ভেবে কূল-কিনারা পেল না তারানা।
সন্ধের পর ওয়েটারদের একজন তার দরজায় টোকা দিল। তারানা বিছানার ওপর উঠে বসল। 'এসো।'
ওয়েটারের নাম সাজেদ আলী। তার জামায় লটকানো প্লেটে লেখা আছে। ঘরে ঢুকে তারানাকে সালাম দিল সে। হাসতে হাসতে বলল, 'রাতে কী খাবেন, ম্যাডাম?'
ডিনারের মেনু জানিয়ে দিল তারানা। ভেবেছিল, ছেলেটা তখনই চলে যাবে। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রইল।
'কিছু বলবে?' শান্ত কণ্ঠে বলল তারানা।
'ইয়ে·· শুনলাম, আপনি নাকি কাঙ্গা যাবেন?'
'যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু গাইড পাচ্ছি না। যাওয়ার আশা বোধ হয় বাদ দিতে হচ্ছে।'
সাজেদ আলী তারানার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে বলল, 'আনোয়ার ফারুক সাহেব কী বললেন?'
তারানা উত্তর দিল না। দীর্ঘশ্বাস ফেলল।
'আমার ভাই ওয়াজেদ আলী ফারুক সাহেবের কোম্পানিতে চাকরি করে,' যেন কোন গোপন তথ্য সরবরাহ করছে, এমন ভঙ্গিতে বলল সে।
তারানা উৎসুক হয়ে বলল, 'তাই? এক কাজ করো না! তোমার ভাইকে

বলো আনোয়ার ফারুককে রাজি করাতে। যদি পারে, তাকে বকশিশ দেব।'

বিব্রত মুখে সাজেদ বলল, 'ফারুক সাহেব যদি নিজে বুঝে রাজি না হয়, কেউ তাকে রাজি করাতে পারে না। তবু চেষ্টা করে দেখব।'

সাজেদ আলী চলে গেল। দরজার দিকে তাকিয়ে রইল তারানা। বিড়বিড় করে বলল, 'বাবা, তোমার এত কাছে এসেও ফিরে যেতে হবে আমাকে? তোমার কবরটা দেখতে যে ভারি ইচ্ছে করছে! তোমার থাকার জায়গাটা কেমন, বাবা? এক নজর দেখতেও পাব না?'

রাত নটা।

হোটেল শিবসার রেস্তোরাঁয় বসে চিকেন কর্ন সুপ খাচ্ছে কামার ফরিদ। সামনের চেয়ারে বসে তাকে লক্ষ করছে আনোয়ার ফারুক। ফরিদের ভাবভঙ্গি সুবিধের নয়। সে এসেছে আধঘণ্টা আগে। ফারুকের সঙ্গে কথা বলেছে সামান্যই। ডিনারের অর্ডার দিয়েছে কারুর তোয়াক্কা না করেই। বন্ধুকে সামনে বসিয়ে রেখে গাড়লের মত খেতে শুরু করেছে একা। এটা তার অভ্যেসের বাইরে।

ঔৎসুক্য চাপতে না পেরে ফারুক বলল, 'একা খাচ্ছিস যে বড়!'

ফরিদ সুড়ুৎ করে আরও খানিকটা সুপ গলায় টেনে নিল। মাংস চিবুতে চিবুতে বলল, 'তুমি তো আজকাল যার-তার সঙ্গে খাও না!'

'মানে?'

'এক "পরমা সুন্দরীর" সঙ্গে নাকি লাঞ্চ করেছ আজ দুপুরে!'

ফারুক চেয়ারের পেছনদিকে মাথা ঝুলিয়ে দিল। 'আমি যখন লাঞ্চ করছিলাম, মেয়েটা আমার সামনে এসে বসে। কথাটা মন দিয়ে শুনছ?'

'মহিলা, বিশেষ করে সুন্দরী মহিলা সংক্রান্ত যে-কোন বিবৃতি আমি গভীর আগ্রহ নিয়ে শুনি। বলে যাও।'

'সুন্দরী তার নিজের কাজ নিয়ে এসেছিল। আলাউদ্দিন ঘটনার অপব্যাখ্যা করেছে তোমার কাছে। ব্যাপারটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হতে পারে।'

সুপ শেষ করে স্প্রাইটের গ্লাসে চুমুক দিল ফরিদ। 'কিছু কিছু লোক সুন্দর ভাগ্য নিয়েই জন্মায়। সুন্দরীরা কাজ নিয়ে তাদের টেবিলেই এসে বসে। আমার সামনে এসে বসে না তারা। যা-ই হোক, কে সেই সুন্দরী?'

'মরহুম ড. আবুল হাশিমের মেয়ে।'

চমকে উঠল ফরিদ। তারপর হেসে ফেলল। 'বুড়োর একটা সুন্দরী মেয়ে ছিল, তা তো জানতাম না!'

'টেলিভিশনের সিরিজ নাটকে অভিনয় করে।'

'বলো কি! ক্রমেই মুগ্ধ হচ্ছি।'

ফারুক বিরক্তি চেপে বলল, 'মুগ্ধ হবার কিছু দেখছি না। অবশ্য হাতে কাজ আর মাথায় চিন্তা না থাকলে মানুষ অতি তুচ্ছ ব্যাপারেও আগ্রহী হয়ে পড়ে, শুনেছি।'

কামার ফরিদ চোখ কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড ফারুকের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, 'আমার ব্যাপারে তোমার প্রবাদটা খাটে বলে মনে হচ্ছে? আমার

সম্পর্কে এই সাম্প্রতিক মূল্যায়নের পর তোমার ব্যাপারে আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে।'

ফারুক বলল, 'আমার চেয়েও ড. হাশিমের সুন্দরী মেয়ের ব্যাপারে তোমার আগ্রহটা বেশি, কামার। তার সম্পর্কে আরও দুটো কথা আছে। বলতে পারি?'

'ওহ্, ইয়েস!'

'নাট্যজগতের এই মেয়েটা বাস্তব জীবনে একটা নাটক জমিয়ে তুলতে চায়।'

'মানে?'

'কাঙ্গায় যেতে চায় সে।'

'পিতার আরব্ধ কাজ সমাপনের মহান উদ্দেশ্যে?'

'না, কবর দেখতে, আর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে।'

কামার ফরিদ মৃদু হাসল। 'ভালই তো! সে তার বাবার কবর দেখতে আর হত্যাকারীর খোঁজখবর নিতে যাবে, তাতে আমাদের কি?'

' "আমাদের" কি, জানি না। কিন্তু "আমার" ঘোর আপত্তি আছে।'

কামার ফরিদ কিছু না বলে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ফারুকের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফারুক বলল, 'গাইড হিসেবে আমাকে চাই তার!'

'তাই বলো!' টেবিলে সশব্দে ঘুসি মেরে বলল কামার ফরিদ।

কাউন্টারের পাশের রুমে বসে হিসেব মেলাচ্ছিল আলাউদ্দিন। ঘুসির শব্দ শুনে বেরিয়ে ওদের টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। পকেট থেকে মার্লবরো সিগারেটের প্যাকেট বার করে বাড়িয়ে ধরল কামার ফরিদের দিকে। উত্তেজনার মুহূর্তে একটা সিগারেট খুব কাজে লাগে। কিন্তু কামার ফরিদ সিগারেট নিল না, ফিরেও তাকাল না আলাউদ্দিনের দিকে। এক বিশেষ ধরনের মুডে আছে সে।

'ছেলেরা বোকা। তারা শুধু বোঝে মেয়েদের ফিগার। মেয়েরা কত চালাক, দেখেছ? তারা ক্যারিয়ার বোঝে। খাঁটি সোনা খুঁজে বের করেছে। কিন্তু একটা সমস্যা আছে, ফারুক সাহেব। মেয়েটার মধ্যে আগুন আছে। ঠিকমত নাড়াচাড়া করতে না পারলে পুড়ে খাক হয়ে যাবে।'

'আমি তাকে নাড়াচাড়া করতে যাচ্ছি না। একটুও আগ্রহ নেই।'

আলাউদ্দিন একটা চেয়ার টেনে কামার ফরিদের পাশে বসল। 'কাঙ্গার পথঘাট আমি চিনি। তোমাদের আপত্তি থাকলে বলো। আমি নিয়ে যাব ওকে।'

কামার ফরিদ তাকাল আলাউদ্দিনের দিকে। 'সিগারেটটা দাও, আলাউদ্দিন। এর চেয়ে বেশি কিছু অফার কোরো না। ড. হাশিমের সুন্দরী মেয়ে তোমার সঙ্গে বন-জঙ্গলে ট্যুর করতে বেরুবে না, অন্তত দুনিয়ায় যতক্ষণ আর একটা পুরুষও বেঁচে আছে…'

আহত সুরে আলাউদ্দিন বলল, 'রাগ করছ কেন, ভাই? আব্রাহাম লিঙ্কনও কুৎসিত লোক ছিলেন। দাড়িটা কামিয়ে ফেললে আমাকে অত খারাপ দেখাবে না। প্রমাণ চাও?'

কামার ফরিদ চোখ লাল করে তাকাল আলাউদ্দিনের দিকে। 'সিগারেটটা দাও, তারপর কেটে পড়ো। লোকের আজেবাজে কথায় মন দিলে পস্তাবে। এমনিতেই তুমি হিসেবে কাঁচা। যেটা করছিলে, সেটাই মন দিয়ে করো গে।'

মার্লবরোর প্যাকেট টেবিলের ওপর রেখে অপ্রসন্ন মুখে অফিসে ফিরে গেল আলাউদ্দিন।

ফারুক নিচু গলায় বলল, 'মেয়েটা জানে, আমি কাঙ্গা যাচ্ছি। কোন কথাই আজকাল গোপন রাখা যাচ্ছে না। কেমন করে যেন সব জানাজানি হয়ে যাচ্ছে!'

আরও একটু নিচু স্বরে কামার ফরিদ বলল, 'জঙ্গলে কোন জিনিস গোপন থাকে না, বিশেষ করে সুন্দরবনে।'

দু'জন হঠাৎ দু'জনের দিকে চাইল। ফরিদের কথার একটা ইতিহাস আছে। তার সঙ্গে সম্পর্ক আছে দু'জনেরই। কখনও কথাটা উচ্চারিত হলেই তারা যেন অতীতের সেই দিনগুলোকে দেখতে পায়।

ভাগ্যান্বেষণে তারা তখন সবেমাত্র এসে পৌঁছেছে সুন্দরবন এলাকায়। উদ্দেশ্য ছিল ব্যবসা। আনোয়ার ফারুকের ছিল বুদ্ধি, সাহস আর নিষ্ঠা। কামার ফরিদের টাকা, নেতৃত্ব ক্ষমতা আর প্রভাব। দেখতে দেখতে মংলা বন্দরের সবচেয়ে উঁচু মহলে উঠে পড়ল ওরা। সবকিছু চলছিল ঠিকঠাক মতই। কিন্তু এক জায়গায় গোলমাল শুরু হলো। কয়েকজন স্থানীয় লোকের কায়েমী স্বার্থে আঘাত করল এই দুই নবাগত, দূরাঞ্চলীয় তরুণের উন্নতি। তারপর স্বাভাবিক নিয়মে শুরু হলো ষড়যন্ত্র। স্থানীয় লোকজন দলে ভারী। ফরিদ আর ফারুক এদের সমবেত প্রতিরোধের মুখে বিপন্ন হয়ে পড়ল। এক সুন্দর সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখল, পুলিশ বন্দি করেছে তাদেরকে। হাতকড়া পরিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর বলল, 'সুন্দরবনে কিছুই গোপন থাকে না, বাছাধনেরা। এবার বুঝবে, বড়লোক হবার কত মজা!'

তাদের বিরুদ্ধে অন্তত দশটা অভিযোগ। বেআইনী অস্ত্র ব্যবহার, ডাকাতি, খুন, প্রতারণা, আরও অনেক কিছু। মামলা চলল কয়েক বছর। জেলখানায় শুয়ে-বসে, বই পড়ে আর আগামী দিনের জন্যে সোনালী স্বপ্নের বীজ বুনে কাটল ওদের। একটা লাভ হলো। ওদের বন্ধুত্ব গাঢ় হলো।

জেল থেকে বেরিয়ে ওরা নতুন করে শুরু করল সংগ্রাম। পুরানো ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে। সেগুলো পুনরুদ্ধারের চেষ্টাতেও আছে ঝুঁকি। নতুন পেশার চিন্তা করতে হলো ওদেরকে। বেছে নিল এমন এক কঠিন পেশা, যাতে নোংরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, ষড়যন্ত্র আর পেশির জোরে যেখানে সুবিধে করা যায় না।

'অমত কোরো না, ফারুক।'

ফারুক চমকে উঠল। 'কী বললে?'

'মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে কাঙ্গা যাও।'

'মাথা খারাপ হয়েছে তোমার?' বিস্ময় গোপন করতে না পেরে ফারুক বলল, এবারের অ্যাসাইনমেন্টটা পণ্ড করতে চাও নাকি?'

'অ্যাসাইনমেন্টের কথা আমি ভুলিনি, ফারুক। মেয়েটা তোমার কোন ক্ষতির কারণ হবে না।'

মাথা নাড়ল ফারুক। 'অসম্ভব।'

কামার ফরিদ তার শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করল। 'আমি ফার্মের আট আনা অংশের মালিক। সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার তোমার একার নয়।'

'তুমি পনেরো আনা অংশের মালিক হলেও আমি অযৌক্তিক কোন সিদ্ধান্ত মেনে নিচ্ছি না, ফরিদ।'

ফরিদ ফারুকের হাত চেপে ধরল। 'আমিও কোন অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত তোমার ওপর চাপিয়ে দিতে চাই না। কাঙ্গা তোমাকে যেতেই হচ্ছে, নইলে লোকে আমাদের কাপুরুষ বলবে, এটা মানছ?'

'মানছি। কাঙ্গায় যেতে তো আমার কোন আপত্তি নেই! কিন্তু রক্ষে করো, ওই টিভি স্টারকে সঙ্গে নিয়ে কখখনও নয়।'

'ফারুক, বুঝতে চেষ্টা করো। টিভি স্টারের কাছে এমন কোন তথ্য থাকতে পারে, যা তোমার অ্যাসাইনমেন্টের কাজে আসবে। নিশ্চয়ই তোমার মনে আছে, বেচারা ড. হাশিম প্রায় রোজই মেয়েকে চিঠি লিখত। এমনও তো হতে পারে, কোন গোপন তথ্য জানে ওই মেয়েটা!'

ফারুক ফরিদের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ভাবল। তারপর মাথা নিচু করে, অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বলল, 'কিস্‌সু জানে না তারানা হাশিম।'

তিন

সকাল সাড়ে আটটা।

তারানা ওর রুমে খাটে বসে পা দোলাচ্ছে। কপালে ভাঁজ। ভাবনায় ডুবে আছে সে। হাতে একটা পুরানো চিঠি। তারানা অন্তত পঞ্চাশবার পড়েছে চিঠিটা। চিঠি না বলে সেটাকে বলা উচিত দলিল! যকের ধনের মত তারানা এটা আগলে রেখেছে। এই চিঠিতে ড. আবুল হাশিম মেয়েকে জানিয়েছিলেন তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় আবিষ্কারের কথা। তারানার মনে পড়ে, সাক্ষাতে বাবা প্রায়ই বলতেন সুন্দরবনের এক অবলুপ্ত জনপদ, বিজনপুরের কথা অত্যন্ত সমৃদ্ধ, উন্নত এক বন্দরনগরী ছিল বিজনপুর। কালের গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শহরটা। তিনি বছরের পর বছর খুঁজে বেড়াচ্ছেন বিজনপুরের দিশা। কতবার তাঁর মনে হয়েছে, এই বুঝি পেয়ে গেছেন! আবার ভুল ভেঙে গেছে। বিজনপুর নিয়ে তাঁর এই ব্যক্তিগত উদ্বেগ সংক্রমিত হয়েছিল তারানার মধ্যেও। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, বাবা একদিন বিজনপুরের দিশা খুঁজে পাবেন। সারা দেশে, শুধু দেশে কেন, সারা পৃথিবীতে আলোড়ন তুলবে তাঁর আবিষ্কার। বাংলাদেশ নামের এই বদ্বীপ সম্পর্কে শুরু হবে নতুন মূল্যায়ন।

দুটো বালিশ জড় করে তাতে হেলান দিল তারানা। চিঠির ভাঁজ খুলল। শেষ অংশটায় চোখ বুলাল আবার।

'...যুগ যুগ ধরে যা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, তা পেয়েছি। তুই তো জানিস, বিজনপুরের হদিস খুঁজে বের করার জন্যে কতখানি কষ্ট স্বীকার করেছি আমি! অবশেষে তার সন্ধান মিলেছে। জায়গাটা এই এখানে, কাঙ্গার কাছেই। একটা ম্যাপ সংগ্রহ করেছি, সেই রহস্যময় অবলুপ্ত শহরের। যার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি, সেও এক রহস্যময় লোক! সে কোত্থেকে এটা পেল, জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি। তার দেখাও পাচ্ছি না। আরও অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটছে এখানে। সাক্ষাতে সব বলব। তোর উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

দোয়া নিস।

বাবা।'

চিঠির নিচে ম্যাপটা এঁকেছেন বাবা। তারানা ভাল করে লক্ষ করল। দেখতে দেখতে ম্যাপটা তার মনে গেঁথে গেছে। চিঠিটা হারিয়ে গেলেও কোন ক্ষতি নেই, এখন সে নিজেই আঁকতে পারে ওটা। তবু সে যত্ন করে চিঠিটা হাতব্যাগে রাখল। পায়চারি করল ব্যালকনিতে। তারপর ঘরে ঢুকে দরজা আর জানালার পর্দাগুলো ভাল করে টেনে দিল। একে একে খুলে ফেলল পরনের সব কাপড়। বাথরুমে ঢুকে শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল। মাথা ঠাণ্ডা করা দরকার।

সামনে লাইফ সাইজ আয়নাটাও তার সঙ্গে ভিজছে। সেই ভেজা আয়নায় নিজের ঝাপসা প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল তারানা। আশ্চর্য এক অনুভূতির জন্ম হলো। হঠাৎ মনে হলো, জীবনের অনেক চাওয়া-পাওয়া বাকি রয়ে গেছে। কাঙ্গার দুরূহ কাজটা আগে শেষ করবে সে। তারপর চাওয়া-পাওয়ার কথা ভাববে। কিন্তু এমন সময় হঠাৎ আনোয়ার ফারুকের কথা মনে পড়ল। অদ্ভুত এক সম্মোহনী শক্তি আছে লোকটার। চোখ বুজে তার ওপর নির্ভর করা যায়।

কিছুতেই রাজি করানো যায় না তাকে? কোন উপায় নেই? আবার চেষ্টা করে দেখতে হবে, তারানা সিদ্ধান্ত নিল। সারা শরীরে তোয়ালে বুলিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে। কাপড় পরতে পরতে লক্ষ করল, দরজার কাছে একটা চিঠি। সে যখন বাথরুমে ছিল, বাইরে থেকে দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়েছে কেউ।

একটা সাদা এনভেলাপ। ওপরে জড়ানো অক্ষরে তাহানার নাম লেখা। এনভেলাপের মুখ খুলে ভেতরের শক্ত কার্ড টেনে বের করল সে। দাওয়াত পত্র। প্রেসিডেন্ট মংলায় আসছেন আজ। সন্ধেয় তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হবে পোর্ট কমিউনিটি সেন্টারে। তারানা হাশিমকে ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান কামার ফরিদ।

তারানার মনে হলো তার বুকের ভিতরে হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠেছে। কামার ফরিদ কে? তাকে কেন এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে? না কি, এটা এখানকার রেওয়াজ? তারানা ভেবে পেল না। কিন্তু প্রেসিডেন্টের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার দুর্লভ সুযোগ হাতছাড়া করার মানে হয় না।

তারানা ইন্টারকমের রিসিভার তুলল।

'বলুন, ম্যাডাম,' রিসেপশন কাউন্টারের পাশ থেকে সাড়া দিল একজন বেলবয়।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই। কামার ফরিদ সাহেব কে?'

'মংলার একজন ভি. আই. পি। "এফ এণ্ড এফ লিমিটেডের" পার্টনার। খুবই প্রভাবশালী মানুষ। কেন বলুন তো?'

ইতস্তত করে তারানা বলল, 'ভাবছি, উনি আমাকে চিনলেন কীভাবে!'

বেলবয় বলল, 'বুঝতে পেরেছি, ম্যাডাম। ফারুক সাহেব নিশ্চয়ই আপনার নাম ফরিদ সাহেবের তালিকায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন! ফারুক সাহেবের সঙ্গে তো আপনার পরিচয় হয়েছে···আমাদের রেস্তোরাঁয়····গতকাল দুপুরে···মনে পড়ছে?'

এতক্ষণে ব্যাপারটা তারানার কাছে পরিষ্কার হলো। 'এফ এণ্ড এফ লিমিটেড' মানে 'ফারুক এণ্ড ফরিদ লিমিটেড', কথাটা আগে ওর মাথায় ঢোকেনি।

বেলবয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল তারানা। নতুন করে ভাবতে বসল। তাহলে ব্যাপারটা কেমন দাঁড়াল? আনোয়ার ফারুক কি মত পাল্টাল? নাকি, এটা শুধুই তার পার্টনারের ঔৎসুক্য? এমনও হতে পারে, মরহুম ড. আবুল হাশিমের প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই তারানাকে সম্মান দেখানোর গরজটা ফরিদের কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে! আবার হয়তো এসব কিছুই নয়, বন্দরনগরীতে নবাগতা হিসেবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে—অনুষ্ঠান অলঙ্কৃত করার উদ্দেশ্যে। তারানা পায়চারি করতে করতে ভেবে সারা হলো।

কারেন্ট চলে গেছে। তারানা অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল সিলিং ফ্যানের দিকে। থেমে গেছে ব্লেডগুলো। গরম লাগছে। তারানা দরজা খুলে বারান্দায় বেরুল। চমৎকার হাওয়া। তারানা রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়াল।

নিচের কার পার্কে একটা জীপ এসে থামল। চারজন লোক নামল। তাদের একজনের দিকে চোখ পড়তেই তারানা চমকে ওঠে। আনোয়ার ফারুক। তারানা ভেবেছিল, সে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। কিন্তু তার বদলে তারানার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল। মজা পেল তারানা। তা হলে হাসতে জানে লোকটা! একেবারে হৃদয়হীন নয়!

সঙ্গীদের সঙ্গে রিসেপশন কাউন্টারের দিকে চলে গেল ফারুক। সেখান থেকে অনেকগুলো গলার স্বর ভেসে আসছে। সন্ধের অনুষ্ঠান ত্রুটিহীন, সুন্দর করার ব্যাপারে শেষবারের মত আলোচনা করছে ওরা।

হঠাৎ কাছেই পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তারানা। একজন দীর্ঘদেহী লোক তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মেদহীন, ধারাল শরীর। দু'চোখে কৌতুকের ঝিলিক।

'আপনাকে একটু বিরক্ত করছি, মিস্ তারানা। আমার নাম কামার ফরিদ। আমার আমন্ত্রণপত্র পেয়েছেন কিনা জানতে এসেছি।'

তারানার মুখে হাসির ঢেউ।

'না, না, বিরক্ত হব কেন? আমন্ত্রণপত্র পেয়েছি। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আসছেন তো?'

তারানা হাসল। 'নিশ্চয়ই। প্রেসিডেন্টের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্যে ডেকেছেন, গর্ব হচ্ছে আমার।'

গোঁফে তা দিয়ে কামার ফরিদ বলল, 'আলাউদ্দিন আর ফারুকের কাছে আপনার কথা শুনেছি। আমি আপনার বাবাকে চিনতাম। অনেকদিন একসাথে ঘুরেছি। তিনি খুব পছন্দ করতেন আমাকে।'

কথা বলতে বলতে তারানার পাশে এসে রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়াল কামার ফরিদ। হাসিটা লেগে আছে গোঁফের আড়ালে।

তারানা বলল, 'ভিতরে চলুন। বসবেন না?'

'না, থ্যাঙ্কস। ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে। বাইরে দাঁড়াতেই ভাল লাগছে। মংলার ইলেকট্রিসিটির সমস্যা রোজকার ব্যাপার।'

তারানা বলল, 'আমার বাবাকে এখানে অনেকেই চেনেন দেখছি। খুব জনপ্রিয় ছিলেন, তাই না?'

ফরিদ হাসল। হাসিতে সমর্থন আর প্রতিবাদের মিলিত সুর। 'জনপ্রিয় ছিলেন, কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা কথা নিশ্চয়ই মানবেন! নিরঙ্কুশ জনপ্রিয়তা বলে আসলে দুনিয়ায় কিছু নেই। জনপ্রিয় মানুষের শত্রু থাকবেই। আপনার বাবারও ছিল।'

তারানা ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

'শেষ মিশনে যাত্রা করার আগে আপনার বাবা ফারুককে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর সঙ্গে কাঙ্গা যাবার জন্যে,' ভারাক্রান্ত স্বরে ফরিদ বলল। 'উনি ঠিক জানতেন, একা একা কাঙ্গা অভিযানে বের হওয়া উচিত হবে না। ভয়ঙ্কর জায়গা।'

তারানার গলায় অভিমানের সুর স্পষ্ট হয়ে উঠল। 'উনি বাবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এখন আমাকেও নিয়ে যেতে চাচ্ছেন না।'

'হয়তো কারণ একটাই। জায়গাটা আসলে ঠিক কতটুকু ভয়ঙ্কর, ফারুকই জানে। হয়তো সে চায় না, আপনিও আপনার বাবার মত বেঘোরে প্রাণ দিন।'

তারানা করুণ স্বরে হাসল। 'সবাই যদি প্রাণের ভয় করে, দুনিয়াটা অচল হয়ে যাবে, ফরিদ সাহেব। আপনি আমাকে সাহায্য করুন, প্লীজ। আপনার পার্টনারকে রাজি করান।'

কামার ফরিদ তারানার জল ছল-ছল চোখের দিকে তাকিয়ে বিব্রত বোধ করল। কিছু বলল না।

তারানা অনুনয় করল, 'আপনি ওঁর পার্টনার আপনার অনুরোধ উনি ফেলতে পারবেন না। প্লীজ, ওঁকে বলুন আমাকে কাঙ্গায় নিয়ে যেতে।'

কামার ফরিদ চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল। 'প্রাণপণে চেষ্টা করব, মিস তারানা হাশিম; কিন্তু কথা দিতে পারছি না।'

'এক কাপ চা খাবেন না?'

'না, মিস তারানা। অনেক কাজ পড়ে আছে। চলি।'

লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেল কামার ফরিদ। কার পার্কে জীপটা তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গীরা আগেই উঠে পড়েছে।

তারানা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কামরায় ঢুকল। সন্ধের অনুষ্ঠানের জন্যে তৈরি হতে হবে।

বেশি মেক-আপ নেবে না ভেবেও কাজটা সারতে তারানার ঠিক সোয়া এক ঘণ্টা লাগল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সম্পূর্ণ চেহারা দেখে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যায় সে। দারুণ সেজেছে! আনোয়ার ফারুকের পক্ষে কঠিন হবে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা। তারানা সিদ্ধান্ত নিল, সে সব-সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখবে ফারুকের দিকে। একটা মুহূর্ত নিশ্চয়ই আসবে, তখনই সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবে। পুরোপুরি কামার ফরিদের ওপর নির্ভর করাটা ঠিক হবে না।

মেক-আপ নেয়া শেষ হলে যত্নের সঙ্গে শাড়ি পরল তারানা। টিয়া রঙের সিল্কের শাড়ি। মেক-আপের রঙের সঙ্গে ভালই মানিয়েছে। সবুজ টিপ পরেছে

কপালে। ওর কমনীয় মুখখানাকে আরও মহিমা দান করেছে টিপটা। স্বাভাবিক উজ্জ্বল ত্বক লোশনের ছোঁয়া পেয়ে হয়ে উঠেছে আরও দ্যুতিময়। জমকালো কাপড়ের ফাঁক দিয়ে শরীরের যেটুকু অংশ চোখে পড়ছে, সেটুকুই চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মত। কাপড়ে-ঢাকা শরীরের বাকি অংশটুকুকে লাগছে রহস্যময়। কটিদেশের কাছটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আয়নায় দেখল সে।

বেরুতে যাচ্ছিল, এমন সময় ফোন বাজল। তারানা ভেবেছিল, হোটেলেরই কেউ হবে। কিন্তু রিসিভারটা উঠিয়ে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল সে। ফাতেমা বানু। এত চমৎকার কানেকশন যে মনে হচ্ছে মংলা শহরেরই কোন জায়গা থেকে কথা বলছেন। তারানা মুহূর্তের মধ্যেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

'কেমন আছ, ফুপু?'

'আমার কথা বাদ দে। তুই যে অমন হঠাৎ করে না বলে-কয়ে বেরিয়ে পড়লি, গিয়ে একটা খবরও তো দিলি না!'

'একটু ঝামেলার ভিতর আছি, ফুপু। ভেবেছি, সামলে উঠে তোমাকে খবর দেব। তোমার ব্লাড প্রেশারের কী অবস্থা?'

'প্রেশার এখন ঠিক আছে। কিন্তু সে-খবর দেয়ার জন্যে তোকে ট্রাঙ্ক কল করিনি। আমি জানতে চাই, তোর সুন্দরবন অভিযানের খবর কী? আর কতদিন এসব পাগলামি করে আমাকে জ্বালাবি?'

তারানা বুঝতে পারল, ঝগড়া অত্যাসন্ন। কিন্তু এখন মুড নষ্ট করার কোন ইচ্ছে নেই ওর।

'ফুপু, আমি...'

'শোন, তারানা,' ফাতেমাবানু ধমক দিয়ে বললেন, 'ভেবেছিলাম, খুলনা পর্যন্ত গিয়েই তোর মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যুক্তি আর বুদ্ধি দিয়ে আবেগ দমন করবি তারপর ফিরে আসবি ঢাকায়। কিন্তু তিনদিন পার হয়ে যাবার পরও দেখছি তোর ফেরার নাম নেই! তুই কি সত্যিই কাঙ্গায় যাবি?'

তারানা সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'যাচ্ছিই—এমন কথা বলতে পারছি না, ফুপু। গাইড পাচ্ছি না। কেউ আমাকে কাঙ্গা নিয়ে যেতে চায় না। শুধু ভয় দেখায়, জায়গাটা খুব বিপজ্জনক। আসলে আমি বুঝতে পারছি, আমাকে ভয় দেখিয়ে নিরুৎসাহ করতে চায় ওরা। ওদের ধারণা, পথের কষ্ট সহ্য করতে পারব না আমি।'

'তুই কাঙ্গায় যাস, এটা আমি চাই না, তারানা। কিন্তু এটা ঠিক, ওরা তোকে ভুল বুঝেছে। হয়তো খেয়াল করেনি, কার মেয়ে তুই! পাঁচ বছর বয়সে দানিউব নদী পার হয়েছিস আর আট বছর বয়সে উঠেছিস পিরামিডে, এগুলো জানে ওখানকার লোকেরা?'

তারানার মুখে হাসি ফুটল। 'ফুপু, থ্যাঙ্ক ইউ ফর দা ভোট অভ কনফিডেন্স। কিন্তু এরা ভাবছে আমি শুধুই একটা তুলতুলে মেয়েমানুষ।'

'যদি গাইড না পাস, ঢাকায় ফিরে আয়। তুই আর আমি কক্সবাজারে বেড়াতে যাব। সিলেটেও যেতে পারি।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না,' বিষণ্ন অথচ দৃঢ় স্বরে তারানা বলল,

'গাইড না পেলেও ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি না। এখানেই থাকব। চেষ্টা চালিয়ে যাব। চেষ্টায় কি না হয়!'

কয়েক সেকেণ্ড নীরব রইলেন ফাতেমা বানু। তারপর বললেন, 'জানতাম। টাকাপয়সা আছে সঙ্গে?'

'আছে। মাস তিনেক চলবে।'

'বেশ। চেষ্টা চালিয়ে যা। কোন বিপদে পড়লে খবর দিস। টাকার দরকার হলেও জানাস।'

ফাতেমা বানুর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ তারানার হৃদয় ছুঁয়ে গেল!

'আর কিছু বলবে, ফুপু?'

'বড়দার কবরের কাছে যদি পৌঁছুতে পারিস, তাহলে আমার সালাম পৌঁছে দিস।'

তারানা বুঝতে পারল, ফাতেমা বানুর গলার স্বর ভারী হয়ে এসেছে। ও তাড়াতাড়ি বলল, 'আচ্ছা, দেব।'

চার

সযত্নে টিস্যু পেপার দিয়ে চোখ মুছল তারানা। হাতব্যাগটা তুলে নিল। ভিতর থেকে দরজার লকের পুশ বাটনে চাপ দিল। বাইরে বেরিয়ে টেনে দিল দরজা। তারপর নেমে এল নিচে। কাউন্টারে চাবি রেখে এগিয়ে গেল কার পার্কের দিকে।

কামার ফরিদের জীপটা সেখানে দেখতে পেয়ে অবাক হয় তারানা। ড্রাইভার জীপ থেকে নেমে এগিয়ে এল ওর দিকে। সালাম দিল।

'আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি, ম্যাডাম। ফরিদ সাহেব আমাকে পাঠিয়েছেন।'

তারানা মৃদু হেসে জীপে উঠল। ছোটখাট দুর্ভাবনা শুরু হলো মনে। ওর অনুরোধের ব্যাপারে ফারুককে রাজি করতে ব্যর্থ হয়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ এই অতিরিক্ত সমাদরের ব্যবস্থা করেনি তো কামার ফরিদ?

সীটে হেলান দিয়ে বসল তারানা। বাইরে তাকাল। সন্ধ্যা নেমেছে বন্দরনগরীতে। সারাদিনের ব্যস্ততা শেষ হয়েছে। এখন বিনোদনের সময়। রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে উঠছে একে একে। আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠছে শপিং সেন্টারগুলো। ভাল লাগছে তারানার। ভাল করে শহরটা ঘুরে দেখা হয়নি।

হঠাৎ একসময় বাঁদিকে টার্ন নিয়ে জীপ ঢুকে পড়ল সুন্দর একটা অট্টালিকার গাড়িবারান্দায়। চারদিকে পুলিশ। চমৎকার করে সাজানো হয়েছে জায়গাটা। ফুলের টবে ভরে ফেলা হয়েছে প্রবেশপথের দু'ধার। প্রেসিডেন্ট এরফান ফুল পছন্দ করেন।

গাড়ি থামতেই কামার ফরিদ নিজে এগিয়ে এসে তারানাকে নামতে সাহায্য করল।

'এসেছেন তাহলে! খুব খুশি হলাম। চলুন, আপনার বসার জায়গা দেখিয়ে দিই। প্রেসিডেন্ট সাহেব এখনই এসে পড়বেন।'

কনফারেন্স রুমে ঢোকার সময় একজন মহিলা কনস্টেবল তারানার হাতব্যাগ পরীক্ষা করল। কামার ফরিদ তারানাকে নির্দিষ্ট আসনে বসিয়ে ক্ষমা চাইল। তার অনেক কাজ। চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

তারানা ঘার ঘুরিয়ে চারদিকে নজর বোলাল। আনোয়ার ফারুককে কোথাও দেখতে না পেয়ে হতাশ হয় সে। দেখতে দেখতে ঘরটা ভরে গেল এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে। খুলনার জেলা প্রশাসক সাহেবকে দেখতে পেল তারানা। পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট তাঁর কানে কানে কথা বলছেন। ডায়াস শূন্য। কয়েকটা দামী চেয়ার আর সাদা কভারে ঢাকা টেবিল চোখে পড়ল। টেবিলে দামী ফুলদানিতে একগুচ্ছ টাটকা ফুল।

আশেপাশে লোকজনের অবিরাম বকবকানি শুনে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তারানা। এমন সময় হুইসেলের শব্দ শুনতে পেল। প্রেসিডেন্ট এসেছেন। হাসিমুখে চেয়ারে বসলেন তিনি। পোর্টের চেয়ারম্যান, স্থানীয় এম. পি. এরাও বসলেন তাঁর পাশে। শুরু হলো আনুষ্ঠানিকতা। মাল্যদান, বক্তৃতা। মুভি আর স্টিল ক্যামেরায় ছবি তোলা হলো। রেকর্ড করা হলো প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা।

তারপর পাশের ঘরে এলেন সবাই চা-চক্রে মিলিত হতে। এ-ঘরে পা দিয়েই তারানা চমকে ওঠে। তার দু'চোখ যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, কাছেই দাঁড়িয়ে সে। তার চেয়েও বড় বিস্ময়ের ব্যাপার, প্রেসিডেন্ট এরফান কথা বলছেন তার সঙ্গে, প্রায় কানে কানে। বোঝা গেল, ফারুক প্রেসিডেন্টের পরিচিত, ঘনিষ্ঠ।

ঠোঁট থেকে চায়ের কাপ নামিয়ে তারানা ভাল করে তাকাল তাদের দিকে। এই প্রথম দেশের প্রেসিডেন্টের সান্নিধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে সে। যে কোন নাগরিকের কাছে রাষ্ট্রপ্রধানের সান্নিধ্য একটা উত্তেজনাকর ব্যাপার। এরফান সম্পর্কে তারানার ধারণা বদলে গেল হঠাৎ। শুনেছিল ভদ্রলোক অত্যন্ত গম্ভীর, রাশভারী ও অহঙ্কারী। একদম বাজে কথা। অত্যন্ত সহজ, স্বাভাবিকভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন। প্রশস্ত কপালের নিচে জ্বলজ্বল করছে তাঁর অকপট, আন্তরিক চোখের দৃষ্টি। সবার সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন তিনি।

কথা বলতে বলতে প্রেসিডেন্ট এগিয়ে এলেন তারানার দিকে। তারানার বুক ঢিপঢিপ করে উঠল। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কিভাবে কথা শুরু করতে হয়, পরিচয় দিতে হয়, কিছুই জানে না সে। কোত্থেকে যেন ছুটে এল কামার ফরিদ। বাঁচাল তাকে। প্রেসিডেন্টের কানের কাছে মুখ নিয়ে বেশ কয়েকটা কথায় তার পরিচয় দিল কামার ফরিদ। তারানা কথাগুলো শুনতে পেল না; শুধু দেখল, প্রেসিডেন্ট এরফান মাথা নাড়ছেন আর এগিয়ে আসছেন তার দিকে।

তারানার দু'ফুট ব্যবধানে এসে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট এরফান। তারানা মিষ্টি হেসে কপালে হাত তুলে সালাম দিল।

'বাবার মৃত্যুর পর আপনি যে ব্যক্তিগত শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন, তার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ, স্যার।'

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভাল লাগছে,' প্রেসিডেন্ট এরফান বললেন, 'ড. আবুল হাশিম ছিলেন আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন, গুণী মানুষ। সারা জীবন জ্ঞানের সাধনায় কাটিয়েছেন। শোকবাণী আমার রুটিন কাজ, মনের সত্যিকার ব্যথা ওতে

বোঝানো যায় না। আপনাকে অন্য কোন ভাবে সাহায্য করতে পারলে আমি খুশি হতাম।'

তারানার বুকের ভিতর ঝড়ো হাওয়া বইছে। খাড়া হয়ে উঠেছে সমস্ত রোমকূপ।

'বাবার রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্তের জন্যে আবেদন করেছিলাম সরকারের কাছে। কোন উত্তর পাইনি। জানি না, কি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

প্রেসিডেন্ট তাঁর একান্ত সচিব আশিক আহমেদ সাহেবের দিকে তাকালেন। আশিক আহমেদ প্রেসিডেন্টের কানে কানে কয়েকটা কথা বললেন। প্রেসিডেন্ট ফিরে তাকালেন তারানার দিকে।

'মিস তারানা, ড. আবুল হাশিমের মৃত্যুর ঘটনার বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে, মানে, আমি বলতে চাই, তদন্তের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু কাঙ্গা পয়েন্টের পর তদন্ত টিম আর এগোতে পারেনি। ড. হাশিমও তাঁর জন্যে অনুমোদিত এলাকা অতিক্রম করে দূরে চলে গিয়েছিলেন। অবশ্য আমরা চেষ্টা করছি তদন্তের কাজটা শেষ করতে। কিন্তু···বুঝতেই পারছেন···এলাকাটা দুর্গম। তা ছাড়া··· কোন সাক্ষী নেই...এমনও হতে পারে, আমরা কেউ কোনদিন জানব না, সত্যি কি কারণে ওই জ্ঞানতাপসকে বেঘোরে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে।'

প্রেসিডেন্টের এ-উত্তরের জন্যে তৈরি ছিল তারানা। দ্বিতীয় আবেদন জানাতে সে দেরি করল না। 'সে ক্ষেত্রে আমার অন্য একটা অনুরোধ আছে, স্যার।'

'বলুন। আমার সরকার আপনাকে সাহায্য করবে।'

'ব্যাপারটায় আপনার সরকারের কোন হাত নেই। ব্যক্তিগতভাবে আপনার সাহায্য চাই, আমি।'

উপস্থিত সবার চোখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠলেও কামার ফরিদ আর আনোয়ার ফারুকের চোখ ছানাবড়া। ওরা বুঝতে পেরেছে, তারানা এবার কি বলবে! তারানা আড়চোখে তাকাল ফারুকের দিকে। ধনুকের ছিলার মত টানটান হয়ে আছে তার শরীর। নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে সে।

'স্যার, আমি খবর পেয়েছি,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল তারানা, 'মংলা থেকে একজন দুঃসাহসী গাইড একটা বিশেষ অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাঙ্গা যাচ্ছে। আমি তার সঙ্গে যেতে চাই। আমি···'

'মিস তারানা হাশিম,' বাধা দিলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর আবার চুপ করে রইলেন ওকে কথা শেষ করতে সুযোগ দিয়ে।

তারানা বলল, 'আমি বাবার কবরটা দেখতে চাই, স্যার। বাবা মৃত্যুর কয়েকদিন আগে তাঁর শেষ অভিযানে শরিক হবার জন্যে আমায় ডেকেছিলেন। আসতে পারিনি। কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে কবরে তাঁর আপনজনের ছোঁয়া পড়বে না, এটা হতে পারে না, স্যার। আমি তাঁর কবরের কাছে দাঁড়াব। বিদায় জানাব তাঁকে।'

প্রেসিডেন্ট এরফান বললেন, 'আপনার মানসিক অবস্থা আমি অনুভব করতে পারছি, মিস তারানা। কিন্তু ভেবে দেখুন, কবরটা সভ্যজগৎ থেকে বহু দূরে···এত দূরে যে সেখানে যাওয়াটা আপনার জন্যে নিরাপদ নয়। বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিচার

করে দেখুন…'

তারানা বলল, 'আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই, স্যার। যত কষ্টই হোক, আমি সেখানে যাবই। শুধু দরকার একজন গাইড। এমন একজন গাইড, যিনি আমাকে সঙ্গে নিতে ভয় পাবেন না।'

চিন্তান্বিত সুরে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'গাইড হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু সত্যিকার বিপদে সে বিশেষ কোন কাজে আসবে না। বিশেষ করে আপনি জঙ্গলের মানুষ নন। এদিককার জঙ্গল সম্পর্কে আপনার হয়তো কোন ধারণাই নেই।'

'বাবার সঙ্গে অনেক জঙ্গলে ঘুরেছি আমি। আফ্রিকার জঙ্গলে ক্যাম্প করে রাত কাটিয়েছি। রিভলভার চালাতে জানি। প্রায় এক নিঃশ্বাসে নিজের জঙ্গল জীবনের অভিজ্ঞতার ফিরিস্তি দিল তারানা।

'আমি শুধু বাঘ-ভালুকের কথা বলছি না, সুন্দরবনের দক্ষিণ অঞ্চলে আজকাল এক নতুন উপদ্রব শুরু হয়েছে। একদল সশস্ত্র লোক রহস্যজনকভাবে ঘোরাফেরা করে ওইসব জায়গায়। বেশ কয়েকবার ডাকাতিও হয়ে গেছে।'

'স্যার, আপনার কি মনে হয়, ওদের হাতেই আমার বাবা…'

প্রেসিডেন্ট এরফান এ-কথার উত্তর না দিয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। হতাশায় তারানার ভেঙে পড়ার দশা। কিন্তু ভেঙে পড়লে তো চলবে না! মন শক্ত করল তারানা। প্রেসিডেন্টের পাশে হাঁটতে হাঁটতে তাকাল তাঁর চোখের দিকে।

'স্যার, আমার বাবা সন্তান, আত্মীয়-স্বজন সবার থেকে দূরে, অসহায় অবস্থায় মারা গেছেন। একা। একেবারে একা। তাঁর কবরটা…আমি…তাঁর সন্তান হয়ে একবার দেখতে পাব না?'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল তারানা। প্রেসিডেন্ট এরফানের চোখের দিকে তাকিয়ে দেখল, সেখানেও অশ্রু টলমল করছে। তারানার আবেদন তাঁকে নাড়া দিয়েছে। প্রেসিডেন্টের ওপর ভক্তি বেড়ে গেল ওর। সাধারণ মানুষের আনন্দে যিনি প্রাণ খুলে হাসেন, তাদের দুঃখে কাঁদেন, তিনিই তো সত্যিকার নেতা!

তারানা আবার বলল, 'জানি, আমি আপনাকে বিব্রত করছি। আপনি পৃথিবীর সোয়া দুই শতাংশ মানুষের নেতা। অমূল্য আপনার সময়। কিন্তু আমার কোন উপায় নেই, স্যার। আমি শুধু বাবার কবরটা দেখতে চাই। আর কিছু চাই না। আপনি ইচ্ছে করলে আমাকে সাহায্য করতে পারেন। শুধু একজন গাইডের ব্যবস্থা করে দিন। কথা দিচ্ছি, আমার কোন বিপদের জন্যে কাউকে দায়ী করব না। দরকার হলে মুচলেকা দিতেও রাজি আছি। শুধু যদি এই সাহায্যটুকু করেন…!'

হলভর্তি মানুষ প্রেসিডেন্টের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রেসিডেন্ট চোখ মুছে সিদ্ধান্ত নিলেন।

'বেশ! সত্যিই কাঙ্গায় বিশেষ অ্যাসাইনমেন্টে যাচ্ছে একটা দল। দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন আনোয়ার ফারুক। আমার মনে হয়, ফারুকের ওপর এ-দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। অন্য কোন গাইডের কথা ভাবতে পারছি না। মিস তারানা হাশিমকে কাঙ্গায় নিয়ে গিয়ে ওঁর বাবার কবর দেখিয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে হবে। আনোয়ার ফারুকের ওপর বেশ চাপ পড়ল। কিন্তু আমার বিশ্বাস, উনি রাজি

হবেন দায়িত্বটা পালন করতে। এটা আমার বিশেষ অনুরোধ।'

কয়েকটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত কাটল।

আনোয়ার ফারুক এগিয়ে এল কামার ফরিদের ইঙ্গিতে। মাথা নিচু করে বলল, 'আপনার আদেশ আমি নিশ্চয়ই পালন করব, স্যার। আমার প্রতিষ্ঠান মেসার্স এফ এণ্ড এফ লিমিটেড আর ব্যক্তিগতভাবে আমার প্রতি অবিচল আস্থার জন্যে আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

তারানা প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, 'আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না, স্যার।'

প্রেসিডেন্ট হাসলেন। সবার কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেলেন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাগণ আর সংবর্ধনা কমিটির পক্ষ থেকে কামার ফরিদ। প্রটোকল বহরসহ প্রেসিডেন্টের সাদা মার্সিডিজ বেঞ্জ পোর্ট কমিউনিটি সেন্টারের ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে গেল রাজহংসীর মহিমায়।

অডিটরিয়ামের ডায়াস থেকে চেয়ার-টেবিল সরিয়ে ফরাস পাতা হয়েছে। শুরু হয়েছে সঙ্গীতানুষ্ঠান। খুলনার বেতার শিল্পী রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনিয়েছেন। এখন আধুনিক গাইছেন ঢাকা থেকে আগত টেলিভিশনের বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী।

ফারুকের চঞ্চল চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে টেলিভিশনের সেই নাট্যশিল্পীকে। গেল কোথায় মেয়েটা? কামার ফরিদকে কাছে পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সুন্দরী কি হাওয়া হয়ে গেল?'

চোখ মটকে ফরিদ বলল, 'তুমি তবে কী করছ এখানে বসে?'

ফারুকের গা জ্বলে যায়। ফরিদ আজ খুব ব্যস্ত। প্রেসিডেন্ট চলে গেছেন অনেকক্ষণ আগে, তবু তার ঝামেলা মেটেনি। ফারুক সীট ছেড়ে উঠে পড়ল। এগিয়ে গেল পেছনের ব্যালকনির দিকে। ব্যালকনি ফাঁকা।

চমৎকার রাত। সম্ভবত অমাবস্যা আজ। একটু একটু বাতাসে কাঁপছে বোগেনভিলিয়া, ঝাউ আর নারিকেলের পাতা। দোলন চাঁপার গন্ধে ভরে আছে জায়গাটা। আহ! প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিল ফারুক। ব্যালকনির শেষ প্রান্তে পৌঁছনোর আগেই থমকে দাঁড়াল।

বন্দরের আবছা আলোর প্রেক্ষাপটে এক আশ্চর্য, মায়াবী শরীরের রেখা। এত স্পষ্ট যে তার চোখের পাপড়িগুলো চিনতেও কষ্ট হয় না। তারানা হাশিম। একটা পালস্ বিট খোয়াল ফারুক। তারপর রেগে গেল নিজের ওপর। নার্ভাস হবার কি আছে? নিজেকে শাসন করল সে।

দূরের ম্লান আলোর প্রেক্ষাপটে কাছের নারীমূর্তি দেখে বিচলিত হবার কোন মানে হয় না। সুন্দর একটা গাছ, পাহাড় কিংবা ঝর্না দেখে কি কারও বুক কাঁপে? সুন্দর লাগে, মুগ্ধতা জাগে, ব্যস! এ পর্যন্তই। কিন্তু যতই বোঝাক, ফারুক তার মনকে ফেরাতে পারছে না। সন্ধেয় মেয়েটি যখন ফরিদের জীপ থেকে নামল, তখন ফারুক আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুরো এক মিনিট তাকিয়ে ছিল তার দিকে। মেয়েটি দেখতে পেয়েছে কিনা কে জানে! কিন্তু কথাটা ফারুক ভুলতে পারছে না। অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, আজ পর্যন্ত সে এত সুন্দরী মেয়ে দেখেনি। এত

বৈশিষ্ট্য ওই হালকা-পাতলা মেয়েটির যে একটুখানি দেখার পরই ওই শরীরের সব রেখা, বাঁক, সব তার মুখস্থ হয়ে গেছে। অন্ধকারে অশরীরী মূর্তির মত দেখেও ওকে চিনতে তাই কষ্ট হয়নি।

অডিটরিয়ামের ভিতরে শিল্পী গান ধরেছেন; 'নিকুঞ্জে দখিনা বায়, করিছে হায় হায়,—লতাপাতা দুলে দুলে ডাকিছে ফিরে ফিরে…'

ফারুক পরের লাইনগুলো জানে। 'দু'জনে দেখা হলো— মধুযামিনীরে—' কিন্তু সেটা আর শুনতে চায় না সে, হতে চায় না মুগ্ধ, কোন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেয়া চলবে না।

প্রথম থেকেই মেয়েটাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে সে। যখন শুনেছে, সে ড. আবুল হাশিমের মেয়ে, তখন আরও বেঁকে বসেছে। নিজের সম্পর্কে তার ধারণা স্পষ্ট। কাঙ্গার মিশনটা পণ্ড হবে ওই মেয়ের সঙ্গে থাকলে। বাঘ-ভালুকের ভয় পায় না সে। দুষ্কৃতকারীদের হাত এড়াবার উপায়ও তার জানা। তার ভয় শুধু আগুনের মত ওই মেয়ে। পুড়ে যাবার ভয়।

তার মিশনের গুরুত্বের কথা জানা আছে কামার ফরিদের। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এরফান জানেন বিষয়টা সম্পর্কে। তারপরও এই বাড়তি দায়িত্ব তাঁরা ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেন! কোন সন্দেহ নেই, তারানা হাশিমের অধ্যবসায় আর সুন্দর চোখের টলমলে অশ্রুর অস্ত্রে পরাভূত হয়েছে সবাই। এখন আর কিছু করার নেই। অনুরোধের ঢেঁকি গিলতেই হবে

ছায়ামূর্তির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল ফারুক। ছায়ামূর্তি এগিয়ে এল। 'শুনুন—'

নারীর গলার স্বরে বিজয়ের গৌরব, না বিব্রতভাব, ফারুক ঠিক বুঝতে পারল না। সে দাঁড়াল, কিন্তু তারানার দিকে তাকাল না।

তারানা মৃদু স্বরে বলল, 'আপনাকে এই ঝামেলায় ফেলতে চাইনি। কিন্তু কী করব? আপনার কপাল খারাপ। মহামান্য প্রেসিডেন্ট অন্য কারও ওপর ভরসা করতে পারছেন না…'

গম্ভীর স্বরে ফারুক বলল, 'তাঁর কথা বাদ দিন। নিজের কথা বলুন। আপনার পারফরম্যান্সটা তো চমৎকার হয়েছিল! মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন সবার!'

তারানা মাথা উঁচু করল। ফারুকের সমান রূঢ় স্বরে বলল, 'এটা পারফরম্যান্স ছিল না, আনোয়ার ফারুক সাহেব। এটা…'

ফারুক বাধা দিয়ে বলল, "সূর্যেরে যে নামে ডাক, আলোক বিতরে", তাই না, মিস তারানা হাশিম? পারফরম্যান্স না বলে এটাকে যে কোন নামে ডাকতে পারেন। কিন্তু পুরুষদেরকে ঘায়েল করার অস্ত্র হিসেবে এর কোন তুলনা হয় না। আশা করি এভাবেই ঘায়েল করেছেন আরও অনেক পুরুষকে…'

তারানা মেঝেয় জুতোর হিল ঠুকল। 'অন্তত একজন পুরুষকে ঘায়েল করার অভিজ্ঞতা থাকলেও আপনার কথার যোগ্য উত্তর দিতে পারতাম, আনোয়ার ফারুক সাহেব। দয়া করে এ-ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য করবেন না।'

ফারুক ঢোক গিলল। একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে, বুঝতে পারল। কথাটা ওভাবে বলতে চায়নি সে। হয়তো অবচেতন মনে জানতে চেয়েছিল, মেয়েটা

কাউকে ভালবাসে টাসে কিনা! উত্তরটা শোনার পর এক ধরনের স্বস্তি পাচ্ছে, এটাও বুঝতে পারল সে। কোন মানে হয় না! নিজের ওপর রাগ বাড়তে লাগল। সে-রাগ গিয়ে পড়তে লাগল তারানার ওপর। ফারুক সিদ্ধান্ত নিল, সে কথা বলবে না।

'প্রেসিডেন্ট কোন অন্যায় সিদ্ধান্ত নেননি, আনোয়ার ফারুক সাহেব,' সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল তারানা। 'তিনি শুধু তাঁর দেশের একজন পিতৃহারা মেয়েকে তার বাবার কবর দেখতে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে ওই "ব্যবস্থার" মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন আপনি। প্রস্তাব যখন মেনে নিয়েছেন, তখন ঠাণ্ডা মাথায় সেটা কার্যকর করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

ফারুক তাকিয়ে রইল তারানার দিকে। তার চোখের তারায় জ্বলজ্বল করছে প্রতিজ্ঞা। বুকের সপ্রতিভ উচ্ছ্বাসে প্রতিজ্ঞার স্বাক্ষর। দু'খানা পায়ের মাঝখানে সামান্য ব্যবধান রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে অটল, অকম্পিত শরীরে, ঋজু ভঙ্গিতে। হাওয়া এসে লুটিয়ে পড়ছে তার শরীরে; সোহাগের পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে চুলে, আর লাবণ্যভরা কাঁধে, পিঠে; শাড়িটা লেপ্টে দিচ্ছে শরীরের ভয়ানক ধারাল রেখাগুলোর সঙ্গে।

শিউরে উঠল ফারুক। বিপদ আসছে। শুধু এই ভয়ে সে তারানাকে কাঙ্গায় যেতে নিরুৎসাহিত করেছে। নিজেকেই বেশি ভয় পেয়েছে সে। কিছুতেই রাজি হত না ওকে নিয়ে যেতে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরফান এসে পড়েছেন দৃশ্যপটের ভিতর। তাঁর ইচ্ছের বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় ফারুকের পক্ষে। যা হবার হয়ে গেছে। এখন ওসব ভেবেও কোন লাভ নেই। এখন শুধু সাবধান থাকতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে নৈকট্য। দমন করতে হবে বেপরোয়া, বেয়াড়া, মনটাকে।

মুহূর্তের মধ্যে সহজ সুর এল ওর গলায়। 'ঠিক আছে, মিস তারানা হাশিম। আমরা একসঙ্গে কাঙ্গা যাচ্ছি। আশা করি, ট্রিপটা সফল হবে। যাত্রাপথে যেসব জিনিসের দরকার হবে, তার একটা তালিকা তৈরি করে হোটেলে পাঠিয়ে দেব। কালকের মধ্যেই কিনে ফেলবেন। পরশুদিন ভোরে রওনা হব আমরা। ভোর পাঁচটার মধ্যে প্রস্তুত হবেন।'

তারানার মুখে হাসি ফুটল। 'ভোরে ওঠার অভ্যেস আছে আমার। কিচ্ছু ভাববেন না। সময়মত রেডি থাকব, দেখবেন।'

'আর একটা কথা মনে রাখবেন। এটা কঠোর, কঠিন, সত্যিকার জীবন। টেলিভিশনের নাটক নয়। ভাবাবেগের কোন মূল্য নেই এখানে।'

'জানি। আপনাকেও জানিয়ে রাখি, টেলিভিশনের নাটকটা ভাবাবেগপূর্ণ হতে পারে, কিন্তু ওটা তৈরি করে বাস্তববাদী মানুষেরা। আমি তাদেরই একজন। নাটক দেখতে দেখতে যেমন ভাবাবেগে আপ্লুত হওয়া যায়, তেমন ভাবে নাটক তৈরি করা যায় না। স্টুডিওর ভিতরটাও কঠোর, কঠিন, সত্যিকার জীবন। ভাবাবেগের মূল্য নেই সেখানে। তা ছাড়া নাটক আর জীবনকে আমি গুলিয়ে ফেলি না। অকারণ দুশ্চিন্তা করবেন না।'

আর কোনদিকে না তাকিয়ে আলোকোজ্জ্বল অডিটরিয়ামে ঢুকে পড়ল তারানা। ফারুক দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাকাল ডায়াসের দিকে। গীটারে রবীন্দ্র

সঙ্গীতের সুর বাজাচ্ছেন একজন শিল্পী। গানটা ফারুকের মনে পড়ল: 'তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা,/আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি, সকলই হয়েছে বোঝা।'

পাঁচ

ফারুক যে ওকে কাঙ্গায় নিয়ে যেতে চায়নি, বারবার নিরুৎসাহ করেছে আর মত পাল্টাতে অনুরোধ করেছে, এটা এক মুহূর্তের জন্যেও ভোলেনি তারানা। ফারুকের কাছ থেকে বন্ধুসুলভ কোন আচরণও আশা করেনি সে। তা সত্ত্বেও যাত্রার শুরুটা এমন নীরস, নির্মম হবে, ভাবতে পারেনি।

ভোরের আলো ফোটার আগে সব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাগে ভরে সালোয়ার-কামিজ পরে তারানা জেটিতে এসে পৌঁছুল। আকাশে মেঘ। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া বইছে। নদীতে ভয়ঙ্কর তরঙ্গভঙ্গ। তারানার মুখ শুকিয়ে গেল। বন্দর ভবনের দিকে তাকাল সে। কোন বিপদ সঙ্কেত দেখতে পেল না। এত খারাপ আবহাওয়া, তবু কোন বিপদ সঙ্কেত টাঙানো হয়নি কেন, কে জানে? ভেবেছিল, জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু আনোয়ার ফারুকের মুখের অবস্থা আকাশের চেয়েও মেঘলা। জিজ্ঞেস করতে সাহস হলো না। চুপচাপ ব্যাগটা জেটির ওপর নামিয়ে কিনারায় দাঁড়াল সে।

ফারুক রুক্ষ স্বরে চেঁচিয়ে একজন মাঝিকে ডাকল। 'ব্যাগটা ছাদের ওপর উঠিয়ে রাখো। মেমসাহেবকে রাখো সামনের কামরায়, পেছনের সীটে।'

গা জ্বলে গেল তারানার। ভাষা কি! 'মেমসাহেবকে রাখো সামনের কামরায়!' মেমসাহেবও ব্যাগের মত একটা মাল নাকি!

একজন লোক এসে তারানার ব্যাগটা তুলে নিয়ে নৌকায় উঠল। ভাল করে লক্ষ করে তারানা। বেশ বড় সাইজের নৌকা, নাম 'বনদেবী'। ভিতরে মোটর বসানো। ছোট ছোট দুটো কামরায় বিভক্ত নৌকাটা। ছাদের ওপর পলিথিন কাগজের পুরু আস্তরণ। তার ওপর ত্রিপল। ত্রিপলের নিচে আরও কয়েকটা ব্যাগ। তারানার ব্যাগ ত্রিপলের নিচে বেঁধে রেখে লোকটা ফিরে এল।

'উইঠে পড়েন, মেমসাহেব।'

তারানা এগিয়ে যায়। বাতাসের ঝাপটায় বড় বড় ঢেউ উঠছে নদীতে। নৌকা দুলছে প্রবলভাবে। তারানা নৌকায় নেমে দেখল, পেছনের সীটে বসে আছে অল্প বয়সের একটা ছেলে। চেহারাটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কিন্তু মনে করতে পারল না, কবে, কোথায় দেখেছে।

'আসেন, আপা,' ছেলেটি তার হাত ধরে নৌকার দুলুনি সামলে সীটে বসতে সাহায্য করল। 'মুরাদ, আপার পিঠে একটা গদি দাও।'

যে-লোকটা তারানার ব্যাগ উঠিয়ে রেখেছে, সে এগিয়ে এল। পিছনের কামরা থেকে বার করল গদি। তারানা দেখল, তাদের সামনে পাশাপাশি দুটো আসন। ডান দিকেরটা ড্রাইভারের। বাইরে থেকে দেখতে সাদামাঠা দেশি নৌকা হলেও ভিতরে অনেক আধুনিক ব্যবস্থা আছে। হালের বদলে ব্যবহার করা হয় স্টিয়ারিং।

গুণ, ইত্যাদির ব্যবস্থাও আছে। বড় জাহাজ চালায় ক্যাপ্টেন। লঞ্চের ড্রাইভারকে বলা হয় সারেং। এত ছোট লঞ্চ বা মোটরচালিত নৌকার চালককে কি বলা যায়, তারানা ভেবে পায় না। মাঝি পদবীতে নিশ্চয়ই খুশি হবে না সে!

মাঝি, বা সারেং যা-ই হোক, লোকটার নাম মুজিবর। ফারুকের ইঙ্গিত পেয়ে উঠে বসল। রাইফেল হাতে নিয়ে আরও একটা লোক উঠল পিছনে। মুরাদ হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে ইঞ্জিন চালু করল। তীব্র, বিরক্তিকর শব্দে পানি কাটতে শুরু করল সেটা। সবার শেষে উঠে বসল ফারুক, তারানার সামনের সীটে। মংলা বন্দর ছেড়ে এগিয়ে চলল বনদেবী। তারানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। অজানার পানে এগিয়ে চলল সে। দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল মংলার বাড়ি-ঘর, প্রকাণ্ড বন্দর ভবন, হেলিপোর্ট।

মাঝে মাঝে দুলে উঠছে নৌকা। দুলুনি সামলাতে সামনের সীটের পেছনে হাত রাখল সে। ফারুকও সেখানে হাত রেখেছে। দুলুনির ফলে ফারুকের শক্ত, লোমশ হাতের ঘষা লাগছে তারানার কাঁধের নরম পেশিতে। ফারুক ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতন কিনা, তারানা জানে না। কিন্তু সে নিজে একটু একটু কাঁপছে, বুঝতে পারল।

বেলা বাড়ে। নদীর পারে সবুজ গাছগাছালির ওপর ফুটে ওঠে কমলা রঙের রোদ। নদীতে ঝলসে ওঠে সোনালী ঢেউ। তারানা মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে ফারুকের মুখভঙ্গি লক্ষ করে। ফারুক উদাসীন, নির্বিকার। তাকে দেখে মনে হয় না, মুজিবর ছাড়া 'বনদেবী'-তে আর কোন যাত্রী আছে। শুধু মুজিবরের সঙ্গেই দু'চারটে কথা বলছে সে, বেশির ভাগই গোলপাতা আর চিংড়ি চাষ বিষয়ে। তারানা বিষয়টা বোঝে না, আগ্রহও নেই। প্রথম দু'ঘণ্টা এভাবেই চলল। ফারুক ফিরেও তাকাল না তারানার দিকে। তারানার মনে হলো, পুরো যাত্রাটা এভাবেই কাটবে; কথা বলার সুযোগ পাবে না সে। নদীপারের দৃশ্য কিছুক্ষণের মধ্যেই একঘেয়ে মনে হলো। ভোরের আরামদায়ক অবস্থা কেটে গেল; রোদের তাপ বাড়ল। তার সঙ্গে বাড়ল হাওয়ায় লোনা ভাব। তারানার মনে হলো, তার সারা শরীরে কে যেন লবণ মাখিয়ে দিয়েছে। বেলা যত বাড়ল, তত তপ্ত হয়ে উঠল পরিবেশ আর অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তারানা।

মুজিবর প্রস্তাব করেছিল, বনদেবী কূলে ভিড়িয়ে নাশতা করবে ওরা। কিন্তু ফারুক রাজি হলো না। 'কোন দরকার নেই নৌকা ভিড়ানোর। চলতে চলতেই নাশতা খাওয়া যায়। শুধু তুমি যখন নাশতা খাবে, স্টিয়ারিং হুইল ছেড়ে দেবে আমার হাতে।'

ছোট ছোট পলিথিন প্যাকেটে নাশতা বিতরণ করল ওয়াজেদ আলী। আটার রুটি, ডিম আর সুজির হালুয়া। তারানা একটু খাবার মুখে দিয়েই খাওয়ার রুচি হারিয়ে ফেলল। বমি আসছিল তার। ওয়াজেদ একটা ডাব কেটে এগিয়ে দিল তার দিকে। যুদ্ধক্ষেত্রের তৃষ্ণার্ত সৈনিকের মত নিমেষে ডাবের পানিটুকু খেয়ে ফেলল তারানা। তৃপ্তির সঙ্গে মুখ মুছল কামিজের কোণায়।

ফারুক টিফিন বক্স খুলে বাড়িয়ে ধরল তারানার দিকে। ব্যাখ্যার সুরে বলল, 'জানতাম, ট্যুরিস্টের নাশতা আপনার মুখে রুচবে না। নিন, খেয়ে নিন।'

'কী?'

ফারুকের স্বর ভাবলেশহীন। 'ঝাল-মাংস। লোনা আবহাওয়ায় খেতে খুবই চমৎকার।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারানার মুখে হাসির আভাস। এক টুকরো মাংস তুলে মুখে দিল। আরও এক টুকরো।

ফারুক আবার মুখ ফিরিয়ে নদীর দৃশ্য দেখতে লাগল। তারানা তৃপ্তির সঙ্গে খেলো। তারপর আন্তরিক সুরে সংক্ষেপে বলল, 'থ্যাঙ্কস্।'

ফারুক যেন কথাটা শুনতে পায়নি, এমনিভাবে বলল, 'মুজিবর, আরও জোরে চালাও। আড়াইটে-তিনটে নাগাদ শিবসা পয়েন্টে পৌঁছতে চাই। দেরি হয়ে গেলে বাঘের পেটে পড়তে হবে।'

তারানা বেশ বুঝতে পারছে, কথাটা তাকে ভয় দেখানোর জন্যেই বলা। সে-ও কথাটা না শোনার ভান করে বলল, 'ওয়াজেদ, আর একটা ডাব দেবে?'

ওয়াজেদ ডাব আর দা বার করল।

ফারুক স্টিয়ারিং হুইল ধরে রইল, নাশতা করার সুযোগ দিল মুজিবরকে। তারানা তার সীটে হেলান দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়ল। পরপর কয়েকদিন ভালভাবে ঘুম হচ্ছে না তার।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, তারানা জানে না। হঠাৎ ঘুম ভাঙল ফারুকের ডাকে। তারানা চোখ কচলে দেখল, বনদেবী কূলে ভিড়েছে। ডাঙায় নেমে পড়েছে ফারুক।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হোক,' হালকা রসিকতার সুরে ফারুক বলল, 'উঠে আসুন। আপনাকে একটা মজার জিনিস দেখাই।'

তারানা ঘুমের রেশ সামলে অনেক কষ্টে ডাঙায় উঠল। ফারুক সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়িয়েছিল, মৃদু স্বরে সে-অফার প্রত্যাখ্যান করেছে তারানা।

অবাক চোখে তাকিয়ে তারানা দেখল, যতদূর দৃষ্টি যায়, একই মাপের গাছের সারি। সুন্দরবনে ঢুকে পড়েছে ওরা। ফারুকের কাছ থেকে অন্তত একটা জিনিস আশা করেছিল তারানা: সে গাইডের দায়িত্বটুকু পালন করবে। গাইড শুধু ট্যুরিস্টের নিরাপত্তার ব্যাপারটা দেখে না, পথের নানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানদান করে, তাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কৌতূহল মেটায়। কিন্তু লোকটা যেন মুখে তালা এঁটে বসে আছে! হতাশ হয়ে পড়েছিল তারানা। কিন্তু লোকটার হাবভাব বোঝা মুশকিল। হঠাৎ ডাঙায় উঠিয়ে নিয়ে কি দেখাতে চায় সে?

পকেট থেকে বাইনোকিউলার বার করে নদীর অপর পারের দৃশ্য দেখছে ফারুক। তারানার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'আমার পাশে এসে দাঁড়ান।'

তারানা প্রতিবাদ না করে হুকুম তামিল করল।

বাইনোকিউলার ওর হাতে দিয়ে ফারুক বলল, 'দেখুন, অবাক হয়ে যাবেন।'

তারানা শুধু বালিয়াড়ি, নদীতে ভেঙে পড়া মাটি আর দূরের সুন্দরী গাছের সারি দেখতে পায়। 'কই? অবাক হবার মত তেমন কিছু তো দেখছি না!'

'বোতামটা ঘোরাতে থাকুন, দিগন্তরেখা দেখার চেষ্টা করুন।'

তারানা চেষ্টা করল, তারপর হতাশ হয়ে বাইনোকিউলার নামাল চোখ থেকে। ফারুক ওর শরীর ঘেঁষে দাঁড়াল। বাইনোকিউলারের লেন্স অ্যাডজাস্ট

করল তারানার অবস্থানে দাঁড়িয়ে। তারানার কাঁধ বেষ্টন করল ওর শক্ত, পেশিবহুল হাত।

'এবার দেখুন।'

সত্যিই দেখার মত জিনিস। বনের ধার ঘেঁষে হেলেদুলে হাঁটছে একপাল হরিণ। অপরূপ, মায়াভরা চোখে তাকাচ্ছে একবার নদীর দিকে, আর একবার জঙ্গলের দিকে। এই দু'পথেই তাদের আততায়ীরা আসে। জঙ্গল থেকে আসে বাঘ, নদীপথে মানুষ। বাঘের হিংস্রতা আর মানুষের অহং— দুই শত্রুই ওই নিরীহ প্রাণীর কাছে মারাত্মক।

চারপাশের সবকিছু ভুলে প্রায় চিৎকার করে ওঠে তারানা, 'দারুণ!'

পাশে দাঁড়িয়ে ফারুক তার অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। 'কত বড় দল, দেখেছেন!'

তারানা আরও অবাক হয়ে দেখল, এত বড় পালের মধ্যেও হরিণগুলো চলছে জোড়ায় জোড়ায়, সুশৃঙ্খলভাবে। কোন জোড়া অপর জোড়াকে বিরক্ত করছে না। এটা ওদের ভালবাসার সময়; ঘৃণার নয়।

অনেকক্ষণ অপলক চোখে তাকিয়ে দেখল তারানা। হঠাৎ লজ্জা পেল। বাইনোকিউলার নামিয়ে নিল চোখ থেকে। মুখ রক্তাভ হয়ে উঠেছে। ওর বিব্রতভাব কাটানোর জন্যে ফারুক বলল, 'এ দৃশ্য শুধু দূর থেকেই দেখা যায়। ওরা যদি কোনক্রমে টের পায়, আপনি দেখছেন, সঙ্গে সঙ্গে ছুটে পালাবে। নৌকা থামাতে বাধ্য হলাম। চলন্ত নৌকা থেকে এ-দৃশ্য দেখতে পেতেন না।'

ওদের সফরসঙ্গীরা ডাঙায় উঠে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। ফারুকের ইঙ্গিত পেয়ে আবার নৌকায় উঠল তারা।

মুগ্ধতার আবেশ তখনও লেগে আছে তারানার চোখের দৃষ্টিতে, গলার স্বরে।

'এত বড় সুশৃঙ্খল পশুর দল কখনও দেখিনি।'

ফারুক বলল, 'আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। আমার ধারণা, মানুষের স্বভাব পশুর বিপরীত। দলবদ্ধ অবস্থায় পশুর চরিত্র বদলায় না। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের চেয়ে দলবদ্ধ মানুষের চরিত্র খারাপ। দুনিয়ায় সবচেয়ে খারাপ কাজগুলো করেছে দলবদ্ধ মানুষ। কথাগুলো শুনতে খারাপ। কিন্তু সত্যি।'

তারানা ফারুকের মুখের পানে চেয়ে রইল। কথাগুলো ভাবিয়ে তুলেছে তাকে। শুধু কি কথা? মানুষটা নিজে কি তাকে একটুও ভাবিয়ে তুলছে না?

ফারুক বনদেবী-তে উঠে তারানার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু হাত বাড়াল না। বারবার বিব্রত হতে পছন্দ করে না সে। তারানা নিজেই উঠল নৌকায়, কিন্তু হঠাৎ দুলুনি সহ্য করতে না পেয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ঝুঁকে পড়ল এক পাশে। ওয়াজেদ সময়মত ধরে না ফেললে পড়ে যেত সে।

এঞ্জিনের শব্দ শুরু হলো আবার। বনদেবী ঢেউয়ের বাধা পার হয়ে এগিয়ে চলল দক্ষিণে। কিছুদূর এগিয়ে তারানা বাইনোকিউলার চোখে লাগাল। ঠিকই বলেছে আনোয়ার ফারুক। দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে হরিণ-হরিণীরা। 'ভাঙল মিলন-মেলা!' গানের সুর ভাঁজল তারানা। হঠাৎ লক্ষ করল, ফারুক আড়চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। সুর ভাঁজা থামাল সে। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার, একগুঁয়ে আর

বদমেজাজী লোকটার ঠোঁটের ফাঁকে হাসি। তারানা মনে মনে সাবধান হয়ে গেল।

আরও একটা ব্যাপারে সাবধান হওয়া দরকার। তারানার মনে পড়ল, বাবা বলেছিলেন, 'যেখানে হরিণ দেখতে পাবে, সেখানে বাঘেরও দেখা পাওয়া যাবে।' সে আশা করেছিল, আনোয়ার ফারুক এ-বিষয়ে কিছু বলবে। কিন্তু বাঘের প্রসঙ্গ তুলল না ফারুক।

শিবসা পয়েন্টে পৌঁছতে প্রায় চারটে বাজল। একটা বড় বাঁক পার হয়ে বনদেবী যখন শিবসা পয়েন্টের জেটির দিকে এগোতে শুরু করেছে ঘাড় ফিরিয়ে সফরসঙ্গীদের উদ্দেশে ফারুক বলল, 'আজ এই পর্যন্ত। ক্যাম্পিং-এর জন্যে রেডি হয়ে যান সবাই।'

অবসন্ন শরীরে নৌকা থেকে নামল তারানা। প্রথম দিনেই এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ভেবে ঘাবড়ে গেল। একে একে সবাই নামল জেটিতে। জায়গাটা নামেই শিবসা। না আছে মংলার 'শিবসার' মত কোন হোটেল, না কোন রেস্ট হাউজ। কয়েকটা ছোট ছোট বাঙলো টাইপের বাড়ি আছে। সেগুলো বন বিভাগের কর্মকর্তাদের। বিডিআর-এর একটা দোচালা আছে, কিন্তু তাতে সবার সংকুলান হয় না। ফোর্সের বেশির ভাগই থাকে তাঁবু খাটিয়ে। অস্ত্র হাতে নিয়ে পালা করে রাত জাগে তারা।

প্রায় তিন ফার্লং পথ হেঁটে ওরা একটা মাঠে পৌঁছল। কাঁধ থেকে বোঝা নামিয়ে সবাই বিশ্রাম নিল কয়েক মিনিট। তারপর শুরু হলো তাঁবু খাটানোর কাজ। তারানা ওদেরকে সাহায্য করতে চেয়েছিল। ফারুক বাধা দিল। নিজের কাঁধের ব্যাগটা গাছের গোড়ায় নামিয়ে রেখে তার ওপর বসে গুঁড়িতে হেলান দিল তারানা। অবসন্ন চোখে তাকিয়ে রইল কর্মীদের দিকে। ধরাধরি করে আধঘণ্টার মধ্যেই চারটে তাঁবু খাটাল। সবচেয়ে ছোট তাঁবুটা তারানার। বেশ কিছুটা দূরে একটু তাঁবুতে শোবে ফারুক। তার পেছনে একটা বিরাট তাঁবু। এরকম আরও একটা বড় তাঁবু খাটানো হয়েছে মাঠের শেষ প্রান্তে। এই দুটো বড় তাঁবুতে থাকবে অবশিষ্ট সফরসঙ্গীরা।

ফারুক তারানার কাছে এসে দাঁড়াল। 'আপনার মহল তৈরি। ঢুকে রেস্ট নিতে পারেন।'

তারানা এদিক-ওদিক তাকাল।

ফারুক আবার বলল, 'ভয় পাবেন না। আমরা কাছেই আছি। অনেক কাজ আমাদের। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ঝাল মুরগি নিশ্চয়ই এতক্ষণে হজম হয়ে গেছে, তাই না?'

তারানা হাসল। 'ঠিক আছে। একটু রেস্ট নিয়ে আমি সাহায্য করব আপনাদের।'

হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল তারানা। ঘাসের ওপর ত্রিপল বিছানো হয়েছে। তার ওপর বাতাস দিয়ে ফোলানো তোশক। ব্যাগ খুলে দুটো চাদর বার করল তারানা। একটা বিছিয়ে নিল তোশকের ওপর। অন্যটা মুড়ে বালিশের বিকল্প হিসেবে মাথার নিচে দিল।

দরজার ওধারে ওয়াজেদ আলীর গলা। 'আপা, কিছু লাগবে?'
'না, ওয়াজেদ। শুধু···একটা জিনিস···'
'বলেন, আপা।'
'কি যেন একটা গন্ধ লাগছে···বুঝতে পারছি না···
ওয়াজেদ হাসল। 'ওষুধ স্প্রে করা হয়েছে, আপা।'
'কেন?'
'যাতে সাপ-বিছে বা ওই ধরনের কিছু তাঁবুতে না ঢোকে।'
'ও!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল তারানা। 'আচ্ছা, তুমি যেতে পারো।'
কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই আবার ঘুমিয়ে পড়ল তারানা।

ঘুম ভাঙল সন্ধের বেশ কিছুক্ষণ পর। তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে তারানা দেখল, কে যেন প্লাস্টিকের বালতিতে পানি রেখে গেছে। হয়তো ওয়াজেদ। চোখে-মুখে পানির ঝাপটা দিল সে। বেশ ভাল লাগছে এখন।

গাঢ় অন্ধকার চারদিকে। পঞ্চাশ গজের মধ্যেই নিবিড় জঙ্গলের শুরু। অন্ধকারে সেদিকে তাকালে গা ছমছম করে ওঠে। মাঠের ভিতরে তাঁবুগুলোতেও আলো নেই। তারানা ব্যাগ হাতড়ায়। একটা দেশলাই বাক্স রেখেছিল, সেটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন অবস্থায় একটু আলো একজন সঙ্গীর চেয়েও বড়। দেশলাই খুঁজে বার করবার চেষ্টা বাদ দিয়ে তারানা এগিয়ে গেল বড় তাঁবুর দিকে। বড় তাঁবুর পাশে হ্যাজাক লাইট জ্বলছে। মশলার ঘ্রাণ আসছে সেখান থেকে। রান্না হচ্ছে। পেটের ভিতর খিদে মোচড় দিয়ে উঠল। আজ খাবার ব্যাপারে বেশ অনিয়ম হয়ে গেছে। সকালের নাশতা খাওয়া হয়েছে অসময়ে। দুপুরে খাওয়া হয়নি। এখন কত রাত, কে জানে!

চুলোর কাছেই গোল হয়ে বসে আছে ফারুক আর সফরসঙ্গীরা। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। আগুনের আঁচটা খারাপ লাগছে না। লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে লোকগুলোর মুখে। তারানা নেশাগ্রস্তের মত ফারুকের দিকে তাকিয়ে রইল। ওকে দেখতে লাগছে ঠিক ব্রোঞ্জের তৈবি রোমান দেবতার মূর্তির মত। কাছেই পড়ে আছে কয়েকটা প্লেট আর গ্লাস। একটা ম্যাপ বিছিয়ে মন দিয়ে লক্ষ করছে ফারুক। কথা বলছে সুন্দরবনের এক অপ্রচলিত, স্থানীয় ভাষায়। তারানা একটুও বুঝল না সে-ভাষা। সে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সবাই মুখ তুলল। আঞ্চলিক ভাষায় কি-যেন বলল ফারুক। সফরসঙ্গীরা হেসে উঠল।

ফারুক বলল, 'ডিনারের আর বেশি দেরি নেই, ম্যাডাম। তবে অসুবিধে এই যে, ডাইনিং টেবিল জুটবে না এখানে। প্লেট হাতে নিয়ে খেতে হবে।'
'এ-জন্যেই হাসছেন?' গম্ভীর স্বরে বলল তারানা।
ফারুক বলল, 'না। আমি ওদেরকে বললাম, "এই যে, রাজকুমারী অবশেষে আমাদের আসরে যোগ দিতে রাজি হয়েছেন।" দুঃখ-কষ্টের মধ্যে মানুষ অল্পেই উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে, জানেন?'
তারানা লজ্জা পেল। 'আসলে খুব ক্লান্ত ছিলাম। কিছুতেই জেগে থাকতে পারছিলাম না।'
ওয়াজেদ বলল, 'লম্বা ঘুম দিয়েছেন, আপা। আসেন, বসেন।'

তারানা ওয়াজেদের পাশে বসল। 'সুখাদ্যের ঘ্রাণেই ঘুমটা ভেঙে গেছে। খিদেটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।'

ফারুক হাসল। 'সবুরে মেওয়া ফলে। মুরাদ, জলদি হাত লাগাও।'

'রান্নার সব জিনিসপত্র আপনারা নৌকায় বয়ে বেড়ান?'

মুরাদ চুলা থেকে তরকারির হাঁড়ি নামিয়ে রেখে বলল, 'জরুরী বাসনপত্রের বেশির ভাগই আমাদের নৌকায় মজুদ থাকে। এরপর দরকার হলে নদীর পারের হাট-বাজার থেকে সংগ্রহ করি। একদিন নৌবাহিনীর এক গানবোট থেকে পিঁয়াজ চেয়ে নিয়ে ব্যবহার করেছি।'

খাবারপরিবেশন করল মুরাদ। ওয়াজেদ, মতি আর খায়ের সাহায্য করল তাকে। দূর থেকে ঘ্রাণ পেয়ে তারানার খিদে লেগেছিল। খাবার দেখার পর ও আকুল হয়ে পড়ল। মস্ত আয়োজন। ভাত, ইলিশের দো-পেঁয়াজা, খাসির মাংস, বেগুনভাজা, ডাল, সালাদ। সবার শেষে পায়েস।

তারানা খেতে খেতে বিস্মিত হয়ে বলল, 'কে রেঁধেছে?'

উত্তর এল, 'আমাদের সব খাবার রান্না করে মুরাদ।'

'দারুণ!' প্রশংসার ভাষা খুঁজে পায় না তারানা, 'মেয়েদেরকে লজ্জা দেবার মত রান্না করেছ!'

ফারুক গম্ভীর মুখে বলল, 'উঁহুঁ, একটু ভুল হলো। মেয়েদের লজ্জা পাবার প্রশ্নই ওঠে না। দুনিয়ার ভাল কুকদের প্রায় সবাই পুরুষ।'

'বেগুনভাজা আরও একটুকরো নেবেন, আপা?

তারানা সম্মতি জানাল মাথা কাত করে। মুরাদ মহাখুশি। কেউ তার রান্নার প্রশংসা করে না।

'আপা, সুযোগ পেলে মোগলাই পরোটা বানিয়ে আপনাকে খাওয়াব।'

তারানার চোখে প্রশস্তির চিহ্ন। 'খুব ভাল রাঁধতে জানো তুমি। কোত্থেকে শিখেছ?'

উত্তর এল, 'ফারুক সাহেবের কাছ থেকে। আমাকে সব রকমের রান্না শিখিয়েছেন উনি। জানেন, আপা, "এফ এণ্ড এফ লিমিটেডের" চাকরিতে জয়েন করার আগে ভাত রান্না করতেও জানতাম না।'

'ও!' সংক্ষেপে প্রত্যুত্তর দিয়ে চুপ করে রইল তারানা। তার ভাল লাগার সব ক্ষেত্রগুলো ওই অহঙ্কারী, জেদী পুরুষলোকটার সীমানা ছুঁয়ে যাচ্ছে। এমন পরস্পর বিরোধী চরিত্র একই মানুষের মধ্যে কিভাবে থাকে, তারানা ভেবে পায় না। শত অনুনয় সত্ত্বেও সে তারানাকে কাঙ্গায় নিয়ে যেতে চায়নি। কারও কোন অনুরোধে কান দেয়নি। কিন্তু প্রেসিডেন্ট এরফানের অনুরোধের পর কোন ওজর-আপত্তি করল না। একটা যুক্তিও খাড়া করল না। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। যাত্রার শুরুতে এমন ভাব দেখাল যে তারানাকে সে চেনেই না। অথচ হরিণের দৃশ্যটা দেখাল ঠিক একজন প্রিয় মানুষের মত।

খাওয়ার পর তারানা প্লেট-গ্লাস গুছিয়ে নিজের কাছে টেনে নিচ্ছিল। সেগুলো কেড়ে নিল ওয়াজেদ। 'না, আপা, আপনাকে কিছু করতে হবে না।'

মাঠের ফাঁকা অংশে পায়চারি করতে লাগল তারানা। এক সময় দেখল,

ফারুক কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন, কে জানে, তারানা সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। মাথার ওপর তারায় তারায় খচিত অনন্ত আকাশ। সামনে নদী, পিছনে জঙ্গল। কাছে একজন মানুষ। তার কতটা নৈকট্য সহ্য করতে পারবে, তারানা জানে না। অথচ তার মনে হলো, এই অচেনা পরিবেশ চারদিক থেকে চেপে ধরছে তাকে; লোকটির সঙ্গে নিবিড় নৈকট্যে একাকার হবার জন্যে প্ররোচিত করছে। কিন্তু তারানা কোন ফাঁদেই পা দেবে না।

ফারুক কয়েক সেকেণ্ড লক্ষ করল তাকে। তারপর সাদামাঠা সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

'ভাল না।'

'টায়ার্ড?'

'হুঁ। পেট পুরে খাওয়া-দাওয়া করার পর আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।'

'কিন্তু কালকের দিনটা আরও খারাপ যাবে। আরও বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। আবহাওয়ায় লোনাভাব যত বাড়বে, তত খারাপ লাগবে আপনার। সবাই এ-আবহাওয়া সহ্য করতে পারে না। তাঁবুতে চলে যান বরং। ভাল করে ঘুমান। কালকের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে আপনাকে।'

তারানা নীরবে হাঁটতে শুরু করল তার তাঁবুর দিকে। তাঁবুর দরজায় পৌঁছে ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, ফারুক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

'অদ্ভুত লোক!' বিড়বিড় করে বলল তারানা, 'কখন যে সহানুভূতিশীল আর কখন নির্দয়, বোঝা যায় না।'

আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। তাঁবুর ভিতরে ঢুকে দেখল, চীনামাটির তশতরির ওপর মোম জ্বলছে। কাছেই একটা দেশলাই বাক্স। অনেকক্ষণ মোমের অকম্পিত শিখার দিকে তাকিয়ে রইল তারানা। তারপর ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিল সেটা।

সারাদিনের মধ্যে এই প্রথম কথাটা মনে পড়ল: ও যাচ্ছে কাঙ্গা। বিজনপুর। বাবার কবর দেখতে যাচ্ছে সে। কবরের ভিতরটা কেমন? এই তাঁবুর ভিতরের অংশটার মতই? এমন গাঢ় অন্ধকার? ঠিক এমন একটা জায়গায়, এমন অন্ধকারে শুয়ে আছেন তার বাবা? হঠাৎ বাবার সঙ্গে আশ্চর্য একাত্মতা বোধ করল তারানা। তাঁর শেষ অনুরোধ রাখতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, অশেষ কষ্ট স্বীকার করে কাঙ্গা যাচ্ছে তারানা। শুধু দুঃখ এই যে, দেরি হয়ে গেছে। তারানার এ-অভিযানের কথা বাবা জানবেন না; কোনদিনই না। তবু সান্ত্বনা, তারানা তাঁর কবর দেখতে যাচ্ছে। সে প্রমাণ করবে, ড. আবুল হাশিম একা, নিঃসঙ্গ নন। দেশের এক প্রান্তে, সমুদ্রের কূলে, জঙ্গলের মাঝখানে তাঁর কবর কোন আত্মীয়, বংশধর আর প্রিয়জনের স্পর্শলাভ করবে না, এমন দুর্ভাগা তিনি নন।

এরপর জীবনের যে-কোন পরিণতি মেনে নিতে আপত্তি নেই তারানার। সে বুঝতে পারল; তার দু'চোখ জলে ভরে গেছে। অন্ধকার হয়ে উঠেছে আরও গাঢ়, আরও অসহনীয়। চোখ থেকে পালিয়েছে ঘুম।

ছয়

অনেকক্ষণ কেঁদে বিছানায় উঠে বসল তারানা। বেশ হালকা লাগছে। ঘাড়ের বোঝা বওয়া যায়, মনের বোঝা বওয়া যায় না। এলোমেলোভাবে অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে সে এক সময় আবিষ্কার করে, দাম্ভিক লোকটার কথাই তার মন জুড়ে রয়েছে। কিছুতেই সেখান থেকে তাড়ানো যাচ্ছে না তাকে।

'ভাল করে ঘুমান। কালকের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে আপনাকে'—এই কথাটা কতবার যে মনে পড়ল, তার হিসেব নেই। কিন্তু ঘুম কোথায়? তারানার সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো।

এক সময় মনে হলো, তার অস্বস্তির আসল কারণ গায়ের ভারী পোশাক। ইজিপশিয়ান কটনের কামিজটা খুলে ফেলল সে। তারপর খুলল পপলিনের সালোয়ার। অন্ধকারে ব্যাগ হাতড়ে খুঁজে বের করে আনল পাতলা আদ্দীর সেমিজ আর সায়া। ব্লাউজ, ব্রা, সব খুলে সেমিজ আর সায়া পরে শুয়ে পড়ল সে। আগের চেয়ে অনেক আরাম বোধ করছে, বুঝতে পারল।

ধীরে ধীরে ঘুম নেমে এল চোখে। পাতা বুজেছে কি বোজেনি, হঠাৎ তীব্র গর্জন শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল তারানা। চোখ থেকে ঘুমের আগমনী আমেজ কেটে গেছে। বাঘ ডাকছে! একেবারে আশেপাশে কোথাও!

ভয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল তারানা। তাঁবুর খুব কাছেই এসে পড়েছে বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার। সকাল বেলার হরিণ দেখার কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল সেই কথাটাও: হরিণ যেখানে, সেখানেই বাঘ।

বন্দুক হাতে পালা করে পাহারা দেবার কথা ওদের। কিন্তু কারুর গলার স্বর শোনা যাচ্ছে না। কী হলো ওদের?

আবার গর্জন শোনা গেল। বন, মাঠ, এমনকি তাঁবুগুলোও যেন কেঁপে উঠল। এবার একটা নয়, অন্তত দুটো কিংবা তিনটে বাঘ গর্জন করে উঠেছে একসঙ্গে। কত দূরে ওরা? ফারুকই বা কী করছে? ধীরে ধীরে বিছানা থেকে উঠে দরজা ফাঁক করল তারানা। ভেবেছিল, আক্রমণোদ্যত একপাল বাঘ দেখতে পাবে মাঠের আশেপাশে। কিন্তু তার বদলে দেখতে পেল ফাঁকা মাঠ। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা। তাঁবুগুলো ঘুমোচ্ছে যেন। মাথার ওপর মিটমিট করে হাসছে তারাভরা রাত। মনে হচ্ছে গোটা পৃথিবীতে বেঁচে আছে শুধু ওই বাঘগুলো আর সে নিজে। অন্য সবাই মৃত। কানের কাছে এই জান্তব গর্জন শোনার পর গাইড আনোয়ার ফারুক কীভাবে ঘুমিয়ে আছে, তারানা বুঝতে পারে না।

আবার চরাচর কাঁপিয়ে দিল বাঘের গর্জন—অতি নিকটে। ঠিক কতটা দূরে, ভাবতে চেষ্টা করল তারানা। চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ? হয়তো আরও কম! যে-কোন মুহূর্তে তাঁবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ওরা। তীক্ষ্ণ, শক্তিশালী দাঁত আর নখের সাহায্যে তাঁবু ছিঁড়ে ফেলবে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে। তারপর···তারানা ঘেমে উঠল।

বিছানার পাশে হাতড়ে দেশলাই বাক্স খুঁজে বার করল। কিন্তু আগুন জ্বালানো উচিত হবে কি?

সারাদিনের ক্লান্তিতে অঘোর ঘুমে অচেতন ওরা। ওদের জাগানো দরকার। অন্তত পাহারার দায়িত্বে যে আছে, তাকে তো জাগাতেই হবে! তারানা দরজার ফাঁকে মাথা বার করে দু'দিক দেখে নিল। বোকার মত একা একা বন্য প্রাণীর সঙ্গে লড়াই করার কথা ভাবতেই পারছে না সে। তা ছাড়া বাঘ আক্রমণ করুক আর না করুক, আশঙ্কাটাই কি কম ভয়ঙ্কর? সারারাত ঘুমাতে পারবে না তারানা। তার মানে আগামীকালের যাত্রায় অশেষ দুর্ভোগ পোহাতে হবে ওকে।

বড় তাঁবুর দিকে ছুটে যাওয়া যায় না? পরমুহূর্তেই ভাবনাটা বাতিল করে দিল সে। বড় তাঁবু অনেকটা দূরে। বাঘ যদি আশেপাশে থাকে পথটা পার হবার সময় পাওয়া যাবে না। মাঝপথেই সে ধরা পড়বে বাঘের হাতে। সফরসঙ্গীরা বেরিয়ে আসার আগেই বাঘ তার শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে খেয়ে ফেলবে।

কোন উপায় নেই। আনোয়ার ফারুককেই বিরক্ত করবে সে। তার ঘুম ভাঙাবে। আর এতে এত সঙ্কোচেরই বা কী আছে? সে তো গাইড! ট্যুরিস্টের বিপদ-আপদ, ভয় ভীতি এসব সামলানোর দায়িত্ব তো তারই!

গায়ের সংক্ষিপ্ত পোশাকের কথা ভুলে গেল তারানা। ছুটল ফারুকের তাঁবুর দিকে। দরজা তুলে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। ফারুকের নাম ধরে ডাকতেও ভুলে গেছে সে।

ফারুক ধড়মড় করে উঠে বসল। হাত বাড়িয়ে তুলে নিল রিভলভার।

তারানা আর্তনাদ করে ওঠে, 'আ···আমি···তারানা···!' দাঁতে দাঁতে বাড়ি লেগে অদ্ভুত শব্দ তৈরি হচ্ছে তার মুখে, সমস্ত শরীর কাঁপছে। হাপরের মত ওঠানামা করছে বাধা-বন্ধনহীন বুক।

'ও!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বালিশের নিচে দেশলাই খুঁজতে লাগল ফারুক। 'বাঘের ডাক শুনে ভয় পেয়েছেন?'

তারানা হাতের দেশলাইটা ফারুকের দিকে বাড়িয়ে ধরে রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'হ্যাঁ। একেবারে কাছে, তাঁবুর আশেপাশে কোথাও!'

ফারুক ধীরে-সুস্থে মোমবাতি জ্বালিয়ে ওর দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে বিরক্তি, না অন্য কিছু, বোঝা যাচ্ছে না।

'আশেপাশে বাঘ নেই, মিস তারানা হাশিম,' ধীরে ধীরে ফারুক বলল, 'অন্তত আধমাইল দূরে। গভীর রাতে জঙ্গলে এমন অনেক রহস্যের সৃষ্টি হয়। ভয় পাবার কিছুই নেই। মুরাদ আর মুজিবর বন্দুক হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠের চারপাশে।'

তারানার মনে হলো, ওর শরীরে রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে আবার। বুকের ওঠানামা থামানো যাচ্ছে না। মোমের মায়াবী আলোয় ফারুক তাকিয়ে দেখছে সে-দৃশ্য এক নিঃশ্বাস ব্যবধানে বসে। তারানা বাইরে তাকানোর ছল করে ঘুরে বসল।

'আমি ভেবেছিলাম একেবারে কাছেই এসে পড়েছে,' কৈফিয়তের সুরে তারানা বলল, 'মনে হচ্ছিল, এখুনি ঝাঁপিয়ে পড়বে তাঁবুর ওপর।'

'প্রথম প্রথম আমারও তা-ই মনে হত।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারানার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল। ঘুরে আবার

ফারুকের মুখোমুখি বসল সে। তার চোখের তারায় তখনও ভয়ের ছাপ।

'এখনও ভয় করছে?'

মাথা নেড়ে স্বীকার করল তারানা। ফারুকের দিকে তাকাল সে। তার পরনে পাজামা। গায়ে কিছু নেই। চওড়া, লোমশ বুক। মুখ আর গলার রঙের সঙ্গে বুক আর পেটের রঙের কোন সামঞ্জস্য নেই। তারানা অনুমান করল, মানুষটা অতিশয় ফর্সা, কষ্টকর পেশার কারণে ত্বকের সে-ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। হাত আর মুখ দেখে শ্যামলা রঙের লোক বলেই মনে হয় তাকে। পাথরের মূর্তির মত ঋজু ভঙ্গিতে বসে, যেন ধ্যান করছে তারানার দিকে তাকিয়ে। মাটিতে দৃষ্টি রেখে সলজ্জ ভঙ্গিতে তারানা বলল, 'একটা অনুরোধ করব?'

'নিশ্চয়ই।'

'ভোর হতে বেশি দেরি নেই। এটুকু সময়ের জন্যে আপনার এখানে···অবশ্য যদি আপনার অসুবিধে না হয়···এই দরজার কাছটাতেই···'

তারানা কথা শেষ করতে পারল না। সঙ্কোচ ঘিরে ধরেছে তাকে।

ফারুক নম্র সুরে, রূঢ় ভাষায় বলল, 'আমার সঙ্গে শোবেন?'

তারানা অতি কষ্টে অপমান হজম করল। সংশোধন করে বলল, 'আপনার তাঁবুতে শুতে চাই।'

ফারুকের গলায় এবার উপহাসের সুর। 'না, না, অসুবিধের কী আছে? কোন অপরিচিত মানুষের ঘরে শোবার বেলায় অসুবিধেটা মেয়েদেরই একচেটিয়া। আপনি আমার বিছানাতেই শুতে পারেন। আমি দরজার কাছে জায়গা করে নিচ্ছি। এক মিনিট সময় দিন। আপনার তাঁবু থেকে বিছানা তুলে আনি।'

তারানা সরে বসল। ফারুক বলল, 'নাক ডাকার বদ অভ্যেস নেই তো আপনার?'

অপমানে মুখ লাল হয়ে যায় তারানার। কিন্তু এখন দুঃসময়। প্রতিবাদ করার সুযোগ নেই। ফারুক উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না। এগিয়ে গেল তারানার তাঁবুর দিকে। তারানা দাঁতে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরল।

বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা অবশ্য সম্ভব হলো না ওর পক্ষে। ফিরে এসে ফারুক একেবারেই অন্যমানুষ। পরম যত্নে বিছানা তৈরি করল তারানার জন্যে। এক গ্লাস পানি এনে খাওয়াল।

'শুয়ে পড়ুন,' বলে মোমবাতি নিবিয়ে দিল ফারুক। এবার সত্যিকার স্বস্তি পেল তারানা। নিরাপত্তা বোধের চেয়ে স্বস্তিকর আর কী হতে পারে এমন সময়?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফারুকের কথা ভুলে গেল সে। ভুলে গেল জঙ্গল আর বাঘের কথা। ঘুমিয়ে পড়ল।

ফারুকের চোখে আর ঘুম এল না। পরম বিস্ময়ে সে তাকিয়ে রইল তারানার প্রশান্ত, স্নিগ্ধ মুখের দিকে। চোখ ফেরাতেও ইচ্ছে হচ্ছে না। নিজের মনের ওপর অক্ষম আক্রোশে ফুলতে লাগল। এই ভয়ই তো পেয়েছিল সে!

ফারুকের রাত আর কাটে না।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙল তারানার। লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে দেখল, দরজার কাছে

বিছানা খালি। খুব কম ঘুমায় লোকটা। যতই ভাবল, একজন অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে ছোট্ট এক তাঁবুর নিচে ঘুমিয়েছে সে, ততই লজ্জা তাকে ঘিরে ধরল। অন্য সফরসঙ্গীরা টের পেয়েছে কিনা কে জানে! যদি জানাজানি হয়ে থাকে, খুবই সঙ্কোচের হবে ব্যাপারটা।

হাওয়া ছেড়ে দিয়ে তোশক-বালিশ গুটিয়ে তুলে নিল তারানা। বেরিয়ে পড়ল তাঁবু থেকে। মাঠে কেউ নেই। দূরে, নদীর চরে মৃদু কোলাহল। গোসল করছে পুরুষেরা। বড় তাঁবুটা দেখতে পাচ্ছে না তারানা। নিশ্চয়ই ওটা গুটানো হয়ে গেছে। আবার যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি চলছে।

তারানা নিজের তাঁবুর ভিতরে ঢুকাল বিছানা-পত্র। গায়ের পোশাকের দিকে তাকিয়ে আবার লজ্জা পেল সে। মনে মনে অনেক ধন্যবাদ জানাল ফারুককে। মাঝরাতে রীতিমত উস্কানিমূলক পোশাকে তার তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে তারানা। তবু লোকটা কোনরকম অশোভন আচরণ করেনি! কথায় যতই অভদ্র হোক, চরিত্রের দিক দিয়ে এই খাঁটি ভদ্রলোকটিকে চিনতে ভুল হয়নি, ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করল তারানা।

হাই তুলে আকাশের দিকে তাকাল সে। এত গাঢ়, নীল আকাশ সচরাচর চোখে পড়ে না। এক টুকরো মেঘের চিহ্ন নেই। তারানার মনটা খুশিতে ভরে গেল। কিন্তু অলস ভাবনায় কাটানোর মত সময় হাতে নেই। অনেক কাজ আছে তার। বাথরুম। সম্ভব হলে গোসলটাও সেরে নিতে চায়। কাপড় পাল্টাতে হবে। প্যাকিং। তারপর নাশতা।

কিন্তু তারানার কপালে সুখ নেই। নইলে সকাল বেলার এমন চমৎকার মেজাজটা ফারুক মাটি করে দেবে কেন? পেছন থেকে এসে ঝাঁঝের সঙ্গে বলল সে, 'আকাশপানে তাকিয়ে কাব্য করলে কাঙ্গায় পৌঁছনো যাবে না, মেমসাহেব। কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিন। দশ মিনিট সময় দিচ্ছি আপনাকে।'

'ভালই হয়েছে,' নৌকায় উঠে মনে মনে বলল তারানা। ফারুক মাঝে মাঝে এমন দুর্ব্যবহার করে চলেছে বলেই তার সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। তারানাও তা-ই চায়।

উদাস চোখে সুন্দরবনের অপরূপ শোভা দেখতে লাগল সে। ফারুক আজ আরও বেশি নীরব। প্রয়োজনে দু'চারটে কথা বলছে খুবই সংক্ষেপে। তাতে তারানার আপত্তি নেই। তার আসল উদ্দেশ্য কাঙ্গা। বাবার কবর দেখতে যাচ্ছে সে, বেড়াতে নয়। যাত্রাপথের বর্ণনা কিংবা বিশেষ কোন জায়গা বা জিনিসের পরিচয় জানার জন্যে মনটা ছটফট করলেও সেটাকে আমল দিচ্ছে না। শুধু যদি তাপটা সহনীয় হত! আজকের তাপ আর আর্দ্রতা—দুটোই বেশি। বেলা যত বাড়তে লাগল, ততই ছটফট করতে লাগল তারানা।

তার অবস্থা লক্ষ করে মুরাদ বলল, 'গোসলটা সেরে এলেই ভাল করতেন, আপা। গরম কম লাগত।'

তারানা বলতে চেয়েছিল, 'তোমার দেমাগী "সাহেব" আমাকে সে-সুযোগ দেয়নি। আমার কষ্টের কথা ভাবার প্রয়োজন হয়নি তাঁর।' কিন্তু কিছু না বলে

দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এখন সে কোন বিরোধে জড়িয়ে পড়তে চায় না।

বনদেবী একঘেয়ে শব্দে আর গতিতে এগিয়ে চলেছে। এবারের গন্তব্য হিরণ পয়েন্ট। সবকিছু স্বাভাবিক থাকলে বেলা দুটোর মধ্যে হিরণ পয়েন্টে পৌঁছবে ওরা।

কিন্তু সবকিছু স্বাভাবিক রইল না। বেলা পৌনে একটার দিকে হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেল। মুজিবর অনেক চেষ্টা করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল শেষপর্যন্ত।

ফারুক বিরক্ত স্বরে বলল, 'কী হলো?'

'বনদেবী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। অপারেশন করতে হবে। মানে মোটর খুলতে হবে।'

ওরা যত সমুদ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ততই বড় হচ্ছে ঢেউ; বনদেবীর দুলুনিও বাড়ছে তার সঙ্গে। এঞ্জিন বন্ধ হবার পর বনদেবী ভীষণভাবে দুলতে লাগল। মুজিবর জানাল, এখানে মোটর খুলে মেরামত করা সম্ভব নয়। কূলে ভেড়াতে হবে নৌকা।

মতি দাঁড় বার করল। বৈঠা হাতে নিল খায়ের। একটু ফাঁকা জায়গা বেছে নিয়ে নৌকা কূলে ভেড়ানো হলো। ফারুক রিভলভার পরীক্ষা করে নিল। মুরাদ কাঁধে তুলে নিল বন্দুক। তারপর একে একে নেমে গেল সবাই।

তারানাকে লক্ষ করে ফারুক কয়েকটা কথা ছুঁড়ে দেয়। 'জোর অভিশাপ দিয়েছেন, বুঝতে পারছি। মোটর মেরামতের কাজ শেষ হতে অন্তত একঘণ্টা লাগবে। গোসল করার ইচ্ছে থাকলে ফাঁকা জায়গা দেখে নদীতে নামতে পারেন। ভয় নেই, আপনার দিকে না তাকিয়েই পাহারা দিতে পারব।'

গা জ্বলে গেল তারানার। কিন্তু কিছুতেই রাগ করা চলবে না, মনকে বোঝাল সে। গোসল করা হোক আর না-ই হোক, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে।

প্রায় একশোগজ দূরেই বাঁক নিয়েছে নদী। একটু বাঁ-দিকে গিয়ে সফরসঙ্গীদের চোখের আড়াল হবার সুযোগ পেল সে। দেরি না করে নদীতে নামল। শরীর জুড়িয়ে গেল তার। রোদে যতই উত্তাপ থাক, নদীর পানিটা ঠাণ্ডা। যত ডুব দেয়, ততই ইচ্ছে করে ডুবতে।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে মনের সুখে জলখেলা করতে করতে গোসল করল তারানা। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠল। ভিজে কাপড় ওর গায়ে লেপ্টে স্পষ্ট করে তুলেছে সব ধারাল বাঁক আর রেখা। এমন অবস্থায় সঙ্গীদের কাছে যেতে লজ্জা করছে তার। একজন সঙ্গিনী থাকলে বেশ হত। কিন্তু সে-কথা ভেবে এখন কী লাভ? তারানা দ্বিধায় জড়িত পায়ে একটু একটু করে এগিয়ে গেল।

তারানার শরীরে চুম্বকের মত আটকে ছিল ফারুকের দৃষ্টি। অনেক কষ্টে সেটা ছাড়িয়ে নিয়ে নৌকার দিকে ফেলল ফারুক। পা বাড়াতে বাড়াতে বলল, 'এতদিন ভেবেছি, স্বাবলম্বী হবার যোগ্যতা নেই আপনার। আজ ভুল ভাঙল।'

'বনদেবী'কে সুস্থ করে তুলেছে মুজিবর। তবু স্বস্তি পাচ্ছিল না। তারানাকে ফিরে আসতে দেখে হেসে ফেলল সে।

ওয়াজেদ আলী ব্যাগ এগিয়ে দিল। তারানা কাপড় বার করে গাছের আড়ালের উদ্দেশে পা বাড়াল।

সাবধান করল ফারুক। 'দূরে যাবেন না, মেমসাহেব। বাঘের পাল্লায় পড়বেন।'

মুরাদ উঁকি দিল পাশের একটা ঝোপের আড়াল থেকে। ধোঁয়া লেগে তার চোখ লাল হয়ে উঠেছে। মুজিবরের সঙ্গে পরামর্শ করে সে ভাত রান্নার ব্যবস্থা করেছে ঝোপের ভিতরে।

তারানা কাপড় বদলে ফিরে এল। ভাতের গন্ধ পেয়ে খুশি হয়ে উঠল ওর মন।

'কিন্তু তরকারি রান্নার কী উপায়?' দ্বিধান্বিত গলায় জিজ্ঞেস করল তারানা।

উত্তর দিল ফারুক। 'মুজিবরের বুদ্ধি ধারাল, মেমসাহেব। তরকারির ব্যবস্থা সে আগেই করে রেখেছে। চলুন, নৌকায় উঠে পড়ি। তারপর দেখতে পাবেন।'

মতি বলল, 'ডাঙায় বসে খাওয়াটা সেরে গেলে হত না?'

'মাথা খারাপ?' ফারুক বলল ধমকের সুরে, 'আমরা যখন ভাত খাব, তখন বাঘে আমাদের খাবে। খুব খারাপ জায়গা এটা।'

বনদেবী-তে উঠে পড়ল সবাই।

সাত

হিরণ পয়েন্টের ফরেস্ট অফিসার রফিক নওয়াজের বাঙলোটা নিজের বাড়ির মত ব্যবহার করে ফারুক। রফিক নওয়াজের বউ আসিয়া ওকে স্নেহ করেন ছোট ভাইয়ের মত। অনেকদিন পর যখন ফারুক হিরণ পয়েন্টে এসে পৌঁছয় তখন ওদের বাড়িতে উৎসবের হাওয়া লাগে। আরও একজন মনে মনে খুশি হয়। সে রফিক নওয়াজের শ্যালিকা ডোপা। রফিক ঠাট্টা করে ডাকেন 'ডেঁপো' বলে।

যেসব ট্যুরিস্ট দল ফারুকের সঙ্গে হিরণ পয়েন্টে আসে, তারা যেখানেই থাকুক, একবার এ-বাড়িতে পদধূলি দেবেই। রফিক সাহেবরাও খুবই আনন্দ পান অতিথি আপ্যায়নে। বলেন, 'সভ্য জগৎ থেকে বহুদূরে, প্রায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করি আমরা। কেউ বেড়াতে এলে মনে হয়, আমরা এখনও মরিনি, বেঁচে আছি। বড় আনন্দ পাই।'

বনদেবী হিরণ পয়েন্টে পৌঁছল সন্ধের একটু আগে। বাঙলোর নিজস্ব জেটিতে নেমে গেটের বেল টিপল ফারুক। রফিক নওয়াজ বেরিয়ে এলেন। ফারুকের নৌকা দেখে উল্লসিত হয়ে ওঠেন তিনি। হৈচৈ শুরু করেন ছেলেমানুষের মত।

ফারুক একে একে সবাইকে পরিচয় করিয়ে দেয় রফিক সাহেবের সঙ্গে। রফিক নওয়াজ তারানার সালামের উত্তর দিয়ে বলেন, 'আপনাকে খুবই পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে।'

'ডেঁপো, মিস তারানাকে দোতলায় নিয়ে যাও। কষ্ট পাচ্ছেন উনি।'

যাবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু তারানা বুঝতে পারল, শরীরটা আর বইতে পারছে না সে। নিঃশব্দে ডোপাকে অনুসরণ করে দোতলায় একটা ঘরে ঢুকল। ডোপা বিছানা তৈরি করে বলল, 'নিন, শুয়ে পড়ুন।'

মিষ্টি হেসে ডোপাকে ধন্যবাদ দিল তারানা। তারপর গড়িয়ে পড়ল বিছানায়। ঘুম আসছে। অনেকদিন পর নরম তুলতুলে বিছানা আর বালিশ পেয়ে তার শরীর

অসাড় হয়ে এল। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে দেখতে পেল, ডোপা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওর সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল তারানা, কিন্তু শরীরে যেন এতটুকু শক্তিও অবশিষ্ট নেই! ঘুমিয়ে পড়ল সে।

…কোত্থেকে যেন ছুটে এল ফারুক। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তারানা ফারুকের চোখে চোখ রেখে শিউরে উঠল। কি যেন চায় তার চোখ! কি যেন বলার আছে তার! তারানা সে-দৃষ্টির ভিতরে আশ্চর্য এক সম্মোহনী শক্তি টের পাচ্ছে। এড়িয়ে যেতে পারছে না তাকে। …এগিয়ে গেল তারানা। ফারুক পালকের খেলনার মত ওর শরীরটা জড়িয়ে ধরে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। এবার পতনের পালা। নিচে নামছে তারানা…আরও নিচে। বুকের ওপর ফারুকের মাথার চাপ অনুভব করল সে। ওর পিছল শরীর আরও নিচে নামছে…ফারুকের শরীর বেয়ে…থরথর করে কেঁপে উঠল তারানা। ঘুম ভেঙে গেল।

আশেপাশে কাউকে দেখতে পেল না। ঘর থেকে বেরিয়ে পেল এক ফালি বারান্দা। হাঁটতে শুরু করল তারানা। সমুদ্রের গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ছুটে আসছে উদাস হাওয়া, লুটিয়ে পড়ছে ওর শরীরে। ফারুক কোথায়? অন্য সফরসঙ্গীরাই বা কোথায়?

বারান্দার শেষ প্রান্তে খোলা ছাদ দেখতে পেল তারানা। ছাদের এক কোণে হরিণের খাঁচা। ভিতরে কয়েকটা পোষা হরিণের বাচ্চা। পাশে অনেক ফুলের টব। বাইরের নারিকেল গাছের পাতা নেমে এসেছে টবের ওপর। এই নিবিড় জঙ্গলের ভিতর কৃত্রিম জঙ্গলের আয়োজন দেখে হাসি পেল তার।

টবগুলোর আড়ালে দু'জন মানুষের মূর্তি। পাশাপাশি বসে আছে ওরা। কথা বলছে নিচু স্বরে। সরে আসবে ভেবেও দাঁড়িয়ে রইল তারানা। কিছুতেই সম্ভব হলো না কৌতূহল কাটানো। লাভ হলো এই যে, কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে টের পেল, ওরা কারা। ফারুক আর ডোপা।

আস্তে আস্তে অনেক কিছু পরিষ্কার হলো তারানার কাছে। ফারুকের সব দ্বিধার মূলে তবে এই! শুধু এ-কারণেই তারানার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে প্রাণপণে চেষ্টা করে সে! সবকিছুর মূলে এই একরত্তি মেয়ে ডোপা! কেন যেন অদম্য ঈর্ষা অনুভব করল সে কিশোরীটির ওপর। নিঃশব্দে হেঁটে ফিরে এল।

ঘরের কাছে আসতেই পেছন থেকে গম্ভীর গলার ডাক শুনল। 'মিস তারানা!'

তারানা ঘুরে দাঁড়াল। ডোপার একটা হাত ফারুকের কাঁধে। মিটমিট করে হাসছে সে। এক ধরনের প্রদর্শন বাতিক আছে মেয়েটার মধ্যে। তার দুলাভাইয়ের নামকরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। সত্যিই 'ডেঁপো' সে।

'কিছু বলছেন?' নিরাসক্ত সুরে বলল তারানা।

ফারুক ডোপার হাত সরিয়ে দিল নিজের কাঁধ থেকে। পেছন থেকে তারানার দিকে ঠেলে দিল ডোপাকে। 'এই যে আপনার ভক্ত! ভক্তি নিবেদন করতে চায় আপনার কাছে।'

গা জ্বলে গেল তারানার। অভিনয়!

'জানেন, আপনাকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল, কোথায় যেন দেখেছি! কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। পরে ফারুক ভাইয়ের কাছে শুনলাম, আপনি সেই বিখ্যাত তারানা হাশিম। আপনার পাঁচটা নাটক দেখেছি আমি।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারানাকে মুখ খুলতে হলো। 'তাই! এখানে টেলিভিশন আছে, জানতাম না।'

ডোপা খিলখিল করে হাসল। 'আপনি ঠিকই জানতেন। এখানে টেলিভিশন নেই। এটা একটা সমাজ নাকি?'

'তাহলে আমার নাটক কোথায় দেখলে? "ফারুক ভাইয়ের" মুখে শুনেছ, তাই না?'

জোরাল সুরে প্রতিবাদ করল ডোপা। 'দূর! আপনি কিচ্ছু জানেন না। ফারুক ভাইয়ের মুখে শুনব কেন? খুলনায় আমাদের বাসা আছে। সেখানে টেলিভিশন আছে।'

তারানা অবাক। 'তুমি খুলনায় থাকো?'

'বেশির ভাগ সময়ে। ছুটি পেলেই এখানে চলে আসি। জানেন, আপু আর দুলাভাইকে না দেখে আমি থাকতেই পারি না।'

নিচে থেকে আসিয়ার গলা শোনা গেল। 'ডোপা, মেহমানদের খাবার টেবিলে নিয়ে এসো।'

ডোপা তারানার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অস্বস্তি বোধ করছে তারানা। সেটা কাটানোর জন্যে বলল, 'আমাদের অন্য সঙ্গীরা কোথায়?'

ফারুক বলল, 'কাছেই একটা বিরাট রেস্ট হাউজ আছে। সবাই চলে গেছে সেখানে। এতক্ষণে খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছে তারা।'

ডোপা তাগাদা দিল, 'চলুন, আপু অপেক্ষা করছেন ডাইনিং টেবিলে।'

শুধু আসিয়া নন, রফিক নওয়াজও অপেক্ষা করছিলেন খাবার প্লেট সামনে নিয়ে।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?' তারানার ফোলা ফোলা চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন রফিক নওয়াজ।

তারানা কিছু বলার আগেই ফারুক বলল, 'আমাদের মেমসাহেবের সন্ধেয় ঘুমিয়ে রাতে জাগা অভ্যেস।'

তারানা ম্লান হেসে বলল, 'ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। লোনা হাওয়াটা ঠিক সহ্য করতে পারছি না।'

ফারুক বোধহয় সুযোগের সন্ধানে ছিল। বলল, 'তাই! চলুন তাহলে, ফিরে যাওয়া যাক।'

রফিক বললেন, 'শুনলাম, আপনি কাঙ্গা যেতে চান।'

তারানা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি মেলে রফিক নওয়াজকে জরিপ করল। বলল, 'হ্যাঁ, কাঙ্গা যাব আমি।'

রফিক নওয়াজ চিন্তান্বিত স্বরে বললেন, 'কাঙ্গা! সে তো ডেঞ্জারাস জায়গা!'

আসিয়া বললেন, 'সুন্দরবনের সব বৈশিষ্ট্য হিরণ পয়েন্টেই পাবেন। কাঙ্গা যাবার দরকার হবে না। শরীরটাও যখন ভাল যাচ্ছে না বলছেন···এক কাজ করুন

না, এখানেই থেকে যান। বিশ্রাম নিন কয়েকদিন। সুন্দরবন দেখুন। শিকার করতে চাইলে সে ব্যবস্থাও করে দিতে পারি। কাঙ্গায় গিয়ে কী করবেন?'

তারানা বুঝতে পারল না, তাদের হোস্টেস ঠিক কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে কথা বলছেন! ফারুক তাদেরকে কিছু বলেছে কি না কে জানে!

'আমি···আমি ঠিক···,' ব্যাখ্যার সুরে তারানা বলল, 'বেড়ানোর উদ্দেশ্যে আসিনি। আমি বাবার কবর দেখতে এসেছি। কাঙ্গায় আমার বাবা মারা গেছেন!···একা, অসহায় অবস্থায়।'

আর্তনাদ বেরুল নওয়াজ দম্পতির মুখ থেকে। 'ড. আবুল হাশিম! আপনার বাবা!'

'হ্যাঁ। আমার হতভাগ্য বাবা।'

তারানা লক্ষ করল, ফ্যাকাসে মুখে দম্পতিটি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। অবশ্য কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে গেলেন তাঁরা।

রফিক নওয়াজের গলায় গভীর অনুতাপ। 'আপনি ড. আবুল হাশিমের মেয়ে! উনি যে আমাদের কতখানি আপনজন ছিলেন, যদি জানতেন! এ-বাড়িতে অনেকদিন ছিলেন তিনি। এটাকে নিজের বাড়ি বলেই মনে করতেন সব সময়।'

তারানা বলল, 'আমিও তাই করব। খুব ভাল লাগছে আপনাদের বাড়িটা।'

আসিয়া আর রফিক, দু'জনেই মরহুম ড. হাশিমের স্মৃতিচারণ করতে শুরু করলেন। সব কথা, সব ঘটনা মন দিয়ে শুনতে পারছে না তারানা। মাঝে মাঝে আনমনা হয়ে যাচ্ছে সে। ভেবে পাচ্ছে না, বাবা তার জঙ্গল জীবনের এত কথা চিঠিতে জানালেও নওয়াজদের কথা কিছুই জানাননি কেন? এখানে আসার আগে ফারুকও এঁদের সম্পর্কে কিছু বলেনি।

পরিবেশ ভারী হয়ে উঠেছে। রফিক নওয়াজ সেটা হালকা করার চেষ্টা করলেন। 'শুনলাম, আপনি চমৎকার অভিনয় করেন! আমার ডেঁপো শালীটা বলছিল। ও নাকি আপনার অনেক নাটক দেখেছে।'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠল ডোপা, 'সিনেমা পত্রিকায় ওঁর ছবিও দেখেছি, দুলাভাই। আমার কাছে একটা আছে। দেখবেন?'

আসিয়া ধমক দিয়ে বললেন, 'চুপচাপ খাওয়া শেষ করো আগে।'

এরপর প্রসঙ্গ ঘুরে গেল। ফারুক জানতে চাইল গোলপাতার চাষ আর লবণ প্রকল্পের হালফিল অবস্থা সম্পর্কে। রফিক বিষয়টার ওপর অনর্গল বক্তৃতা শুরু করলেন।

খাওয়ার পর বাড়িটা ঘুরে দেখতে লাগল তারানা। এখানে তার বাবার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সবখানে ছড়িয়ে আছে তাঁর পরশ। সবকিছু তেমনি আছে, শুধু তিনি নেই।

তারানা দোতলার সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল। সিঁড়ির ঘরে পৌঁছনোর আগেই বাধা পেল সে। বাঁ-দিকে একটা দরজা খোলা। ভিতরে বসে আছেন আসিয়া। তারানাকে ডাকলেন তিনি।

তারানা তাঁর পাশে গিয়ে বসল। 'শহর থেকে এত দূরে, বনের মধ্যে থাকতে কষ্ট হয় না?' জিজ্ঞেস করল তারানা।

আসিয়া হাসলেন। 'না তো! অভ্যেস হয়ে গেছে। ও আর আমি একবার বেড়াতে এসেছিলাম এখানে। জায়গাটা এত ভাল লেগে গেল যে আর ফিরতে ইচ্ছে হলো না। সত্যিই আর ফিরে যাইনি। শুধু একবার গিয়েছিলাম ঢাকায়। রফিক তার অফিসে তদবির করে বদলির অর্ডার আদায় করল আর আমি মালপত্র বাঁধলাম।'

'একঘেয়েমি লাগে না?'

আসিয়া হেসে বললেন, 'কখনও ক্লান্ত হয়ে পড়লে হাঁটতে হাঁটতে সাগরের তীরে চলে যাই। বিশেষ করে আনোয়ার ফারুক এলে খুব মজা হয়। ও আমাদেরকে নতুন নতুন জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যায়। একবার আপনার বাবা, ফারুক আর আমরা তিনজন বনদেবী-তে চড়ে সুন্দরবনের শেষপ্রান্ত, মানে হরিণঘাটার মোহনায় গিয়েছিলাম। অপূর্ব জায়গাটা!'

আর্দ্র স্বরে তারানা বলল, 'আমার বাবা প্রায়ই আসতেন এখানে, তাই না?'

আসিয়া ইতস্তত করে বললেন, 'না···মাঝে মাঝে···মানে···দু'তিন মাস পরপর। কাঙ্গায় গবেষণার কাজ শুরু করার পর আর বড় একটা আসেননি। আমরা প্রায়ই সাবধান করতাম ওঁকে। বলতাম, "জায়গাটা খুব খারাপ। এত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করাটা ঠিক নয়।" উনি হেসে উড়িয়ে দিতেন। বলতেন, "কাউকে না কাউকে তো ঝুঁকি নিতেই হবে!" মৃত্যুর সপ্তাখানেক আগেও এসেছিলেন।'

তারানা বলল, 'খুবই জেদী লোক ছিলেন। আমিও ওঁর স্বভাব পেয়েছি।'

আসিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, বিজনপুর খুঁজে পাওয়া যাবেই! বিজনপুর নামে ওখানে যে একদিন সমৃদ্ধ আর উন্নত একটা দেশ ছিল, তাতে ওঁর কোন সন্দেহ ছিল না।'

'আপনারও কি তাই মনে হয়?'

আসিয়া দ্বিধার সুরে বললেন, 'আমার বিশ্বাসে কিছু আসে যায় না। তবে স্থানীয় অনেক লোকের ধারণা, কাঙ্গার কাছাকাছি কিছু একটা আছে। ড. হাশিম সেটাই খুঁজে বের করতে চেয়েছিলেন।'

তারানা আসিয়ার পানে তাকিয়ে রইল। এই প্রথম কাউকে বিজনপুরের ব্যাপারটা নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে কথা বলতে শুনল তারানা। অন্য সবাই প্রথম দফাতেই উড়িয়ে দিয়েছে।

'কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই আমার মাথায় ঢুকছে না,' তারানা বলল, 'কাঙ্গার কাছাকাছি কিছু একটা আছে, এটা যদি আরও অনেকের বিশ্বাস হয়, তবে অন্য কেউ সেটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করেনি কেন?'

'জঙ্গলের আদিবাসী একদল লোক সবসময় বাধা দিয়েছে।'

'কেন?'

'তাদের বিশ্বাস, কাঙ্গার আশেপাশে অপদেবতা আছে। তারা নাকি গুপ্তধন পাহারা দেয়। পুরানো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ খুঁজতে গেলে তাদের রোষানলে পড়তে হবে। তারা শুধু গবেষকদেরই ক্ষতি করবে না, স্থানীয় আদিবাসীদেরও ক্ষতি করবে। ধ্বংস হয়ে যাবে তারা।'

'অপদেবতা!' ধীরে ধীরে কথাগুলো উচ্চারণ করল তারানা। 'আপনি অপদেবতায় বিশ্বাস করেন?'

আসিয়ার চোখে বিব্রতভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল। বললেন, 'সত্যিকার জবাবটা যদি শুনতে চান, বলি। মানুষ আসলে পরিবেশের ওপর খুব বেশি নির্ভরশীল। আমি নিজে কখনও কুসংস্কারে বিশ্বাস করতাম না। এখনও করতে চাই না। কিন্তু কেন যেন দুর্বল হয়ে পড়েছি সাগরের উপকূলে, জঙ্গলের ভিতরে বাস করতে করতে। এখানে সবাই এসব বিশ্বাস করে। সবার ধারণা, কাঙ্গার অপদেবতাই আপনার বাবার মৃত্যুর জন্যে দায়ী। উনি চটিয়ে দিয়েছিলেন তাদেরকে।'

তারানা বিস্ফারিত চোখে আসিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। অসংখ্য প্রশ্ন ওর চোখে।

আসিয়া আবার বললেন, 'ঠিক কীভাবে ড. আবুল হাশিম মারা যান, কেউ জানে না। অনেকে জানার চেষ্টা করেছে, পারেনি। হয়তো কেউ কোনদিন জানবেও না। হয়তো আদিবাসীরাই খুন করেছে তাঁকে, তারপর দোষ চাপিয়েছে অপদেবতার ঘাড়ে। আবার এমনও হতে পারে, ডাকাতের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন তিনি।'

'ওখানে ডাকাতও আছে?'

'শুনতে পাই, সীমান্তের অপর পার থেকে সশস্ত্র লোকজন আসে গানবোট কিংবা ট্রলারে চড়ে। সুন্দরবন থেকে সম্পদ লুট করে, মানুষ খুন করে পালিয়ে যায় তারা। দু'দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী চেষ্টা করছে তাদের ধরতে, কিন্তু পারছে না। হরিণভাঙা নদীপথে তারা ঢুকে পড়ে। রায়মঙ্গল আর মালঞ্চ নদী পার হয়ে চলে আসে পুতনীদ্বীপ পর্যন্ত।

'পুতনীদ্বীপ কোথায়?'

'কাছেই। আমাদের এখান থেকে আঠারো মাইল দূরে। শোনা যায়, সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি আছে সেখানে। আমাদের বিডিআর, পুলিশ, নৌবাহিনী, সবাই কয়েকদফা অভিযান চালিয়েছে। কিন্তু ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেছে সব প্রমাণ। কাউকে ধরা যায়নি। কোন প্রমাণও হাজির করতে পারেনি আমাদের সশস্ত্র বাহিনী।'

তারানা বলল, 'কিন্তু আমার বাবার মত নিরীহ মানুষকে কেন খুন করবে ওরা? বাবা নিশ্চয়ই ওদের কোন ক্ষতি করেননি!'

'সেটাই তো রহস্যের ব্যাপার! গোটা সুন্দরবনই এক রহস্য। অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলে না এখানে। অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে। হয়তো এ-কারণেই লোকে কুসংস্কারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে!'

'আমি কোন কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না,' আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তারানা বলল, 'আমি খুঁজে বের করতে চেষ্টা করব, বাবা ঠিক কীভাবে, কেন, কাদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন!'

আসিয়া বললেন, 'গাইড হিসেবে ফারুকের ওপর নির্ভর করতে পারেন। কাঙ্গার পথঘাট ও খুব ভাল চেনে। এ-ব্যাপারে ও খাঁটি প্রফেশনাল। আমরা তো ওর সাহায্য ছাড়া জঙ্গলের পথে বের হবার কথা ভাবতেই পারি না!'

চিন্তান্বিত সুরে তারানা বলল, 'ঠিকই বলেছেন। খুবই নির্ভরযোগ্য গাইড উনি। কিন্তু একই সঙ্গে উনি খুব জটিল প্রকৃতির মানুষ, খুবই কঠিন, একগুঁয়ে।'

আসিয়ার মুখে হাসির ঢেউ খেলল। 'তা···মন্দ বলেননি। শুধু একটা ব্যাপারে ব্যতিক্রম। ডোপার ওপর ও খুবই দুর্বল। ওর কোন অহঙ্কার আর জেদ ডোপার কাছে খাটে না।'

তারানার মুখ শুকিয়ে গেল। কতকগুলো তথ্য আছে, যা শুনতে মানুষ পছন্দ করে না। ডোপার সঙ্গে ফারুকের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, তারানার কাছে এটা দিবালোকের মত স্পষ্ট। কিন্তু তাতে ওর কি আসে যায়? ব্যাপারটা ওকে বিচলিত করছে বুঝতে পেরে তারানা ক্রোধান্ধ হয়ে পড়ল, নিজের ওপর।

অথচ সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিক্রিয়া হওয়া উচিত ছিল ওর, ভাবল তারানা। ফারুকের একটি প্রেমিকা বা বান্ধবী আছে, অন্তত তার মনোজগতে বিচরণ করার মত একটি মেয়ে আছে, এতে স্বস্তি পাবার কথা ওর। কেননা এই হেমন্তে যতই ভেসে আসুক বসন্তের বাণী, তারানা তা কানে তুলতে চায় না। কঠোর, কঠিন এক দায়িত্ব পালন করতে এসেছে সে। কোন রকম ভাবালুতা, আবেগ বিহ্বলতা ওর এ-উদ্দেশ্যকে বানচাল করে দিতে পারে। সব জেনেও ডোপার ওপর হিংসে হচ্ছে।

'আমার কী মনে হয়, জানেন?' আগ্রহের সঙ্গে আসিয়া বললেন, 'অহঙ্কার আর জেদ ওর একটা মুখোশ। আসলে ওর মনটা ভাল। আমাদের অনেকের চেয়ে নরম আর সহানুভূতিশীল।'

তারানা অবাক হয়ে আসিয়ার মুখের পানে তাকিয়ে রইল। কাঙ্গা সফরে তাকে সঙ্গে নেয়ার ব্যাপারে রাজি করানোর ইতিহাসটা বর্ণনা করতে চেয়েছিল, কিন্তু কি ভেবে চুপ করে রইল।

আসিয়া বললেন, 'ওর অতীতের একটা দুঃখ আছে। হয়তো সেটার প্রভাবেই ওর বাহ্যিক আচরণে একটা রুক্ষতার ছাপ পড়েছে। এটা বোধহয় ওর সত্যিকার প্রকৃতি নয়।'

তারানা কিছু না বলে আসিয়ার দিকে প্রত্যাশার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মুখে আগ্রহ দেখানোটা উচিত বলে মনে হচ্ছে না। বরং উনি নিজেই বলবেন আরও কিছু কথা।

'অনেক ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেছে বেচারার ওপর দিয়ে,' বলেই ক্ষান্ত দিলেন আসিয়া। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, সদ্য পরিচিতা তরুণীটির সামনে ফারুক সম্পর্কে এত কথা বলাটা উচিত হয়নি।

কৌতূহল দমন করতে না পেরে তারানা বলল, 'কী হয়েছিল, আপনি জানেন?'

আসিয়ার গলায় এড়িয়ে যাবার সুর। 'আমি ঠিক জানি না। খুব বড় চাকরি করত···কি একটা অভিযোগে চাকরিটা হারায়···'

'কী অভিযোগ?'

আসিয়া উত্তর দেবার জন্যে মুখ খুলেছিলেন। এমন সময় দরজার বাইরে পায়ের শব্দ হলো। কাউকে দেখা গেল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে গেল সে-শব্দ।

'শুতে যাওয়া যাক, কী বলেন?' উঠে পড়লেন আসিয়া।

আট

সূর্য উঠি-উঠি করছে। লাল হয়ে গেছে বঙ্গোপসাগরের আদিগন্ত নীল জল। ডোপা আর ফারুক পাশাপাশি হাঁটছে বালুকাবেলায়। বাতাসে শীতের পরশ। ডোপার চুলের বেণী উড়ছে বাতাসে। উড়ছে ওড়না। পুব দিগন্তে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে সে। সূর্য-ওঠা দেখবে।

ফারুক দেখছে ডোপাকে। কয়েক মাসের ব্যবধানে হঠাৎ যেন বড় হয়ে উঠেছে সে। সস্নেহ দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করছে ডোপার সদ্যতন্বী চোখের আকুলতা, রোমান্টিকতা।

ভোর রাতে নিচের তলার গেস্ট রুমে গিয়ে ফারুককে জাগিয়েছে সে। গতবারে ফারুক কথা দিয়েছিল, পরের বার হিরণে এসে ওকে সমুদ্র দেখাতে নিয়ে যাবে। সে-কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে ডোপা। ফারুক বিছানা ছেড়ে উঠে হাতে-মুখে পানি দিয়ে কাপড় বদলে বেরিয়ে পড়েছে ডিঙি নৌকোয় চড়ে।

'ছোটকালে আমি তোমার হাত ধরে সাগরে বেড়াতে আসতাম। মনে পড়ে, ফারুক ভাই?' হঠাৎ বলল ডোপা

'খুব মনে পড়ে,' ফারুক হেসে বলল, 'তুমি তখন আট কি নয় বছরের। সাগরে নামতে ভয় পেতে। শক্ত করে ধরে থাকতে আমাকে। একবার সাঁতার শেখাতে গিয়ে বিপদে পড়েছিলাম।'

ডোপা ফারুকের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল। 'কী বিপদ, ফারুক ভাই?'

'তুমি এমন চিৎকার জুড়েছিলে, নৌবাহিনীর একটা টহল বোট এগিয়ে এসেছিল আমাদের দিকে। নৌসেনারা সন্দেহ করেছিল, আমি তোমাকে ডুবিয়ে মারতে চেষ্টা করছি।'

বালুতে পা ঠুকে ডোপা বলল, 'ও মা! তাই! তারপর কী হলো?'

'ওরা রীতিমত জেরা করতে শুরু করল। কিছুতেই বুঝতে চায় না, আমার কোন অশুভ উদ্দেশ্য নেই। তারপর ঘটনাস্থলে হাজির হলেন তোমার দুলাভাই। বাঁচালেন আমাকে।'

'অত আগের কথা আমার মনে নেই, ফারুক ভাই,' পায়ের নখ দিয়ে বালুতে আঁচড় কাটতে কাটতে ডোপা বলল, 'আমার মনে আছে সেইসব সময়ের কথা, যখন তুমি মোটর লঞ্চ বানালে, কি নাম রাখা যায় তাই নিয়ে অনেকক্ষণ আলাপ করলে দুলাভাই-এর সঙ্গে, আমাদের সবাইকে নিয়ে পুতনীদ্বীপ বেড়াতে গেলে।'

ফারুক হাসল। 'তাই তো! তোমার দেখছি অনেক কথাই মনে আছে! আমিই বরং ভুলে গিয়েছিলাম এসব কথা।'

ডোপার গলায় অনুযোগের সুর। 'মেয়েদের স্মরণশক্তি বেশি। ছেলেরা সবকিছু চট করে ভুলে যায়।'

ফারুক প্রতিবাদ করল। 'উঁহুঁ। মেয়েরা সবচেয়ে বেশি ভুলে যায় পুরানো দিনের কথা। যখন আরও বড় হবে, বিয়ে হয়ে যাবে তোমার, তুমিও সব ভুলে যাবে। এই হিরণ পয়েন্ট, এই সমুদ্র, এই আমি, কিছুই মনে থাকবে না।'

লজ্জা পেল ডোপা। 'আমি বিয়ে করছি না।'

'তাই?' গম্ভীর স্বরে ফারুক বলল, 'মাদার তেরেসা হবে তুমি? আর্তের সেবায় জীবন কাটাবে?'

'না। আমি চিত্রতারকা হব। একদম ফাইনাল ডিসিশন।'

ফারুক আরও গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করল, 'এ-সিদ্ধান্ত কবে নিলে? কাল রাতে?'

'উঁহুঁ। অনেকদিন আগে। টেলিভিশনে "তোমার জন্যে" নামে একটা নাটক হয়েছিল। তাতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিল রিমা রহমান। চেনো তো? ওই যে··· স্লিম···হাসি হাসি মুখ···ওকে দেখেই সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলি। সামনের বছর আমার এইচ.এস.সি. পরীক্ষা। পরীক্ষাটা দিয়েই টিভিতে অডিশন দেব। একটা সত্যি কথা বলো তো, ফারুক ভাই! রিমা রহমানের সঙ্গে আমার চেহারার মিল আছে না? জানো, শামাউন আহমেদের একটা উপন্যাস পড়েছি আমি। তাতে রুনু নামে একটা চরিত্র আছে। এখন আমি শুধু আল্লাকে ডাকছি। প্রার্থনা করছি, যাতে আগেই ওই উপন্যাসের নাট্যরূপ টেলিভিশনে দেখানো হয়। আমি ওই নাটকে রুনুর রোলটা করতে চাই। উপন্যাসটা পড়ার পর তুমিও তাই বলবে, ফারুক ভাই।'

ডোপাকে একটানা কথা বলার সুযোগ দিল ফারুক। বাধা দিল না। তারপর বলল, 'তোমার বয়স কত, ডোপা? চোদ্দ?'

'ষোলো।'

'ক্যারিয়ার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার জন্যে ষোলো বছর খুব কম বয়স, ডোপা। একটা পরামর্শ দিই। এখন শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা করো। উপন্যাস পড়তে পারো। নাটক-সিনেমাও দেখতে পারো। কিন্তু নিজেকে উপন্যাস কিংবা নাটকের চরিত্রগুলোর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলো না। বয়স যখন আরও বেশি হবে, তখন নিজেই বুঝতে পারবে, জীবনটা আসলে কী আর সে-জীবনটাকে সার্থক, সুন্দর করে তোলার জন্যে কি দরকার।'

'জীবন সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ো না, ফারুক ভাই। ওটা আমি ভালই বুঝি।'

ফারুক হাসল। 'বেশ তো! আরও বুঝতে থাকো। এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবার কী আছে? তারানা হাশিমের জীবন আর তার নাটকের চরিত্রের মধ্যে কত ব্যবধান, ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখো। চলো, বাসায় ফিরে যাই।'

ডোপা ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'আসল ব্যাপারটা কী, ফারুক ভাই?'

'আসল ব্যাপার মানে?'

'সাগরে বেড়াতে এসে আগে তো কখনও বাসায় ফেরার নাম করতে না! আজ এইটুকু সময়ের মধ্যেই সাগর বোরিং লাগছে নাকি?'

বিব্রত স্বরে ফারুক বলল, 'না, ঠিক তা নয়···'

ডোপা বাধা দিয়ে বলল, 'ঠিক কী, আমি বুঝতে পেরেছি, ফারুক ভাই। তারানা হাশিম।'

'তারানা হাশিমের কী হয়েছে?'

খিলখিল করে হাসল ডোপা। 'তারানা হাশিমের কিছু হয়নি। হয়েছে তোমার। ম্যাডামকে তোমার ভাল লেগেছে। ব্যাপারটা ভালবাসা পর্যন্ত গড়াতে পারে।

অনুমানটা মিথ্যে?'

ফারুক হতভম্ব। কথা বলার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। দুনিয়া খুবই বিচিত্র জায়গা। পদে পদে বিস্ময়। কে যে কখন কোন্ শক্তিতে কাকে ঘায়েল করে, বোঝা যায় না।

ডোপা আবার বলল, তারানা হাশিম তোমার মন জুড়ে আছে, ফারুক ভাই। কেমন করে বুঝলাম, জানো?'

'না, ডোপা।'

'তোমার চোখ দেখে। আলী জাবেরের প্রেমে পড়ে ফারহানা মজুমদার ঠিক এমন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের "নষ্টনীড়" নাটকের কথা বলছি, বুঝতে পারছ তো?'

ফারুক এতক্ষণ একটু-আধটু তারানার কথা ভাবছিল, এটা মিথ্যে নয়। হয়তো ডোপার অনুমানের পেছনে শক্তিশালী যুক্তি আছে। হয়তো ব্যাপারটা সত্যিই। কিন্তু এই মুহূর্তে তারানার বিষয়টা, এমনকি নিজের কথাও ভুলে গেল ফারুক। ডোপার কথা ভাবছে সে। স্টারস্ট্রাক। বাংলায় কী বলা যায়? তারকা-বিমোহিত?

ডোপা আবার বলল, 'তুমি সুযোগ পেলেই তারানা হাশিমের দিকে তাকাচ্ছিলে। অথচ ভান করছিলে না-তাকানোর। মিথ্যে বলছি?'

কোমরে হাত দিয়ে গর্বভরে ফারুকের দিকে তাকাল ডোপা। 'জানি, তুমি উত্তর দিতে পারবে না। আজ তোমার সঙ্গে একলা সাগর দেখতে আসার কোন ইচ্ছেই ছিল না, ফারুক ভাই। শুধু কথাগুলো বলা আর তোমাকে পরীক্ষা করার জন্যেই আমার আসা। "যে যেখানে দাঁড়িয়ে" নাটকে লতিফুন্নাহার কণা একটা দারুণ কথা বলেছিল, জানো? সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ মিথ্যা বলতে পারে না।'

ফারুক ধীরে ধীরে বলল, 'তারানা হাশিমের চোখে কী দেখতে পেলে?'

ডোপা হাসতে হাসতে তলপেটে হাত চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল। 'উনি তো খাবি খাচ্ছেন!'

'দূর, পাগলী!'

'আমার মাথা ঠিক আছে, ফারুক ভাই। তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পারো।'

আসার পথে যে-ঘটনাটা ঘটেছিল, সেটা অন্তরের চোখে দেখতে পাচ্ছে ফারুক। তারানার ভিজে কাপড় আর পিছল শরীরটা এখনও শরীরের প্রত্যেক রোমকূপে অনুভব করতে পারছে সে। ওই মুহূর্তে বুনো মোষের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল ওরা। খুব ইচ্ছে হয়েছিল তারানার ভিজে ঠোঁটে প্রবল আবেগে চুমু খেতে। সাহস হয়নি। ফারুক আরও বুঝতে পারছে, এতক্ষণ তারানা সম্পর্কে যে-ধারণাই পোষণ করুক, ডোপার বিবৃতিতে দারুণ প্রভাবিত হয়েছে সে। কথাগুলো ওর শরীর, মনে যেন যাদুর কাঠির পরশ দিয়েছে। এখন, এই হেমন্তে ওর শরীরে ফাগুনের গান, মনে বৈশাখের ঝড়ো হাওয়া···

কিন্তু ডোপার হঠাৎ কি হলো; ফারুক ভেবে পেল না। সে আর কথা বলছে না। দুই হাঁটুর মাঝখানে লুকিয়ে রেখেছে মাথা। তার মাথার লম্বা বেণী পিঠের ওপর দিয়ে পল্লীর মেঠো পথের মত এঁকেবেঁকে চলে গেছে কোমর পর্যন্ত।

'কী হলো, ডোপা? কথা বলছ না কেন?'

ডোপা উত্তর দিল না।

'ডোপা, আমার দিকে তাকাও।'

ডোপা মুখ তুলল। অশ্রুতে চিকচিক করছে তার চোখ, গাল। একগোছা চুল সে-অশ্রুর সঙ্গে সহানুভূতি দেখাচ্ছে মুখের সঙ্গে লেপ্টে গিয়ে। কি যেন বলতে গিয়ে ওর ঠোঁট সামান্য কেঁপে উঠল। বলতে পারল না।

'কী হয়েছে?'

'কিছু না, ফারুক ভাই। চলো, বাসায় যাই।'

ফারুক নড়ল না। একদৃষ্টে ডোপার দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ তার মনে হলো, ডোপা বড় হয়ে গেছে। একা নিজের মনের ভুবনে বেচারি কোন বড় রকমের ভুল করে ফেলেনি তো? মানুষ এক জায়গায় বড় অসহায়। সেটা তার নিজের মন।

পর মুহূর্তেই চোখ মুছে হেসে ফেলল ডোপা। 'কিছু মনে কোরো না, ফারুক ভাই। হঠাৎ আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। জানো, একজনকে ভালবেসে ফেলেছিলাম।'

রুদ্ধশ্বাসে ফারুক বলল, 'তারপর?'

'তারপর বিশেষ কিছু নেই। সেই যে গানটা··· "ভরে রইল বুকের তলা, কারও কাছে হয়নি বলা···" আমার অবস্থা ওই রকম। একটা মস্ত শিক্ষা হয়ে গেল, ফারুক ভাই। সব চুরিই খারাপ। এমনকি চুরি করে কাউকে ভালবাসতেও নেই।'

'ডোপা,' গাঢ় স্বরে ফারুক ডাকল, 'তুমি এখনও ছোট। এখন যাকে ভালবাসা বলে মনে হচ্ছে, একটু বড় হয়ে দেখবে, সেটা আসলে ভালবাসা নয়, শুধুই একটা আবেগ আর মোহ। ভালবাসা অনেক বড় জিনিস, ডোপা।'

বুক-ভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডোপা। 'কে জানে, হয়তো তোমার কথাই ঠিক। চলো, বাসায় যাই। তারানা হাশিম চিন্তা করছেন।'

হাত বাড়িয়ে দিল ডোপা। ফারুক টেনে তুলল ওকে। কামিজের পেছন থেকে ধুলো বালি ঝেড়ে পা বাড়াল সে। ফারুক সস্নেহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনুসরণ করল তাকে। বোকার মত একতরফা ভাবে 'একজনকে' মন দিয়েছে সে। 'একজনটি' কে, বুঝতে ফারুকের এতটুকুও অসুবিধে হচ্ছে না।

তারানা বানর দেখছিল। রফিক নওয়াজ আর আসিয়া বানর পোষেন। রফিকের সহকর্মীরা প্রায়ই বন থেকে ধরে আনে বানরের বাচ্চা। রফিক কাঠ আর তারের জাল দিয়ে খাঁচা বানিয়েছেন। বাচ্চাগুলোকে খাঁচায় রেখে পোষেণ তাঁরা। বড় করে আবার ছেড়ে দেন। স্বামী-স্ত্রী, দু'জনেরই হবি-তে পরিণত হয়েছে ব্যাপারটা। বানরের বাচ্চাদের খাওয়া-দাওয়া, অসুখ-বিসুখ আর নিরাপত্তার খুঁটিনাটি বিষয়গুলো তদারক করেই তাঁদের অবসর কাটে। ডোপা যখন কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে আসে, সে-ও এ-ব্যাপারে সাহায্য করে।

আসিয়া রান্নাঘরে গেছেন নাশতার আয়োজন করতে। রফিক নওয়াজ বানরের বিচিত্র অভ্যেস আর প্রকৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা করছিলেন। সেটা উপভোগ করছিল তারানা। মাঝে মাঝে অবশ্য আনমনা হয়ে পড়ছিল। ফারুক আর ডোপা কোথায়

গেল? এমন অসমবয়সী দু'জন মানুষের মধ্যে কিভাবে ভালবাসা গড়ে উঠতে পারে, বুঝতে পারে না তারানা। রফিক নওয়াজ আর তার স্ত্রীও তাদের সম্পর্কের ব্যাপারে উদাসীন, ও লক্ষ করেছে। কিন্তু এমন ঔদাসীন্যের কী মানে হয়? ডোপা বড় হয়েছে। অন্তত আসিয়ার সেটা বোঝা উচিত।

কিন্তু সেটা ওদের ঘরোয়া ব্যাপার। তারানা নিজেকে ধমক দিল। সে একটা বিশেষ কাজে কাঙ্গা যাচ্ছে। কাঙ্গা থেকে ফিরে যাবার পর ডোপার সঙ্গে আর দেখা হবে না। ফারুকের কথাও হয়তো আর মনে পড়বে না। ওদের সম্ভাব্য সম্পর্ক নিয়ে ভেবে মন খারাপ করার কী আছে? কিন্তু তারানা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, ধমকে কাজ হচ্ছে না। কাঁটার মত ব্যাপারটা ফুটে আছে ওর মনের ভিতর।

এমন সময় চমকে উঠল তারানা। কেউ এসে পেছন থেকে তার কাঁধে হাত দিয়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে ডোপাকে দেখে ও অবাক হয়ে যায়। ডোপার ছলছল চোখের তারায় বন্ধুত্বের আকুতি। ঠোঁটে ঝুলে আছে এক টুকরো হাসি। সে-হাসিতে কিছু না বলেও যেন অনেক কথা বলে যাচ্ছে মেয়েটা। হঠাৎ তাকে দুর্বোধ মনে হচ্ছে।

'কী খবর, ডেঁপো?' রফিক নওয়াজ এগিয়ে এলেন। 'মর্নিং ওয়াক কেমন লাগল?'

'দারুণ, দুলাভাই! আকাশটা আজ এত পরিষ্কার ছিল যে মনে হচ্ছিল, সাগরের ওপারে কেউ একটা নীল পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছে। তারপর যখন সূর্য উঠল···উফ!···সে যে কি দৃশ্য!···আচ্ছা, দুলাভাই, নাটক-সিনেমার শুটিং-এর জন্যে সবাই কক্সবাজার হিমছড়িতে যায় কেন? এখানেও তো মাঝে মাঝে আসতে পারে! তা ছাড়া···'

বাধা দিয়ে রফিক বললেন, 'থামো! তোমার শুধু ওই এক কথা। সিনেমা আর নাটক!'

ডোপা খিলখিল করে হাসে। 'ভদ্রলোকের এক কথা, দুলাভাই।'

রফিক বললেন, 'তোমার গাইড কোথায়? সাগরের জলে ডুবে মরেনি তো?'

ডোপা আড়চোখে তারানার দিকে তাকাল। 'দুলাভাই, উনি সাগরের জলেই বাস করেন। ডুবে ডুবে পানি খান। মরতে চাইলেও মরার কোন চান্স নেই। "ডুবসাঁতার" নাটকটা দেখেননি? নায়িকা ছিল শম্পা। সে কেবল স্বপ্ন দেখত···'

রফিক এক হাতে ডোপার চুলের বেণী মুঠ করে ধরলেন, অন্য হাতে চেপে ধরলেন মুখ। 'নো মোর নাটক, ডেঁপো। আগে প্রশ্নের উত্তর দাও।'

তারানার মনে হলো, শরীরের সব রক্ত এসে মুখে জমা হয়েছে। মেয়েটা সত্যিই ডেঁপো, মানুষকে এমনভাবে নাজেহাল করতে পারে!

ডোপা বলল, 'আমাদের গাইড সাহেব গেছেন তাঁর ফিয়াঁসের কাছে।'

রফিক বললেন, 'ফিয়াঁসে মানে?'

'ফিয়াঁসে মানে বনদেবী, আপনারা কিচ্ছু বোঝেন না। সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেছেন কাঙ্গা রওনা হবার বিষয়ে।'

রফিক সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করলেন। 'ওদের তো বিশ্রাম নেবার কথা। কাঙ্গা রওনা হবার কথা নয়। আপনি কী বলেন, মিস তারানা?'

ডোপা আবার তারানার দিকে আড়চোখে তাকাল। 'তর সইছে না বোধহয়।

খুবই কর্তব্যপরায়ণ মানুষ!'

তারানা বলল, 'আমার কোন তাড়া নেই। ভালই লাগছে আপনাদের জায়গাটা। তবে কাঙ্গার ব্যাপারটা মনে হয় আরও অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। জোয়ার-ভাটা···আরও কি কি জিনিস···আমি ঠিক জানি না।'

'ঠিকই বলেছেন,' বিড়বিড় করে বলতে বলতে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন রফিক নওয়াজ। 'তাই যদি হয়···তাড়াতাড়ি নাশতার ব্যবস্থা করা দরকার। প্যাকিং-এর ঝামেলা আছে···'

ডোপা আবার তারানার কাঁধে হাত রাখল। 'আমি খুব বেশি কথা বলি, তারানা আপা। আপনার মত মুখ গুঁজে থাকতে পারি না। তবে আমার বিশ্বাস, গুণী শিল্পীরা কথা কম বলেন। ব্যতিক্রম শুধু সুপর্ণা মুর্তাজা। একবার খুলনায় ফাংশানে এসেছিলেন। কত যে কথা বলেন কিচিরমিচির করে! শুনুন, কানে কানে একটা কথা বলি।' তারানার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে ডোপা বলল, 'ফারুক ভাইয়ের সাম্প্রতিক মানসিক অবস্থার খোঁজখবর নিতে সাগরের কূলে গিয়েছিলাম। সূর্যোদয় দেখা-টেখা সব বাজে কথা।'

অনেক কষ্টে হাসি চেপে রেখে তারানা বলল, 'কী জানতে পারলে?'

ডোপা গম্ভীর হয়ে গেল। 'এখন শুনবেন, না নাশতা খাওয়ার পরে?'

ডাইনিং রুমের জানালা খুলে মুখ বাড়ালেন আসিয়া। নাশতা খেতে ডাকলেন সবাইকে।

তারানা বলল, 'সত্যিই এখন কাঙ্গার উদ্দেশে রওনা হব আমরা?'

'আরে, না। ফাঁকি দিলাম দুলাভাইকে।'

'কেন?'

'দুটো কারণে। দুলাভাইকে তাড়াতে চাচ্ছিলাম। তা ছাড়া নাশতার তাগাদা দেয়ার দরকার মনে হলো। সাগরের হাওয়া খেয়ে তো পেট ভরে না, খিদেটা বেড়ে যায় কেবল। আপনারও নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে!'

'তোমাকে খুব ভাল লাগছে, ডোপা,' ধীরে ধীরে তারানা বলল, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি খুব ভাল মেয়ে। তোমার মনটা ভাল। তোমার মত ভাল মনের মানুষ সমাজে খুব বেশি নেই।'

ডোপা কেঁদে ফেলল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলল, 'আমার মন একটুও ভাল না, তারানা আপা। খুব বাজে। হয়তো একদিন শিল্পী হব, তখন ভাল হয়ে যাব।'

'আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে গিয়ে আপনি ডোপার কাছে ধরা পড়ে গেছেন।'

তারানার কথাটা চমকে দিল ফারুককে। নিদারুণ সত্যি কথা। সে বিহ্বল দৃষ্টিতে তারানার দিকে তাকিয়ে রইল। পাশাপাশি হাঁটছিল ওরা—নদীর কিনারা বরাবর। সরু পায়ে-চলা পথ। একদিকে নদী, অন্যদিকে গেওয়া, আমুর, বায়েন, সোন্দাল আর হেতাল গাছের সারি। তারানা জঙ্গলে যেতে চেয়েছিল। শুনে গাইড আপত্তি করেনি।

হাঁটতে হাঁটতে হালকা মেজাজে কথা বলছিল তারানা। বাবার সঙ্গে ভাওয়ালের জঙ্গলে বেড়ানোর টুকরো স্মৃতি রোমন্থন করছিল। হঠাৎ একটা কথা বলে ফারুকের পিলে চমকে দিল।

'আমার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে গিয়ে আপনি ডোপার কাছে ধরা পড়ে গেছেন।'

পেশা যার বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই আর সমুদ্রের মত্ত ঢেউয়ের ওপর রাত্রিযাপন করা, সে কেঁপে উঠল এক সদ্য পরিচিতা তরুণীর সামান্য একটা কথায় ঘায়ে। বুঝতে পারল, ভয় পেয়েছে সে। ভোরবেলা ডোপার প্রথম আঘাতে কাবু হয়ে পড়েছিল, তারানার সরাসরি আক্রমণে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছে!

বিব্রত স্বরে বলল, 'পালিয়ে বেড়াচ্ছি, কথাটা ঠিক নয়। আসলে নিজের সঙ্গে লড়াই করছি।'

তারানা মুখ তুলল। 'কিসের লড়াই?'

ফারুক হাসল। 'দুনিয়ায় যারা লড়াই করে, তাদের বেশির ভাগই জানে না, ঠিক কেন লড়াই করছে। আমার অবস্থা তাদের চেয়ে বেশি ভাল না। কেন লড়াই করছি, কিসের এ-লড়াই, জানি না। শুধু জানি, এ-লড়াইয়ে আমাকে জিততে হবে।'

'সত্যি সত্যি আমি আপনার জন্যে এতখানি সমস্যা হব, জানলে গোটা ঘটনাটা অন্য রকম হত। কল্পনাও করিনি, আমার জন্যে এত ভুগতে হবে আপনাকে। ভেবেছিলাম, নিরেট হৃদয়হীন মানুষ। কিন্তু আপনি যে আমার চেয়ে অনেক বেশি সেন্টিমেন্টাল, হয়তো ডোপার চেয়েও বেশি, তা জানতাম না।'

ফারুকের মুখে শুকনো হাসি। 'আমার অনেক কিছুই আপনি জানেন না।'

'মেনে নিচ্ছি। কিন্তু···জানতে চাই···যদি আপত্তি না থাকে।'

মেঠো পথ থেকে আরও ছোট একটা শাখা পথ ধরে বনের ভিতর ঢুকে পড়ল ফারুক। তারানার হাত ধরে সে। কেঁপে উঠল তারানা।

'কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে?'

'আমার কাছে। আপনার কাছে। নিজেদের কাছে।'

কয়েক পা এগিয়ে থামল ফারুক। বসার উপযোগী একটা গাছের গুঁড়ির ওপর রুমাল বুলিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করল।

'বসো, তারানা।'

তারানা ফারুকের চোখের দিকে তাকিয়ে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

ফারুক গাঢ় স্বরে বলল, 'আদিমতম প্রকৃতির কোলে এসে পৌঁছেছি আমরা। এখানে নিজেদের মধ্যে কোন কৃত্রিম ব্যবধান রাখা যায় না। এখানে আমরা সত্যের মুখোমুখি। কোন মিথ্যের আড়াল নয়।'

তারানার চোখ ছল ছল করে উঠল। নাকের ছিদ্র প্রসারিত হলো। সামান্য ফাঁক হলো অধর আর ওষ্ঠের মাঝখানে। চিবুক কেঁপে উঠল। তোলপাড় শুরু হলো বুকের ভেতরে। নিজেকে আর নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারছে না সে। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে, অপ্রস্তুত অবস্থায় ওর জীবনে প্রেম এল। ওর জীবনের অনেক

বসন্ত, শ্রাবণের অনেক নিঃসঙ্গ রাত কেটেছে এই লগ্নটির জন্যে। একজন পুরুষের নিবিড় নৈকট্য, উষ্ণ নিঃশ্বাস আর অকপট অঙ্গীকারের প্রতীক্ষায় কঠোর সংযমে ওর দিন কেটেছে।

চোখ বুজল তারানা।

নিঃশ্বাসের শব্দে ফারুক বলল, 'ডাক দিয়েছি। সাড়া দেবে না?'

আরও নিচু স্বরে, কাঁপা কাঁপা ঠোঁটের ফাঁকে, প্রায় নিঃশব্দে তারানা উচ্চারণ করল, 'এসো।'

মুখের আরও কাছে এগিয়ে এসেছে পুরুষের নিঃশ্বাস। অন্তরে লুকিয়ে রাখা কোন এক অজানা বনে আগুন লাগল সে-নিঃশ্বাসের উত্তাপে। তারানা অনুভব করল, ওর সমস্ত সত্তা গলে পড়ছে শরীরে।

প্রবল শক্তিতে ফারুক ওর মুখের সমস্ত অংশ দখল করে নিতে লাগল। উন্মত্তের মত ওর আগ্রাসনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে লাগল তারানা। ফারুকের ঠোঁট যখন ওর ঠোঁট থেকে বিচ্ছিন্ন হলো, তারানার মনে হলো প্রবল ভূমিকম্পে ধসে পড়েছে সব প্রতিরোধ-ব্যূহ। ফারুকের কাঁধে মুখ লুকিয়ে অবলম্বন খুঁজল তারানা। হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক।

ফিসফিস করে তারানা বলল, 'কোনদিন আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।'

ফারুক বলল, 'তুমিও চিরদিন আমার থেকো।'

কাছেই হোডো গাছের ডালে কিচমিচ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল একটা বানর। তারানা সভয়ে আঁকড়ে ধরল ফারুকের শরীর।

'কিছু না, তারানা! বানর।'

তারানা আদুরে গলায় বলল, 'কেন আমায় কাঙ্গায় নিয়ে আসতে চাওনি তুমি? কেন দিলে অত কষ্ট?'

'নিজের ভয়ে। প্রথম দর্শনেই তোমার প্রেমে পড়েছিলাম আমি। হোটেল শিবসার কাউন্টারে যখন তুমি চেক-ইন করছিলে, তখনই। এই ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে তোমাকে আসতে দিতে মন চায়নি।'

তারানা মুখ নিচু করল।

ফারুক বলল, 'ভেবেছিলাম, সঙ্গী বা গাইডের অভাবে পরিকল্পনাটা বাদ দেবে।'

ফারুক তারানার দু'কাঁধে আলতোভাবে আঙুল ছোঁয়াল। 'না, তুমি তোমার যোগ্যতা প্রমাণ করেছ। এমনকি এমনও বিশ্বাস জন্মেছে, তুমি আমার এই ঝুঁকিপূর্ণ পেশার যোগ্য সহচরী হতে পারো। যেটুকু ট্রেনিং দরকার, তার জন্যে আমি আছি।'

তারানার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ।'

তারানার মুখের ওপর আবার নেমে এল ফারুকের মুখ। এবার আর একতরফা নয়, বিলম্বিত দেয়ানেয়ার মধ্য দিয়ে ওরা গভীর গোপনে লড়াই করল, পরস্পরকে অনুভব আর উপলব্ধি করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর তারানা পশ্চিমের আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিনের

আলো ফুরিয়ে এল। যাবে না?'

ফারুক তারানাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে বলল, 'দিনের আলো ফুরিয়ে যাক, ক্ষতি কী? জীবনের তো শুরু হলো!'

নয়

ডোপা তারানার গলা জড়িয়ে ধরে পাশে শুয়ে পড়ল। 'আজ আমি তোমার কাছে শোব, তারানা আপা।'

'বেশ তো। শোও না!'

'সন্ধের সময় তোমরা লঞ্চঘাটের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলে, না?'

'তারানা ডোপার দিকে তাকিয়ে রইল। ডোপা সবজান্তার ভঙ্গিতে হাসল। তারানার ঠোঁটের কোণে হাত বুলিয়ে দিল। লজ্জায় তারানার মুখ লাল। ডেঁপো মেয়েটা খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। কিন্তু তাকে এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। ক্রমেই বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ছে সে। সম্বোধনের বেলায় আপনি থেকে তুমি-তে নেমেছে। নতুন জায়গায় বেড়াতে এসে মানুষের, বিশেষ করে মেয়েদের নানা রকমের অসুবিধে হয়। ডোপা তারানার সুখ-সুবিধের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। ইচ্ছে করলেই ওকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। রাতে খাওয়ার পর যখন ফারুক নিচের তলার গেস্ট রুমে শুতে গেছে, তখনই ডোপা শক্ত করে ধরেছে তারানাকে। সে গল্প করবে তারানার সঙ্গে। আসিয়া ভেবেছিলেন, তারানাকে নিজের রুমে নিয়ে যাবেন তিনি। কিন্তু ডোপার হাবভাব দেখে বুঝলেন, পরিকল্পনা বাতিল করা ছাড়া উপায় নেই।

তারানার কানে মুখ রেখে ডোপা বলল, 'সোজা পথে হাঁটতে হাঁটতে যেই বনের মধ্যে ঢুকে পড়লে, তখনই বুঝলাম, প্রাইভেট ব্যাপার-স্যাপার আছে।'

'দারুণ পাজি মেয়ে তো তুমি!' ডোপার কানে চিমটি কেটে তারানা বলল, 'এত দূর থেকে নিশ্চয়ই এসব দেখতে পাওনি! অনুসরণ করছিলে নাকি?'

'না, না, অনুসরণ করব কেন? তোমার যন্ত্রটা দিয়েই তোমার গতিবিধির দিকে নজর রাখছিলাম। খুব শক্তিশালী যন্ত্র, তাই না?'

মনে পড়ল তারানার। 'ও, তাই বলো। বাইনোকিউলার। ওটা আমার নয়, ডিয়ার। তোমার ফারুক ভাইয়ের।'

খিলখিল করে হাসল ডোপা। 'ওই একই কথা হলো। সন্ধের শীর্ষ বৈঠক যদি সফল হয়ে থাকে, তাহলে ফারুক ভাইয়ের সবই তো তোমার!'

তারানা হেসে ফেলল।

ডোপা বলল, 'শুধু হাসি দিয়ে ঢাকলে হবে না। মুখ খোলো। কংগ্র্যাচিউলেশন্‌স্ জানাতে পারি তোমাকে?'

ডোপার গাল টিপে তারানা বলল, 'কংগ্র্যাচিউলেশন্‌স্ জানানোর মত কোন ঘটনা ঘটেনি, ডেঁপো মেয়ে, তবু···ঠিক আছে···নিলাম। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। খুশি হয়েছ?'

ডোপা উৎফুল্ল স্বরে বলল, 'খুব খুশি। ফারুক ভাইয়ের সঙ্গে তোমাকে দারুণ

মানাবে। ঢাকায় ফিরে গিয়ে প্রেস কনফারেন্স ডেকে সব জানাচ্ছ নিশ্চয়ই! সামনের মাসের "তারকাভুবন" পত্রিকায় তোমাদের ছবি যাচ্ছে তো?'

মুখে আঁচল চাপা দিল তারানা। 'বাপরে বাপ! সাংঘাতিক মেয়ে তো তুমি! আমি খুব সামান্যা অভিনেত্রী, ডোপা। যদি কখনও বনিতা, বীথি, ওদের মত বিখ্যাত নায়িকা হতে পারি, তোমাকে আমার প্রাইভেট সেক্রেটারি বানাব।'

'ইস!' ভেঙচি কাটল ডোপা। 'বললেই হলো! তখন বুঝি আমি এই ডোপা থাকব! তখন তো আমিও নামকরা অভিনেত্রী!'

'ও, হ্যাঁ, তাই তো! ভুলেই গিয়েছিলাম। সরি। মাফ করে দেন, ভাই। ভবিষ্যতের ব্যস্ততম নায়িকাকে আমি অপমান করেছি।'

'ঠিক আছে, মাফ করে দেয়া গেল। এখন বলো, কবে বিয়ে করছ?'

'কেন এমন জেরা করছ, ডোপা?'

'আহা, বুঝতে পারছ না? পরশুদিনই খুলনা ফিরে যাচ্ছি। পত্রিকায় বেরুনোর আগেই যদি তোমার বিয়ের খবর আমি বি.এল. কলেজের মেয়েমহলে প্রচার করতে পারি, আমার পজিশন কত উঁচু হয়ে যাবে, অনুমান করতে পারো? বিশেষ করে আমার বান্ধবী জেসমিন নিজেই একটা পত্রিকার সমান। গোটা খুলনা জেনে যাবে ওর মুখ থেকে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল তারানা। 'কাল আমরা কাঙ্গা রওনা হব, ডোপা। ওটা খুব খারাপ জায়গা। প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব কিনা জানি না। যদি পারি, তখন এসব ভাবব। দিনক্ষণ স্থির হলে অন্তত তোমাকে অবশ্যই জানাব। এটুকু বিশ্বাস আমার ওপর রাখতে পারো।'

আরও অনেকক্ষণ বকবক করে ডোপা তারানার গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। তারানার ঘুম এল না। ফারুক কি করছে, জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। ও কি ঘুমিয়ে পড়েছে? জীবনের নতুন গানের জন্মতিথিতে আজ তারানার ঘুমুতে ইচ্ছে করছে না।

জেগে থাকতে থাকতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, জানে না তারানা। গভীর রাতে আধো ঘুমে, আধো জাগরণে হেলিকপ্টারের শব্দ শুনতে পেল। নিচের তলায় বেশ কয়েকজন মানুষের গলার স্বর। কে যেন এসেছে। আসিয়ার জন্যে তারানার মায়া লাগল। সময়ে-অসময়ে বেচারিকে অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করতে হয়।

একসময় মনে হলো, স্বপ্ন দেখছে সে। তারপর একসময় সত্যিই যখন একটা পরিচিত গলার হাসির শব্দ ভেসে এল, চোখ থেকে পুরোপুরি ছুটে গেল ঘুম। কার গলা? এ-স্বরের সঙ্গে তার পরিচয় আছে। কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ছে না।

কৌতূহল দমন করা অসম্ভব হয়ে উঠল। গলা থেকে ডোপার হাতটা ধীরে ধীরে নামিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল তারানা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে। একজন পরিচারিকা উঠে আসছিল দোতলায়।

'কে এল এত রাতে?' তাকে জিজ্ঞেস করল তারানা।

পরিচারিকা বলল, 'কামার ফরিদ সাহেব।'

কামার ফরিদ! এত রাতে! বিস্ময়ের ঘোর সামলাতে কয়েক সেকেণ্ড কাটল। জানা গেল, সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার বিশেষ কাজে খুলনা থেকে বরিশাল যাচ্ছিল।

সুযোগটা নিয়েছে কামার ফরিদ। তার অনুরোধে সৈন্যরা ওকে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে। ফারুকের সঙ্গে কি একটা জরুরী কাজ আছে তার। ভোরবেলায় ফেরার সময় হেলিকপ্টারটা আবার তুলে নিয়ে যাবে তাকে।

বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা। কিন্তু তারানার মন ভরল না। এত রাতে কামার ফরিদের এই ঝটিকা সফরের পেছনে অন্য কোন কারণ আছে।

তারানা নিচে নামল। এগিয়ে গেল ফারুকের ঘরের দিকে। অন্য সবাই ফিরে গেছে যার যার বিছানায়। বারান্দা শূন্য। তারানা ফারুকের ঘরের জানালার নিচে দাঁড়াল। ভিতরে কথা বলছে দু'জন। ফরিদ আর ফারুক। তারানা ভেবেছিল, সোজা দরজার সামনে গিয়ে কড়া নাড়বে। কিন্তু কয়েকটা কথাবার্তা কানে যেতেই সে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলল। পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল জানালার নিচে।

'আমি তো তোমাকে বরাবরই বলে আসছি, ড. হাশিমের মেয়েটার উপস্থিতি তোমার এ কাজের জন্যে একটা চমৎকার কাভার।'

ফারুক বলল, 'কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তুমি ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছ। আগেও এমন একটা সন্দেহ হয়েছিল আমার।'

ফরিদ হাসল। 'না, না, ফিরিয়ে নেব কেন?'

ফারুক গম্ভীর মুখে বলল, 'সেটা আমি জানি না। তুমি আমাকে অনেক "কেন"-র উত্তর দাও না।'

ফরিদ ফারুকের কাঁধে মৃদু চাপড় দিয়ে বলল, 'এখন বলো, কেমন চলছে সব কিছু?'

ফারুক বলল, 'ভালই চলছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকবে, বুঝতে পারছি না। হয়তো মংলা বন্দরেই ফিরে যেতে হবে। ভাবতেই খারাপ লাগছে। তোমাকে বলেছিলাম আমি। ওনাকেও বুঝিয়ে বলেছি গোড়াতে।'

তারানা কপাল কোঁচকাল। 'ওনাকে' মানে কাকে? কার কথা বলছে ফারুক?

ফরিদ বলল, 'মন খারাপ কোরো না, ফারুক। সাম্প্রতিক খবর বলো। বুড়োর ব্যাপারে কথাবার্তা হয়েছে? কাঙ্গায় সত্যিই কিছু পেয়েছিলেন তিনি, যা তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছে?'

'এটা জিজ্ঞেস করার জন্যেই তুমি এতটা পথ এসেছ?'

ফরিদের স্বরে অসহিষ্ণুতা ফুটে ওঠে। 'ওটা জানা আমাদের খুবই দরকার, ফারুক। কিন্তু···ঠিকই ধরেছ···ঠিক ওই কারণে আসিনি আমি। এসেছি তোমাকে সাহায্য করতে আর কিছু সৎ পরামর্শ দিতে। ওই মেয়েটার ব্যাপারে তোমার মনোভাবের কথা জানতাম আমি। একটু সদয় হও ওর প্রতি। মেয়েটা খুবই ভাল। মনটা নরম। চেষ্টা করলেই জেনে নিতে পারবে, ওর বাবা কি বলে গেছেন ওকে। ব্যাপারটার সঙ্গে শুধু আমাদের নয়, ওরও স্বার্থ জড়িয়ে আছে। এখন সত্যি সত্যি বলো দেখি, রূপসীকে একটু একটু করে ভাল লাগছে তোমার?'

'না,' সাফ জবাব ফারুকের।

ফারুক মিথ্যে বলল কেন, তারানা বুঝতে পারছে না। কিংবা···কে জানে···আদৌ মিথ্যে বলেছে কি? হয়তো এটাই সত্যি কথা। শিউরে উঠল তারানা। এভাবে কতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আড়ি পাতা যাবে, বুঝতে পারছে না।

কিন্তু চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতে গিয়েও দাঁড়িয়ে রইল।

নিচু স্বরে হাসল ফরিদ। 'এক কাজ করলে হয় না? কাজের দায়িত্ব নতুন করে ভাগাভাগি করা যাক। তোমারটা আমি···আমারটা তুমি···কেমন হয়? আমি, ভাই, ভেবে পাচ্ছি না, অমন চমৎকার মেয়ে তোমার চোখে ধরছে না কেন? আমি তো প্রথম দিনেই···'

ফারুক হাসিতে যোগ দিল। 'তাহলে এক কাজ করো, দোস্ত, ওকে তুমি মংলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও।'

তারানার মনে হলো, ওর মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে, ঠাণ্ডা হয়ে আসছে হাত-পা। এসব কী বলছে ওরা?

ফরিদ হাসি থামিয়ে বলল, 'না, ভাই, ও তোমারই থাক। আমার দরকার কাহিনীটা। কাঙ্গায় ঠিক কী হয়েছিল! কেন নৃশংসভাবে খুন হলেন জ্ঞানতাপস লোকটি? চোখ-কান খোলা রেখো। এ-সত্য উদঘাটনের ওপর আমাদের ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্ভর করছে। এগুলো তুমি আমার চেয়েও ভাল জানো।'

ফারুক গলার স্বর আরও নিচু করে কথা বলতে শুরু করল। তারানা অনেক চেষ্টার পরও আর কিছু শুনতে পেল না। কিন্তু সর্বান্তঃকরণে কামনা করল, ফারুক একটু জোরে কথা বলুক। তাহলে ও শুনতে পেত পরের কথাগুলো।

অন্ধকারে একা দাঁড়িয়ে রইল তারানা। যেন মেঝের সঙ্গে আটকে গেছে পা। বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়েছে। মুখ উত্তপ্ত। এই সফর তাহলে একটা সাজানো ব্যাপার? ফরিদ চেয়েছিল, তারানাকে ব্যবহার করুক ফারুক। জানতে চেষ্টা করুক, ড.আবুল হাশিম কী বলেছিলেন মেয়েকে? কী জানতে চায় তারা? কেন? কিন্তু সে যা-ই হোক, ফারুক তো বিশ্বাস করে না, ওর কাছে কোন তথ্য আছে! পাত্তাই দিচ্ছে না ওকে। অবশ্য এটা ফারুকের ছলনাও হতে পারে। হয়তো ফরিদের কাছে মনের কথা বলতে চায় না সে। কিন্তু ফরিদের পরামর্শের ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়েও দিচ্ছে না। কাজ করে যাচ্ছে। এসব বুঝতে পারা তারানার জন্যে সহজ হত, যদি হঠাৎ সন্ধেবেলায় ওই ঘটনাটা না ঘটত। মনে হতেই সারা শরীরে নতুন করে রক্তস্রোতের জাগরণ অনুভব করল তারানা।

কী ছিল ব্যাপারটা? ভালবাসা নয়? প্রতিশ্রুতি বিনিময় নয়? সবই সাজানো ব্যাপার? ফারুক আর ফরিদ কি তবে আবদুল্লাহ-আল-হুসেন কিংবা আসিফুল হক চৌধুরীর মতই নাটক লিখে ওকে কাস্ট করেছেন? সবই পাতানো খেলা!

তারানা আকাশপানে তাকাল। ফরসা হয়ে উঠেছে পুবের আকাশ। নিঃশব্দে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল ও।

ডোপা অকাতরে ঘুমুচ্ছে। মেয়েটির ওপর বিষম মায়া হলো ওর। মাথার কাছে বসে ওর কপালে হাত বুলিয়ে দিল তারানা। কখন কান্না এসেছে, চোখ উপচে দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে ডোপার কপালে, তারানা টের পায়নি।

মংলা থেকে এ-পর্যন্ত শুধু দক্ষিণে এসেছে ওরা, এবার যাচ্ছে পুবদিকে। রওনা হয়েছে সকাল সাতটায়। ছ'টার দিকে রওনা হতে চেয়েছিল, কিন্তু ডোপা বাদ সেধেছে এ-পরিকল্পনায়। ভোরে ওকে কোন ভূতে পেল, কে জানে, তারানাকে

আঁকড়ে ধরে রইল ছোট, অবুঝ শিশুর মত।

'এখনই যেয়ো না, তারানা আপা। আরও একটু বসো। হয়তো আর কোনদিন দেখা হবে না। তোমাকে একটু দেখি।'

সবাই মিলে বোঝালেন। ফারুক সান্ত্বনা দিল। তারানাও আশ্বাস দিল, ঢাকায় ফিরে গিয়ে ওর জন্যে চমৎকার অ্যালবাম পাঠাবে। তাতে থাকবে বিখ্যাত সব তারকাদের অটোগ্রাফ আর ছবি।

'জানো, তারানা আপা, প্রথম দিনটা তোমাকে মিস করেছি বলে কি যে দুঃখ হচ্ছে! ভাবতেই পারিনি, তুমি এত ভাল। সেদিন সন্ধেয় ফারুক ভাইকে অনেক অনুরোধ করেছি তোমার সঙ্গে ভাব জমিয়ে দেবার জন্যে।'

হিরণ পয়েন্টে প্রথম সন্ধের কথা তারানার মনে পড়ল। ও ভুল বুঝেছিল ডোপাকে। কিন্তু ভুল বোঝাটাই তো ভাল ছিল। তা হলে পরে ফারুককে ভুল বোঝার সুযোগ হত না। কেন মেয়েটা ওই ভুল ভেঙে দিয়ে এত বড় সর্বনাশ করল তার!

বনদেবী প্রবলভাবে দোলা খাচ্ছে ঢেউয়ে। স্টিয়ারিং হুইল ধরে বসেছে ফারুক। ওর বাঁ-পাশে তারানা, সবশেষে ওয়াজেদ। ওর কোলের কাছে আবার একটা হরিণের বাচ্চা। আসার সময় ডোপার কাছ থেকে চেয়ে এনেছে। দুলুনি যখন বেড়ে যাচ্ছে, তারানার মনে হচ্ছে, ওর নাড়ি বেরিয়ে আসবে পেটের ভিতর থেকে। প্রাণপণে স্থির থাকতে চেষ্টা করছে, পারছে না। ফারুকের শরীরের ছোঁয়াটুকু এড়াতে চায় সে। এক বড় ঢেউয়ের দোলায় বনদেবী এমনভাবে দুলে উঠল যে ফারুকের মুখের ছোঁয়া লাগল ওর মুখে।

কাল রাতের ওই ছোট ঘটনাটুকু না ঘটলে আজ এই ছোঁয়া প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারত সে। ভাবতেই তারানার গা শিউরে উঠল। আড়চোখে ফারুকের মুখের দিকে তাকাল। মুখে কঠিন সঙ্কল্পের রেখা; ঠোঁটের ওপর শক্তভাবে চেপে বসেছে ঠোঁট। ওই ঠোঁটজোড়ার পরশ পেয়েছে তারানার ঠোঁট। অতলস্পর্শী, গভীর পরশ। আহা! সব যদি ফিরিয়ে নেয়া যেত! মানুষটাকে ভালভাবে না জেনে, বুঝে এমন একটা ভুল করে বসার জন্যে নিজের ওপর অদম্য রাগে জ্বলতে লাগল তারানা।

'কী হলো? কথাবার্তা নেই যে!'

চমকে ওঠে তারানা। অনেকক্ষণ পর ফারুক কথা বলল। ঢেউয়ের উচ্চতা কমেছে। বনদেবীর দুলুনিও কমেছে তার সঙ্গে। ফারুক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তারানাকে অস্বস্তিতে ফেলে দিল।

জোর করে হাসতে চেষ্টা করল তারানা। 'কী বলব?'

ফারুক আড়চোখে ওকে লক্ষ করল। তারানার মুখে ভাবান্তর ঘটল না। আবার বলল ফারুক, 'খারাপ লাগছে?'

'হুঁ।'

'বুঝেছি। সকালের নাশতাটা সুবিধের হয়নি। ডোপাটা এমন সিন ক্রিয়েট করল! বেচারির জন্যে দুঃখ হয়।'

'মেয়েটা খুব ভাল। নির্মল। অকপট,' গম্ভীর স্বরে তারানা বলল।

ফারুক নৌকার গতি বাড়াল। সান্ত্বনার সুরে বলল, 'সামনে একটা চর আছে। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই পৌঁছব সেখানে। রেস্ট নেব। দুপুরের খাওয়াটাও সেরে নেব। মুরাদ চমৎকার সব খাবার রান্না করেছে। ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে।'

তারানা মনে মনে বলল, 'সম্বোধনে আপনি-তুমি বাঁচিয়ে দারুণ অভিনয় করছ, আনোয়ার ফারুক। চালিয়ে যাও। যদি জানতে, আমি সব টের পেয়ে গেছি…'

দুপুর একটার দিকে বনদেবী ভিড়ানো হলো উত্তরের চরে। উনুন তৈরি করে ভাত রাঁধল মুরাদ। তরকারি গরম করল। নিঃশব্দে শেষ হলো খাওয়াদাওয়া। ফারুক তার ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে তারানার দিকে বাড়িয়ে ধরল প্লাস্টিকের কাপ। তারানা নির্বিকারভাবে চা খেলো, কিছু বলল না। কাপটা ধুয়ে রেখে লক্ষ্যহীনভাবে হাঁটতে লাগল। রিভলভার বার করে নেড়েচেড়ে দেখে নিল ফারুক, তারপর অনুসরণ করল তারানাকে।

একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারানা। শূন্য চোখে তাকিয়ে আছে সাগরের দিকে। কিন্তু সাগরের ঢেউ দেখছে না। ভাবনায় মগ্ন হয়ে আছে। পাথরের প্রতিমার মত দেখাচ্ছে ওকে। ফারুক ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'সন্ধে নাগাদ কাঙ্গা এলাকায় পৌঁছব আমরা।'

তারানা ফারুকের দিকে তাকাল। কিছু বলল না। ফারুক একটা গোলমালের আঁচ অনুমান করতে পারছে। খুঁজে বার করতে হবে, জটটা পাকাল কীভাবে।

'শুনলাম, তোমার টেলিভিশন নাটকের সিরিজ খুব হিট করেছে। জমজমাট রহস্য কাহিনী নিশ্চয়ই!'

'উঁহুঁ। একেবারে সাদামাঠা সামাজিক কাহিনী।'

'ব্যাপারটা বুঝলাম না। তাহলে হিট করল কিভাবে?'

'দর্শক যখন কোন নাটকে নিজেদেরকে দেখতে পায়, তখন সে আর জমজমাট রহস্য খুঁজতে যায় না। ওই নাটকই তার কাছে হয়ে ওঠে অপার রহস্য। যে-নাটকে দর্শকের মনের কথা যত সহজভাবে বলা যাবে, সে-নাটক জনপ্রিয় হবে তত বেশি। আমি যে-নাটকে অভিনয় করি, সেটা ওইরকম।'

'আমি অনেকদিন অজ পাড়াগাঁয় পড়ে আছি। ঢাকায় যাই না, এমনকি খুলনায়ও না।'

ফারুক কি বলতে চায়, তারানা বুঝতে পেরেছে। সে বলল, 'আমার নাটকের নাম "সব মানুষের পৃথিবী"। যুদ্ধ আর অশান্তির বদলে সারা দুনিয়ার মানুষের মধ্যে গভীর ভালবাসা, ঐক্য আর সহযোগিতার স্বপ্ন দেখানো হয়েছে এতে।'

'তোমার চরিত্রটা কেমন?'

'এক মানবদরদী নার্সের চরিত্রে অভিনয় করি আমি।'

নৌকার কাছে উঁচু কণ্ঠের শব্দ শোনা গেল।

তারানা বলল, চলো। ওরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

'এক মিনিট। কয়েকটা কৌতূহল আছে আমার। জানি, তুমি ডোপার প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে গেছ। তবু একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। সিরিজ নাটক থেকে ছুটি পেলে কীভাবে?'

'একটাই উপায়। নাট্যকার নার্সকে বোমা বিস্ফোরণে আহত করে দিলেন।

মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে পড়ে আছে সে। এভাবে চলবে দু'তিন এপিসোড। তারপর আমি যখন ঢাকায় ফিরে রামপুরার টেলিভিশন ভবনে রিপোর্ট করব, তখন সুস্থ হয়ে উঠবে নার্স। দর্শক হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন। এরই মধ্যে একটা পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে: তারানা হাশিম "সব মানুষের পৃথিবী" থেকে বিদায় নিয়েছে।'

ফারুক গম্ভীর মুখে বলল, 'একেবারে মিথ্যে বলেনি। এখন বিশেষ একজন মানুষের পৃথিবীতে বিচরণ করছে সে।'

তারানা চলে যাবার জন্যে পা বাড়াল। ফারুক ওর দুই কাঁধে হাত রেখে বলল, 'যেয়ো না, তারানা।'

তারানার ঠোঁট কেঁপে উঠল। 'ওরা···অপেক্ষা করছে।'

'আমাদের ফেলে যেতে পারবে না ওরা।'

'বলো, কি বলবে।'

'তোমার কী হয়েছে, না জানা পর্যন্ত রওনা হবার ইচ্ছে নেই আমার। যদি কাঙ্গা যেতেই চাও, দয়া করে বলো, কী হয়েছে।'

তারানা মুখ নিচু করল। ওর নাকের ছিদ্রগুলো কাঁপছে।

'তারানা, গতকাল আমরা প্রতিশ্রুতি বিনিময় করেছি। অথচ এখন মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে কখনও পরিচয়ও হয়নি তোমার।'

'কালকের তুমি আর আজকের তুমি এক ব্যক্তি নও। গভীর রাতে কামার ফরিদ সাহেবের সঙ্গে তোমার আলোচনা শুনেছি আমি।'

তারানার কাঁধ থেকে হাত নামাল ফারুক। 'ও! এই কথা? তার মানে আড়ি পেতেছিলে!'

'হ্যাঁ। কিন্তু তোমার নিশ্চয়ই অধিকার নেই সেজন্যে, আমাকে দায়ী করার! তোমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিলাম আমি।'

ফারুক একটু ভাবল। 'হ্যাঁ, সবই সত্যি। খুলেই বলি। জানার অধিকার আছে তোমার।'

'বলো।'

ফারুক বলল, 'প্রথম কথা হচ্ছে, আমি কিছুতেই কাঙ্গায় নিয়ে আসতে চাইনি তোমাকে। নিজের অসুবিধের কথা নয়। তোমার কথা ভেবেই আমি রাজি হইনি। তুমি যাতে আসতে না পারো তার জন্যে যা যা করার দরকার, করেছি। সম্ভাব্য গাইডদের নিষেধ করেছি তোমার অনুরোধে রাজি হতে। তোমার বাবা বোকামি করে প্রাণ দিয়েছেন। চাইনি, তুমি একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করো। "বিজনপুরের" ধারণাটাই ভুল! একটা কাল্পনিক ব্যাপারকে কেন্দ্র করে···'

তারানা বাধা দিয়ে বলল, 'তোমার কাছে বোকামি বা কাল্পনিক হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে ব্যাপারটা জীবন-মরণের প্রশ্ন। কলম্বাসের আমেরিকা অভিযান আর টমাস এডিসনের কলের গান আবিষ্কারের উদ্যোগও এক সময় অন্য দশজন মানুষের কাছে "পাগলামি" ছিল।'

'ঠিকই বলেছ। কিন্তু এ-ও ঠিক যে দুনিয়ার বেশির ভাগ মানুষের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে কোন না কোন অন্ধ বিশ্বাসের কারণে। সব বিশ্বাসের পেছনে কলম্বাস

আর এডিসনের যুক্তি নেই। কাঙ্গায় গিয়ে তুমি দুঃখ আর কষ্ট ছাড়া কিছুই পাবে না। তোমার উদ্দেশ্য মহৎ, তাতে একটুও সন্দেহ নেই আমার। তোমার আবেগকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার একান্ত ইচ্ছে, যদি এখান থেকে তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম!'

তারানা দুর্বোধ দৃষ্টিতে ফারুকের দিকে তাকিয়ে রইল।

ফারুক আবার বলল, 'প্রথমেই বলেছি, মংলায় তোমাকে দেখেই দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ বাঘের ডাক আর ডোপার ডেঁপোমি সে-দুর্বলতাকে এমন এক পরিণতির দিকে ঠেলে দিল যে আমি গোটা জীবনকেই ভাবতে শুরু করলাম নতুন করে। কখনও কারুর জন্যে এমন দায়িত্ব বোধ করিনি।' শেষের দিকে ফারুকের গলার স্বর ভারী হয়ে উঠল। 'চোখের সামনে তোমার কোন বড় ক্ষতি হলে কী করে সহ্য করব আমি?'

ভিতরে ভিতরে কেঁপে উঠল তারানা। কিন্তু প্রকাশ্যে অবিচল রইল।

ফারুক বলল, 'আমরা প্রেসিডেন্টের একটা বিশেষ হুকুম তামিল করছি। কঠিন এক দায়িত্ব দিয়ে আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন তিনি। একদল সন্ত্রাসবাদী গেরিলা কাঙ্গায় আশ্রয় নিয়েছে। ক্রমেই শক্তি সংহত করছে ওরা। থানা আর ফাঁড়ি লুট করছে। মূল্যবান বনসম্পদ পাচার করছে সমুদ্রপথে। কারেন্টের জালে মাছ ধরছে। অত্যাচার করছে নিরীহ দেশবাসীর ওপর। সবচেয়ে বড় আশঙ্কার কথা, মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বড় ধরনের আক্রমণের পরিকল্পনা করেছে ওরা।'

'কোথায়?'

'ঠিক বলা যায় না। হয়তো মংলা বন্দর তাদের লক্ষ্যস্থল। খুলনাও হতে পারে। নৌবাহিনীর একটা ফ্রিগেটে একবার হামলা চালিয়েছে ওরা কিছুদিন আগে।'

'কিন্তু একটা কথা। যারা নৌবাহিনীর ফ্রিগেটের ওপর হামলা চালানোর ক্ষমতা রাখে, নিশ্চয়ই বনদেবী আর দু' তিনজন সহকর্মীর সাহায্যে তাদেরকে ঘায়েল করার আশা কোরো না তুমি!'

ফারুকের মুখে হাসির রেখা। 'না, আমরা লড়াই করতে যাচ্ছি না ওদের সঙ্গে। আমাদের কাজ শুধু খবর সংগ্রহ করা। কোন্ পথে, কিভাবে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র ওদের কাছে আসছে, ওরা কোথায় রাখছে এসব অস্ত্র, কারা ওদের সাহায্য করছে এসব খবর সংগ্রহ করতে হবে আমাকে। প্রয়োজনে ছদ্মবেশে ঘুরতে হবে, মানুষ খুন করতে হবে। কাজটা কতখানি জটিল আর দুরূহ হবে, বুঝতে পারছ কিনা জানি না। ফরিদের ধারণা, এবার তুমি সঙ্গে থাকাতে আমাদের কাজটা সহজ হবে। তোমাকে একটা উপলক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতে চায় সে। তার ধারণা, এতে প্রতিপক্ষ আমাদের সন্দেহ করবে না। তা ছাড়া তোমার মত···ইয়ে···পরমাসুন্দরী তরুণীর প্রতি নজর রাখতে গিয়ে ওরা আমাদের গতিবিধির ওপর সবসময় শ্যেন দৃষ্টি রাখতেও ব্যর্থ হবে। সবচেয়ে বড় কথা, একই কাজে এসে মহামান্য প্রেসিডেন্টের দুটো আদেশ পালন করতে পারাটা কম কথা নয়। ফরিদের সুদূর প্রসারী লক্ষ্য আছে। প্রেসিডেন্টকে সে অখুশি করতে চায় না।'

অনেকক্ষণ নীরবে সাগরের ঢেউ দেখল তারানা। তারপর বলল, 'আমার বাবাকে নিয়ে যে কথাটা বলছিলেন ফরিদ সাহেব···'

ওকে শেষ করতে না দিয়ে ফারুক বলল, 'এটাও ফরিদের ধারণা। এমনও হতে পারে, ড. আবুল হাশিম সন্ত্রাসবাদীদের কোন গোপন জিনিস দেখে ফেলেছিলেন কিংবা কোন ডকুমেন্ট তার হস্তগত হয়েছিল, যা ওদের জন্যে বিপজ্জনক হতে পারে। ফলে প্রাণ হারাতে হয়েছে তাঁকে।'

'তুমি তা মনে করো না?'

'আমি কোন কিছুই কল্পনা করতে পছন্দ করি না। কাজে যখন যাচ্ছি, তখন কাজেই বুঝতে এবং প্রমাণ সংগ্রহ করতে চেষ্টা করব।'

তারানার মুখে হাসি ফুটল। 'এসব কথা আমাকে আগে বললে ক্ষতি কী ছিল, শুনি!'

ফারুকও হাসল। 'গোপনীয়তার নিয়ম এই, তারানা। প্রয়োজন না হলে ভাঙতে নেই। এক সময় অবশ্য আমার নিজের প্রয়োজনেই সব তোমাকে জানাতাম। তোমার ঠকবার ভয় ছিল না।'

'তোমাকে মন দিয়েই তো ঠকেছি!'

ফারুক জড়িয়ে ধরল তারানাকে। 'এখনই নৌকা ছাড়বে। আরও একটু ঠকতে আপত্তি আছে?'

তারানা চোখ বুজল। ফারুকের তপ্ত নিঃশ্বাসে পুড়ে যাচ্ছে ওর মুখের কোমল ত্বক।

দশ

বনদেবীর কাছে ফিরে এসে ওরা দেখল, মুজিবর পায়ের ওপর পা তুলে বসে সিগারেট টানছে। গেওয়া গাছের নিচে বসে গামছা পেতে মুরাদ আর মতি পাশা খেলছে। খায়ের রেফারী।

ফারুক আর তারানাকে ফিরে আসতে দেখেও ওরা যে-যার কাজে ব্যস্ত রইল। শুধু মুজিবর সিগারেটটা পানিতে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসল। কিন্তু নৌকায় ওঠার লক্ষণ দেখা গেল না।

'কী ব্যাপার, মুজিবর? উত্তরের চর তোমাদের মনে ধরেছে মনে হয়!'

মুজিবর গোমড়া মুখে বলল, 'না ধরে উপায় কী? বেলা পড়ে এসেছে। এখুনি ভাটার টান লাগবে। এমন সময় কাঙ্গার মোহনা পার হওয়া কি সোজা কথা? জায়গাটাও যে ভাল না, সে তো আপনি জানেন!'

ফারুকের টনক নড়ল। সত্যিই, সমস্যাটার কথা সে বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। নারীর মানভঞ্জন করতে গিয়ে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। এটা কাঙ্গার জন্যে তুলে রাখলেও হত। এখানে দেরি না হলে সন্ধের আগেই কাঙ্গায় পৌঁছে যেত ওরা। কিন্তু এখন অনুশোচনা করে লাভ নেই।

তাঁবু খাটানোর কাজ শুরু হলো। মুরাদ তার নিবে-যাওয়া উনুনে আবার আগুন ধরাতে বসল। ফারুক রিভলভার হাতে দোলাতে দোলাতে আশেপাশের জায়গাগুলো পরীক্ষা করতে বেরুল। ওয়াজেদ এসে বসল তারানার পাশে।

'কিছু বলবে, ওয়াজেদ?'

ওয়াজেদ কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'ইয়ে···একটা কথা···'

'অসঙ্কোচে বলো।'

ওয়াজেদ গলার স্বর নিচু করে বলল, 'আপনি কিছু কিছু বুঝতে পারছেন?'

চমকে উঠল তারানা। ওয়াজেদের চোখেও সে-চমক ধরা পড়ল। 'কী বুঝতে পারার কথা বলছ? কী হয়েছে?'

'আস্তে কথা বলুন, আপা। জঙ্গলের গাছের প্রত্যেক পাতার কান আছে। আপনার ওপর কিন্তু বিপদ আসছে!'

তারানার জীবনে অনেক বিপদ এসেছে। এই ট্রিপেও একবার চরম বিপদের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সে। কিন্তু ওয়াজেদের এই নিচু স্বরের সাবধানবাণী ওর বুক কাঁপিয়ে দিল।

'এসব কী বলছ তুমি!'

'আপা, আপনি বুদ্ধিমতী। আপনাকে বেশি কথা বলার দরকার নেই। চোখ-কান খোলা রাখবেন। আমাদের মধ্যেই একজন আপনার চরম ক্ষতি করতে চায়। তবে ভয় নেই, সে বাদে অন্য সবাই আপনাকে সাহায্য করবে।'

তারানা উত্তেজনার বশে ওয়াজেদের হাতের কবজি আঁকড়ে ধরল শক্ত হাতে। 'তুমি কোত্থেকে কী শুনেছ, আমাকে বলো। ওয়াজেদ, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের মত। প্লীজ, কী জেনেছ, বলো।'

ওয়াজেদ সাবধানে চারদিকে তাকাল। না, কেউ লক্ষ করছে না।

ফিসফিস করে বলল সে, 'শত্রু আপনাকে কাঙ্গায় যেতে দিতে চায় না।'

'কে সেই শত্রু?'

অসহিষ্ণু গলায় ওয়াজেদ বলল, 'ধরুন, আমিই।'

তারানা কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল। 'ওয়াজেদ, আরও একটু পরিষ্কার করে বলো। আমাকে কষ্ট দিয়ে কী লাভ তোমার?'

'আপা, আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই। কিন্তু এই মুহূর্তে এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে পারছি না। আমাকে মাফ করুন।'

তারানা বিস্ফারিত চোখে সাগরের অবিরাম ঢেউয়ের দিকে চেয়ে রইল। ওয়াজেদ বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমি নিজেও জানি না কে সেই শত্রু। শুধু এটুকু জানি, কাঙ্গায় গিয়ে আপনাকে খুব সাবধানে থাকতে হবে। এখন থেকেই সাবধান হওয়া ভাল। আমি সবসময় আপনাকে চোখে চোখে রাখছি। এরই মধ্যে একবার সুযোগ নিতে চেষ্টা করেছে আপনার শত্রু। সুবিধে করতে পারেনি।'

গোটা পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যে বিষাক্ত হয়ে উঠল। দলের ভিতরে একজন শত্রু আছে! সে তাকে কাঙ্গায় যেতে দিতে চায় না। কে সে? মুজিবর? উনুনের সামনে বসে এক মনে কাজ করছে মুরাদ। কী ভাবছে? তারানার 'চরম ক্ষতি' করার কথা?

তারানা উঠে পায়চারি করতে লাগল। মতির দিকে তাকাল। লক্ষ করল খায়েরকে। এদের কেউ একজন তার শত্রু!

এক সময় শিউরে উঠে তারানা আবিষ্কার করল, ফারুককেও সন্দেহের তালিকায় ফেলেছে সে। জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা জন্মে গেল হঠাৎ। ওর বাদল দিনের প্রথম কদম ফুলের মত যার আগমন, তাকেও শত্রু ভাবতে হচ্ছে! ওয়াজেদ এ কি

সর্বনাশা খবর দিল!

কখন সূর্য ডুবে গেছে পশ্চিমের সাগরতীরে, কখন নিস্তব্ধ অন্ধকারে রূপান্তরিত হয়েছে বনের ছায়া, তারানা জানে না। ফারুক 'রেকি'র' কাজে বেরিয়েছে অনেকক্ষণ। এখনও ফিরছে না। কোথায় গেল সে? কী করছে? তারানার কান্না পাচ্ছে। ওয়াজেদ ছেলেমানুষ। শক্তি, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, সবই কম। ওর ওপর কতটুকু ভরসা করা যায়?

তাঁবুর ভিতরে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইল তারানা। মাথা ঠিক রাখতে হবে। ওয়াজেদ ঠিকই বলেছে। চোখ-কান খোলা রাখা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই এখন। শত্রু যদি হামলা করেই, প্রতিরোধের চেষ্টা করতে হবে।

ব্যাগ থেকে দেশলাই বের করে মোমবাতি জ্বালিয়ে ঋজু শিখার দিকে তাকিয়ে রইল সে। ঠিক ওই শিখার মত অকম্পিতভাবে সব দুঃখ-কষ্টকে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বাবা প্রায়ই বলতেন কথাটা।

এমন সময় বজ্রপাতের মতই প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল সমস্ত চরাচর। বাঘের গর্জন। আজ সত্যিই খুব কাছে এসে পড়েছে বাঘ। আজ আর বিভ্রম নয়, সন্দেহেরও কোন অবকাশ নেই।

এক সভ্য সমাজের শত্রুর ভাবনায় এত বিভোর হয়ে ছিল যে, জঙ্গলের চিরশত্রুটির কথা তারানার মনে উঁকি দেয়নি। দুই শত্রুর অস্তিত্বের কথা জানতে পেরেছে তারানা। একটা নিঃশব্দে, অন্যটা সশব্দে এগিয়ে আসছে।

আবার ডেকে উঠল রয়েল বেঙ্গল টাইগার।

রান্না ফেলে বন্দুক নিয়ে এগিয়ে গেল মুরাদ। দূর থেকে ফারুকের গলা শোনা গেল। চিৎকার করে মুরাদকে আবশ্যকীয় নির্দেশ দিল সে। মুরাদ সাবধান করে দিল মতি আর খায়েরকে। তারানাকে সান্ত্বনা দিল। 'ভয় পাবেন না, মেমসাহেব আমরা আছি।'

রয়েল বেঙ্গল টাইগারের গর্জনের সঙ্গে একটা ছোট জান্তব আর্তনাদের শব্দ শোনা গেল। ঠিক কত দূরে হলো শব্দটা, বোঝা গেল না। মট করে কারও ঘাড় ভাঙল বাঘটা। কার? তারানা কেঁদে ফেলল। ফারুকের নয় তো? প্রেমিকের ছদ্মবেশে সে যদি আততায়ীও হয়ে থাকে, তারানার কিছু করার নেই। মানুষ অনেক সময় জেনেশুনে আগুনে ঝাঁপ দেয়। ওর অবস্থা এখন ঠিক আগুনে ঝাঁপ দেবার মতই। কিন্তু ফারুক আসছে না কেন? ওয়াজেদই বা কোথায়?

তাঁবুর দরজায় ওয়াজেদের মুখ দেখা গেল। ফিসফিস করে বলল সে, 'আপা, আমার পেছন পেছন আসুন।'

নিজে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে তারানা। বুঝতে পারল, এমন অবস্থায় কারও ওপর নির্ভর করাই ভাল। সম্মোহিতের মত ওয়াজেদকে অনুসরণ করল সে।

ওয়াজেদ পকেট থেকে একটা রিভলভার বের করল। ওর ওপর আস্থা বেড়ে গেল তারানার। 'তোমার কাছেও অস্ত্র আছে, জানতাম না।'

ওয়াজেদের মুখে লজ্জা-মাখানো হাসি। 'সবার কাছেই গোপনে অস্ত্র থাকে, আপা। না থাকলে চলে না।'

সমতল জায়গাটা ছাড়িয়ে সরু পথে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়ল ওরা। তারানার গা ছমছম করতে লাগল। বুঝতে পারল, সাহস হারিয়েছে ও।

'ওয়াজেদ—' নিচু স্বরে ডাকল তারানা।

ওয়াজেদ পিছু ফিরে তাকাল। 'জি, আপা।'

'ফারুক সাহেবকে ডাকলে হয় না?'

'কীভাবে ডাকবেন? চিৎকার করলেই বিপদ! বাঘ আমাদের অবস্থান জেনে ফেলবে। দেখছেন না, কেউ কথা বলছে না!'

'কিন্তু ওরা গুলি করছে না কেন, ওয়াজেদ?'

ওয়াজেদ শুধু হাসল। হাসিটা অর্থপূর্ণ। 'তাড়াতাড়ি চলুন, আপা। কাছেই গুণীনের নিরাপদ আশ্রয় আছে। গুণীন যেখানে থাকে, সেখানে বাঘ আসতে পারে না।'

তারানা হোঁচট খেলো। প্রায় পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে। ওয়াজেদ ওর হাত আঁকড়ে ধরে সামাল দিল। তারানা ছাড়িয়ে নিল হাতটা। 'দরকার নেই, ওয়াজেদ। জঙ্গলে হাঁটার অভ্যেস আছে আমার।'

কিসে হোঁচট খেলো, দেখতে গিয়ে এক অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করল তারানা। একটা খুঁটা। তার সঙ্গে দড়ি বাঁধা আছে। নিঃশব্দে দড়িটা পরীক্ষা করল তারানা। এখানে মানুষ বাস করে না। খুঁটাদড়ি এল কোত্থেকে? সেই সময় কয়েকটা প্রশ্ন তারানার মনে উদয় হলো।

হরিণের বাচ্চাটা কোথায় গেল?

বাঘটা কি হরিণের বাচ্চার লোভেই হামলা করেছে?

তার মানে ব্যাপারটা সাজানো ছিল?

একের পর এক নতুন প্রশ্ন উঠে আসছে। বুঝতে পারল, বিশ্রী ভুল করে ফেলেছে সে। সবাইকে সন্দেহের তালিকায় ফেললেও সে ওয়াজেদকে সন্দেহ করেনি। এটা ভুল নয়?

এরপর স্বাভাবিকভাবেই ওর মনে হলো, কোথায় যাচ্ছে সে ওয়াজেদের সঙ্গে?

ষষ্ঠ প্রশ্ন: এখন কী করা উচিত?

ওয়াজেদকে প্রশ্ন করতে পারে, হাতে রিভলভার থাকা সত্ত্বেও সে উত্তরের চরে থাকতে চায় না কেন? তার ধারণা অনুসারে, দলের মাত্র একজন তারানার শত্রু। তাহলে বাকি সবাইকে এভাবে ছেড়ে যাবার কী মানে হয়? কিন্তু কোন প্রশ্নের সদুত্তর মিলবে কি?

তারানার কাছে পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেছে সবকিছু। ওয়াজেদের হাতে অস্ত্র। অস্ত্রের ভাষায় উত্তর দেবে সে। আর নয়, সিদ্ধান্ত নিল তারানা, পালাতে হবে ওয়াজেদের খপ্পর থেকে। ইতিমধ্যেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

নিঃশব্দে পথ ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল তারানা। ওয়াজেদের কাছে টর্চ আছে? থাক আর না-ই থাক, নিশ্চিত মরণের আগে বাঁচার জন্যে একটা ঝুঁকি নেয়া ভাল।

পালাতে হবে। এখন সব বোঝা যাচ্ছে। দলে অন্য কোন শত্রু নেই। মিছেমিছি অন্যদের সন্দেহ করেছে ও। একবার মনে হলো, সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার

করে ওঠে, ডাক দেয় সঙ্গীদের। সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনাটা বাতিল করে দিল তারানা। ছেলেটা সশস্ত্র। তার চেয়ে বরং তাকে বিভ্রান্ত করে সময় নেয়াই ভাল।

দ্রুত একটা গাছে উঠে পড়ল তারানা। পাতার শব্দ এড়াতে গিয়ে রুক্ষ বাকলের ঘষা লাগল ওর কাঁধে। ছিঁড়ে গেছে কাঁধ। দাঁতে দাঁত চেপে যন্ত্রণা সহ্য করল তারানা। নিঃশব্দে উঠে পড়ল মগডালের সবচেয়ে কাছের শক্ত ডালে। পাতার সঙ্গে গুটিয়ে ফেলল ওর ছোটখাট শরীর।

ক্যাম্পের দিক থেকে টিন আর তেলের খালি ড্রাম পেটানোর শব্দ আসছে। গুলি না করে ওরা কেন এমন অদ্ভুত কাজ করছে, তারানা ভেবে পায় না।

এবার ওয়াজেদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতে পারে তারানা। এমনও তো হতে পারে, আগাগোড়া সবই ভুল ধারণা করেছে ও। সেক্ষেত্রে ওয়াজেদ এখানেই থাকবে। পালাবে না। খুঁজে বার করবে অন্য সঙ্গীদের। তাদের জানাবে ঘটনাটা। সবাই মিলে তারানাকে খুঁজতে চেষ্টা করবে। নিজের ভূমিকাও স্থির করে ফেলেছে তারানা। বলবে, ভয়ে দিশেহারা হয়ে এই কাজ করেছে সে।

কিন্তু মিনিটখানেক পরেই তারানা বুঝল, কোন ভুল হয়নি। ওয়াজেদ ফিরে আসছে। অতিরিক্ত টেনশন আর নিজের পায়ের শব্দের মধ্যে তারানার পালিয়ে যাবার ব্যাপারটা লক্ষ করতে বেশ দেরি হয়েছে। তার মাথায় বাজ পড়েছে। পাগলের মত চারদিকে নজর বুলাতে বুলাতে হাঁটছে সে। দুরভিসন্ধি না থাকলে সে তার নাম ধরে ডাকত। তারানা মিশে রইল গাছের পাতার সঙ্গে। নড়াচড়া করল না।

দূরে চিৎকার শোনা গেল। একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে ফারুক, মুজিবর, মুরাদ, মতি আর খায়ের। কিন্তু গুলির শব্দ শোনা গেল না। বাঘের সাড়াও আর নেই। ওদের কণ্ঠস্বর ক্রমেই এগিয়ে আসছে। ফারুক ঢালাওভাবে দোষারোপ করছে ওদের সবাইকে। সঙ্গীরা সবাই দোষ চাপাচ্ছে অপরের ঘাড়ে। এখন ওদের সবার অভিন্ন শত্রু ওয়াজেদ।

ওদের কথোপকথন থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট হলো। ওয়াজেদ পরিকল্পনাটা করেছে অনেক আগেই। সবাইকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে। অবশ্য শিগগিরই ধরা পড়তে হবে তাকে। পথ তো মোটে দুটো! চরের দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। পশ্চিমে নদী। পুবদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলে গেছে পথ—হরিণঘাটার চর পর্যন্ত। উত্তরে মাইল দু'য়েক দূরে গ্রাম। নদীর ভাঙনে সর্বস্বান্ত কিছু মানুষ বাঘ আর বুনো শুয়োরের হামলার মধ্যে বসতি গড়েছে সেখানে। দু'দলে ভাগ হয়ে এই দু'দিকের পথ ধরেছে ওরা। উত্তরের পথে এগিয়ে আসছে ফারুক আর মতি। মুজিবর, খায়ের আর মুরাদ রওনা হয়েছে হরিণঘাটার চরের দিকে।

এক ডালের ওপর শরীরের ভর রেখে অন্য ডাল আঁকড়ে আধশোয়া অবস্থায় নিচের দিকে তাকিয়ে রইল তারানা। গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। ভাল করে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রতিটি সেকেণ্ড কাটছে চরম উৎকণ্ঠায়। ওয়াজেদকে আর দেখতে পাচ্ছে না সে। কোথায় লুকাল? তারানাকে দেখতে পেয়েছে কি?

হঠাৎ সামনের গাছের নিচে ঝোপ নড়ে উঠল। তারানা এমন চমকাল যে মুঠো আলগা হয়ে গেল। আর একটু হলেই পড়ত নিচে। বাঘ আর ওয়াজেদ—এই দুই

শত্রুর কথা ভাবতে ভাবতে তারানা আবিষ্কার করল, তৃতীয় শত্রু হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ। এই মুহূর্তে সেটা ওর সঙ্গে চরম শত্রুতা করতে পারে। প্রাণপণে চীনা সার্কাসের মেয়েদের কথা ভেবে শক্তি অর্জনের চেষ্টা করল তারানা। ওরা দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটে, ছাতা হাতে দুলিয়ে নাচে, নানা রকমের অঙ্গভঙ্গি করে। সে এই শক্ত ডালে কিছুক্ষণ বসে থাকতে পারবে না? পারতেই হবে। ডালগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করল সে। বেশ শক্ত। চট করে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

আবার নড়ে উঠল ঝোপ। তারপর পরিষ্কার ভাবে ওয়াজেদকে দেখতে পেল তারানা। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে ওয়াজেদ। রিভলভার তাক করে আছে পথের দিকে। তারানাকে খুঁজে পাবার আশা বাদ দিয়েছে সে। এখন অপেক্ষা করছে ফারুক আর তার সঙ্গীদের জন্যে।

নিজের ওপর রাগ হলো তারানার। এত দেশ ঘুরে, এত বিদ্যে অর্জন করে তার এই পরিণতি! মানুষ চিনতে পারল না আজও! ভাবতেই পারেনি, সদাহাস্যময় ওই কিশোর আসলে অপরাধী চক্রের উপযুক্ত ট্রেনিং-পাওয়া সদস্য হতে পারে। তোষামোদ জিনিসটা কখনোই ভাল নয়। জেনেশুনেও লোকে অন্যের তোষামোদে গলে যায়। ছেলেটার অতিরিক্ত তোষামোদের কথা তারানার মনে পড়ল। উদ্যত রিভলভার হাতে সে এখন খুঁজে বেড়াচ্ছে তারানাকে। ওত পেতে বসে আছে ফারুকের জন্যে। ফারুক এসে পড়েছে! আর কয়েক গজ এগিয়ে এলেই গুপ্ত ঘাতকের আচমকা হামলার মুখোমুখি হবে সে। তারানা সবই দেখতে পাচ্ছে, বুঝতে পারছে। কিন্তু কিছুই করতে পারে না!

না, পারে। তারানা দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল। একটা কিছু করতেই হবে ওকে। ওর কারণে ফারুক বেঘোরে মারা পড়বে, এটা হতে পারে না। হয়তো ফারুক একাই নয়, মতিও মরবে ওর সঙ্গে। ওয়াজেদের পরিকল্পনা বুঝতে তারানার কোন অসুবিধে হচ্ছে না। ফারুক আর মতিকে ঘায়েল করে এলাকাটায় কম্বিং অপারেশন চালাবে সে। খুঁজে বার করবে তারানাকে। জানে, তারানা এখানেই আছে, দূরে কোথাও যায়নি। তার পরের কথা তারানা ভাবতে পারছে না। তার আগেই একটা কিছু করতে হবে। জীবনের ঝুঁকি নেবে সে। ওর প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা ফিফটি ফিফটি। অন্যদিকে ফারুক আর মতি বেঁচে যাবে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে। অন্তত লড়াই করে মরার সুযোগটুকু ওদেরকে দিতে হবে।

এগিয়ে আসছে ওরা; ফারুক সামনে, মতি পেছনে। তারানার হৃদস্পন্দনের গতি তীব্র হয়ে উঠল। পেটের ভিতরে অদ্ভুত এক শূন্য অনুভূতি।

'ফারুক! থামো! এক পা-ও এগিও না,' এক সেকেণ্ডের মধ্যে কথাগুলো বলল তারানা। তীব্র, তীক্ষ্ণ শব্দে বনের নিস্তব্ধতা খানখান হয়ে গেল। প্রতিধ্বনি জাগল গাছে গাছে, পাতায় পাতায়। 'সামনে বাঁ-দিকের ঝোপে···ওয়াজেদ···খুন করবে···'

কথা শেষ করতে পারল না তারানা। তার তীক্ষ্ণ স্বর ছাপিয়ে গুলির শব্দ হলো। ঠিক এ-ই ভেবেছিল তারানা! ওয়াজেদ তার অবস্থান টের পেয়ে যাবে। গুলি চালাবে।

তারানার উরুর ইঞ্চি খানেক দূরের পাতা ফুঁড়ে ওপরের ডালে বিঁধল গুলি। ছেলেটার হাতের টিপের প্রশংসা করতে হয়। তারানাকে দেখতে পাচ্ছে না, শুধু

শব্দ শুনে অনুমানের ওপর গুলি করেছে সে।

আবার গুলির শব্দ হলো। এবার তারানার ডান কাঁধের পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল তপ্ত সীসে। তারানা তার উত্তাপ টের পেল। সে ভেবে পেল না, ফারুক গুলি করছে না কেন! ওর হাতের রিভলভারই বা কোথায়? একটা বড় লাঠি নিয়ে ছুটছে সে ঝোপের দিকে। মতিকে দেখতে পাচ্ছে না তারানা। সে গেল কোথায়?

তৃতীয় গুলির লক্ষ্য ফারুক। তার আগেই মাটিতে শুয়ে পড়েছে সে। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়েছে ঠিক তারানার গাছের নিচে, ঝোপের ভিতরে। অস্ত্রের মুখে নিরস্ত্র মানুষের অসহায়তা দেখে কান্না পেল তারানার। একটু আগে গুলি ছাড়াই বাঘের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছে ওরা। কিন্তু এখন বাঘের চেয়েও হিংস্র পশুর মুখোমুখি হয়ে মৃত্যুর প্রহর গুণছে। উঁকি দিয়ে ফারুকের অবস্থান দেখার চেষ্টা করল তারানা। ফারুক সরে যাচ্ছে সেখান থেকে। কী ভাবছে ও, তারানা ভেবে পেল না।

তারানা এবার ওয়াজেদকে আরও ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে। আবার রিভলভার তাক করেছে ওয়াজেদ। ফারুকের অবস্থান অনুমান করতে পেরেছে সে। গুলিটা ঠিকমত গেলে ফারুকের মাথা দু'ফাঁক হয়ে যাবে। তারানা শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে একটা ডাল ভেঙে ফেলল। সেটা ছুঁড়ে দিল ওয়াজেদের মুখ বরাবর। একই সময়ে গুলির শব্দ হলো। স্বাভাবিক ভাবেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো চতুর্থ গুলি।

ফারুক ওয়াজেদের অনেকখানি কাছে এগিয়ে এসেছে। অবস্থানটা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, সন্দেহ নেই। কিন্তু এর ভাল দিকও আছে। একটু সুযোগ পেলেই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে সে।

ওয়াজেদ আবার রিভলভারের নল উঁচু করল। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ে তারানাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। ট্রিগারে তার আঙুলের চাপ পড়তেই ফারুক হাতের লাঠিটা ছুঁড়ল ওয়াজেদের হাত লক্ষ্য করে। আবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো গুলি।

কিন্তু ফারুকের অবস্থান বুঝে ফেলেছে ওয়াজেদ। শেষ গুলিটা সে কাজে লাগাতে চায়। প্রতিপক্ষকে আর সময় দিতে চায় না। এক হাতের ওপর ভরসা না করে দু'হাতে রিভলভার বাগিয়ে ধরে একটু একটু করে তারানার গাছের দিকে এগিয়ে এল ওয়াজেদ।

তারানা বুক ভরে শ্বাস নিল। গাছে চড়ে বসে থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। ওয়াজেদ যদি রিভলভার তার দিকে তাক করে, ফারুক সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অত ঝুঁকি নেবে না ওয়াজেদ। তার চেয়ে ফারুককে খুন করে খালি হাতে তারানাকে কাবু করার চেষ্টায় নামবে সে, এটাই স্বাভাবিক। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দশ ফুট নিচে নেমে এল তারানা। ওয়াজেদ ওর গতিবিধি লক্ষ করার সুযোগ পাচ্ছে না। শ্যেন দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে ফারুকের ওপর।

সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল তারানা। সবচেয়ে নিচু ডাল থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওয়াজেদের ওপর। ওর এক পা ওয়াজেদের বুকে, অন্য পা শূন্যে। ভারসাম্য হারিয়ে দু'জনেই ছিটকে পড়ল মাটিতে।

ফারুক ছুটে এল ওয়াজেদের দিকে। কিন্তু ততক্ষণে সামলে নিয়েছে

ওয়াজেদ। মাটি থেকে রিভলভার কুড়িয়ে নিয়েছে ক্ষিপ্র গতিতে। ফারুক ওর লাঠিটা কুড়িয়ে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু তারানার পায়ের ধাক্কায় কোথায় ছিটকে পড়ল সেটা, কে জানে! অন্ধকারে সেটা খুঁজে পাবার আশা ছেড়ে দিয়ে ফারুক আবার শত্রুর মুখোমুখি হলো। তারানা বিশ ফুট দূরে থেকেও তার শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। নার্ভাস হয়ে পড়েছে ফারুক।

এবার পরিস্থিতি ওয়াজেদের পক্ষে। ফারুক তার কাছ থেকে মাত্র দশ ফুট ব্যবধানে দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছে। ওয়াজেদ আবার দু'হাতে রিভলভার বাগিয়ে তার বুক বরাবর তাক করল।

তারানা উঠে দাঁড়িয়েছে। মস্ত ঝুঁকি নিয়ে, আঘাত সহ্য করেও ফারুককে বাঁচাতে পারছে না ভেবে হতাশায় ভেঙে পড়ল। আত্মরক্ষার আশা ক্রমেই ম্লান হয়ে আসছে। প্রবল শক্তিতে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে দু'হাতে চোখ ঢাকল তারানা।

গুলির শব্দের অপেক্ষায় ছিল সে। তার বদলে এক প্রচণ্ড 'ধপাস' শব্দ শুনে চোখ মেলল। আর্তনাদ করে শূন্যে লাফিয়ে উঠল ওয়াজেদ। তারপর সাপের মত এঁকেবেঁকে মোচড় খেলো তার শরীর। জ্ঞান হারাল সে। পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মতি, হাতে গদার মত একটা লাঠি। সুযোগমত কোদাল দিয়ে মাটি কোপানোর ভঙ্গিতে লাঠিটা ওয়াজেদের কাঁধে বসিয়েছে সে। শব্দটা তারই।

রিভলভারটা তুলে নিল ফারুক। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'একটা গুলি এখনও আছে।'

মতি ওয়াজেদের অচেতন দেহ উল্টেপাল্টে তার কাপড়ের পকেটগুলো হাতড়াল। প্যান্টের পকেট থেকে পাওয়া গেল একটা পুঁটলি।

ফারুক বলল, 'গুলিগুলো পাওয়া গেছে?'

মতি বলল, 'হ্যাঁ, স্যার।'

তারানা অবাক। 'গুলিগুলো মানে?'

ফারুক বলল, 'আমাদের রিভলভার, বন্দুক, সব খালি করে রেখেছিল হারামিটা। অনেক আগে থেকেই ফন্দি আঁটছিল। আমরা বোকার হদ্দ, কিছুই বুঝতে পারিনি।'

ক্যাম্পে ফিরে এল ফারুক আর তারানা। ফারুক জড়িয়ে ধরে রইল তারানার কোমর; তারানা দু'হাতে প্রায় ঝুলে রইল ফারুকের শরীরের সঙ্গে। ফার্স্ট এইড বক্স বের করে তারানার শরীরের ছিঁড়ে-যাওয়া অংশগুলো ডেটল দিয়ে পরিষ্কার করল। একটা অ্যান্টি-টিটেনাস ইনজেকশন দিল ওর বাহুতে।

তারানা ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে আছে ফারুকের দিকে। এই বুঝি ধমকের সুরে বলে ওঠে সে আগের সাবধানবাণীগুলোর কথা। কিন্তু ফারুক কিছুই বলল না। কষ্ট বাড়ল তারানার। মানুষের চোখের নীরব ভাষাই অনেক সময় তার কথার চেয়ে বড়।

তারানা ভয়ে ভয়ে বলল, 'বাঘ তাড়ালে কীভাবে?'

ফারুক বলল, 'খালি টিন আর ড্রাম পিটিয়ে। স্থানীয় কৌশল।'

তারানা ফারুকের গলা জড়িয়ে ধরল। ফারুক বলল, 'অনেক খাটিয়েছ।

পারিশ্রমিক দাও।'

তারানা ঠোঁট এগিয়ে দিল। ফারুকের ঠোঁটের শক্ত পেশির নিচে পিষ্ট হলো তার ঠোঁট। বাইরে খসখস শব্দ শুনে বিচ্ছিন্ন হলো ওরা। মতি ফিরে এসেছে। পা ধরে টানতে টানতে নিয়ে এসেছে ওয়াজেদের অচেতন শরীর। বারবার একই কথা আওড়াচ্ছে স্বল্পবাক মতি, 'ঘরের শত্রু বিভীষণ!'

বড় ক্যাম্পে তোলা হলো ওয়াজেদকে। মাথায় পানি ঢালা হলো। আধঘণ্টা পর তার জ্ঞান ফিরে এল। ফারুক রিভলভারের নল ধরল তার কপাল বরাবর। 'গুলি শেষ পর্যন্ত কার কপালে আছে, বুঝতে পারছ, ছোকরা?'

ওয়াজেদ রক্তশূন্য মুখে একবার রিভলভারের নল আর একবার ফারুকের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

'এবার ঝটপট সত্যি কথাটা বলে ফেলো, ওয়াজেদ,' রুক্ষ স্বরে বলল ফারুক।

ওয়াজেদ জিভ বের করে ঠোঁট চাটার ব্যর্থ চেষ্টা করে। ফারুক মতির দিকে তাকাল।

'মতি, ওকে এক গ্লাস পানি দাও।'

পানি খেয়ে দুর্বল হাতে মুখ ধোয়ার চেষ্টা করল ওয়াজেদ। ফারুক ধমকে উঠল। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

কাঁদো কাঁদো মুখে ওয়াজেদ বলল, 'আমার···আমার কোন দোষ নেই, স্যার। সাজেদ যা বলেছে, তা-ই করেছি।'

'সব কথা খুলে বলো। কে তোমাদের লাগিয়েছে আমাদের সঙ্গে বেঈমানি করতে?'

'আমি জানি না, স্যার, আমি জানি না।'

ওয়াজেদের পেটে লাথি ছুঁড়ল ফারুক। 'এখনও সময় আছে। কথা বলো।'

'আমি সত্যিই আর কিছু জানি না। সাজেদ শুধু আমাকে বলেছে তারানা হাশিমকে যেভাবেই হোক দল থেকে সরাতে।'

'কেন?'

'আমি জানি না।'

আবার লাথি খেলো ওয়াজেদ। যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল।

'না জেনে সাজেদের কথায় রাজি হলে কেন?'

ওয়াজেদ মাথা নিচু করে রইল। ফারুক রিভলভারের ট্রিগারে আঙুলের চাপ দিল। ওয়াজেদ হাউমাউ করে ওঠে।

'প্রাণভিক্ষে দিন, স্যার। এবারের মত মাফ করে দিন আমাকে। জীবনে আর এ-কাজ করব না।'

'শুধু শুধু কেউ কাউকে কিছু দেয় না। বিনিময় চাই। বলো, কেন এ-কাজ করতে গিয়েছিলে? কেন আমাদের নিরস্ত্র অবস্থায় বাঘের মুখে ছেড়ে দিলে? কেন এই ভদ্রমহিলাকে বিভ্রান্ত করে নিয়ে যাচ্ছিলে মেরে ফেলতে?'

'স্যার, বিশ্বাস করুন, আমি কিছু জানি না। না জেনেও হুকুম তামিল করতে হয়েছে। সাজেদের কাছে আমি ঋণী। এফএণ্ডএফ লিমিটেডের চাকরিটাও ও-ই

জোগাড় করে দিয়েছে। আমার কোন উপায় ছিল না।'

সাগরে ট্রলারের শব্দ শোনা গেল। ট্রলারটা কূলে পৌঁছানোর আগেই কাদা পানিতে লাফিয়ে নামল একদল পুলিশ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তাঁবু ঘিরে ফেলল লোকগুলো।

'তাঁবুর ভিতরে যারা আছেন, সবাই মাথার ওপর হাত তুলে বেরিয়ে আসেন!' উঁচু গলায় হুকুম দিল ওদের কমাণ্ডার।

তারানা তিক্ত স্বরে বলল, 'শত্রুর সংখ্যা এভাবে বাড়তে থাকলে কাঙ্গায় জীবিত অবস্থায় পৌঁছনো মুশকিল হবে।'

ফারুক পুলিশের কমাণ্ডারের স্বর অনুকরণ করে বলল, 'সঙ্গে রিভলভার, বন্দুক আর গুলি আছে। ওগুলো সঙ্গে আনব, না রেখে আসব?'

বিব্রত শোনাল কমাণ্ডারের গলা। 'রেখে আসেন। সামনে ফাইল করে দাঁড়ান।'

বেরিয়ে এল সবাই। সারি দিয়ে দাঁড়াল। এগিয়ে এল কমাণ্ডার। ফারুকের বুকে রাইফেলের নল উঁচিয়ে ধরে বলল, 'তোমাদের জ্বালায় আমাদের শান্তি হারাম হয়ে গেছে। কী পেয়েছ তোমরা?'

ফারুক বলল, 'এখনও কিছু পাইনি। তবে আশা করছি, পাব।'

'মানে?' ধমকের সুরে কমাণ্ডার বলল, 'তোমরা কারা?'

ফারুক বলল, 'হাত তো মোটে দুটো। অন্তত একটা নামানোর অনুমতি না পেলে পরিচয়পত্র দেখাব কীভাবে?'

কমাণ্ডারের অনুমতি পেয়ে কৃতার্থের হাসি হাসল ফারুক। পকেট থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ পরিচয়পত্র বার করে বাড়িয়ে ধরল পুলিশের কমাণ্ডারের দিকে। টর্চের আলোয় সেটা পড়ার পর কমাণ্ডার হাঁপাতে লাগল। রাইফেল মাটিতে নামিয়ে সালাম ঠুকল সশব্দে।

'ভুল হয়ে গেছে, স্যার। মাফ করে দিন। গুলির শব্দ শুনে ভেবেছিলাম, দুষ্কৃতকারী ঢুকে পড়েছে উত্তরের চরে। আপনাদের তো এখন কাঙ্গায় থাকার কথা, স্যার।'

ফারুক হাত নামিয়ে সঙ্গী দু'জনের দিকে তাকাল। ওদেরকে হাত নামানোর ইঙ্গিত দিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে।

'কাঙ্গায় পৌঁছতে পারিনি আমরা। এক দুষ্কৃতকারী আমাদেরকে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে।'

'সে কি, স্যার! তারপর কী হলো? পালিয়েছে?'

'না। আহত অবস্থায় বন্দী করেছি। তাঁবুর ভিতরে পড়ে আছে। জ্ঞান আছে কি না, জানি না।'

তারানার তাঁবুর পাশ দিয়ে হাঁটছিল ফারুক। ওয়াজেদকে গ্রেফতার করে, ফারুকের বিবৃতি নিয়ে পুলিশের লোকজন চলে গেছে। হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এসেছে মুরাদ, মুজিবর আর খায়ের। গুলির শব্দ শুনেই তারা থমকে দাঁড়ায়, তারপর ফিরে আসে।

এখন অনেক রাত। ফারুকের চোখে ঘুম নেই। তারানাকে দেখতে ইচ্ছে করছে। নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। বন্দুক হাতে নিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারানার তাঁবুর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ভিতর অজানা ভয়, শিহরণ।

মৃদু গোঙানির শব্দ ভেসে আসছে তারানার তাঁবুর ভিতর থেকে। কে জানে, জ্বর এল কিনা! ফারুক তাঁবুর দরজা তুলে ঢুকে পড়ল। হামাগুড়ি দিয়ে তারানার মাথার কাছে এগিয়ে গেল। কপালে রাখল হাত। না, জ্বর নেই। তারানা চোখ মেলে তাকাল।

'প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে,' ফিসফিস করে বলল তারানা, 'ঘুমাতে পারছি না।'

'কোথায়?'

চোখ নিচু করে তারানা বলল, 'শরীরের সবখানে।'

ফারুক কিছুক্ষণ দ্বিধায় কাটাল। তারপর ধীরে ধীরে হাত রাখল তারানার বাহুমূলে। টিপতে শুরু করল। আরামে তারানার চোখ মুদে এল। বিড়বিড় করে বলল, 'তোমাকে অনেক কষ্ট দিচ্ছি।'

ফারুক হাসল।

তখন ওদের কাছে, দূরে সমুদ্রে নতুন জোয়ারের কল্লোল। সে-ধ্বনির সঙ্গে কখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে ওদের স্বপ্ন, জীবনের নতুন গানের ব্যঞ্জনা, কেউ জানে না। ওরা বুঝতে পারেনি, অন্ধকারে সেই সর্বগ্রাসী গানের খেয়ায় ভাসতে ভাসতে কখন তারা নিজেদের অতিক্রম করে চলে গেছে দূরে, বহু দূরে। হয়তো সামনে আরও বাধা আছে, পদে পদে আছে আরও বিপদ। তবু দু'জন দু'জনাকে আঁকড়ে ধরে ভাসতে থাকবে দূর-দ্বীপের প্রত্যাশায়। পৌঁছে যাবে কাঙ্গায়। হয়তো সেখান থেকে আরও দূরে, অন্য কোন নাম-না-জানা দ্বীপে।

অরণ্যের গান ২

এক

অনেকক্ষণ একটানা ঘুমিয়ে ভোর হবার আগেই উঠে পড়ল ফারুক। অবসাদ কেটে গেছে। হালকা লাগছে শরীর। তারানার দিকে তাকাল সে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে বেচারি। এক হাতে তখনও ফারুকের শরীর আঁকড়ে ধরে আছে। মানুষ অবচেতন মনেও নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। ধীরে ধীরে নিজের গা থেকে তারানার হাত সরিয়ে দিল ফারুক। তারানা ঘুমের মধ্যে ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলল। ওর দিকে তাকিয়ে ফারুক লজ্জা পেয়ে নিঃশব্দে হাসল। বিছানার চাদর টেনে ঢেকে দিল তারানার শরীর।

হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে যাচ্ছিল, এমন সময় তারানার মৃদু স্বরের ডাক শুনল। 'অ্যাই, যেয়ো না।'

এই মিষ্টি ডাক ফারুকের বুকের ভিতর ঝরনার শব্দের মত বেজে উঠল। সে বলতে চাইল, 'আমার পালানোর সব পথ বন্ধ করে দিয়েছ তুমি। কোথায় যাব?'

হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এল সে। তারানার কানের কাছে মুখ রেখে বলল, 'মেমসাহেবের ঘুম ভেঙেছে?'

তারানা ফারুকের গলা জড়িয়ে ধরল। আদুরে গলায় বলল, 'অনেক উপকার করলেও তুমি আমার একটা ক্ষতি করেছ। বলো তো, কী?'

'জানি না।'

তারানা বলল, 'একলা চলার সাহস।'

ঠাট্টার সুরে ফারুক বলল, 'গোসল করতে যেতে ভয় লাগছে? চলো, একসঙ্গেই যাওয়া যাক।'

তারানা ফারুকের পিঠে ছোট্ট কিল বসাল। 'দুষ্টুমি হচ্ছে, না? গোসল করতে যাবার কথা একটুও ভাবিনি। তবে বুদ্ধিটা মন্দ নয়। অন্ধকার থাকতে থাকতে কাজটা সেরে নেয়াই ভাল। অলরেডি এফ এণ্ড এফ কোম্পানির লোকজন আড়ালে কানাকানি শুরু করেছে আমাদের নিয়ে।'

'হোক না কানাকানি! বয়েই গেল!'

তারানা জিভ ভেঙচাল।

বাইরে অন্ধকার। দূরে কোথাও খট্টাশ ডাকছে। কাছে গেওয়া গাছের ডালে পাখির কিচিরমিচির। মুরাদ বড় তাঁবুর কাছে বন্দুক হাতে নিয়ে বসে বসে ঢুলছে। এখন তার পালা।

তাঁবু থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে নদীতে নামল ফারুক। হাতের ইশারায় ডাকল তারানাকে। তারানা নামতে যাচ্ছিল। ফারুক বলল, উঁহুঁ, ওখান দিয়ে নয়,

মেমসাহেব। আরও সরে এসো।'

চমকে সরে গেল তারানা। নার্ভাস হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল পানিতে।

'ওখানে কী ছিল, ফারুক?'

ফারুক হাসল। 'কিছু না, কাদা। তুমি কাদা সহ্য করতে পারো না।'

তারানা ফারুকের কাছে ঘনিয়ে এল। রহস্যের সুরে বলল, 'আমার সবই তুমি বুঝেছ, জেনেছ। কিন্তু নিজের সম্পর্কে কিছুই বলোনি।'

'কিছুই বলিনি মানে?'

'তোমার অতীত সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হয়।'

ফারুক হাসল। 'আমি রাজা নই, রাজনীতিকও নই। আমার অতীত তোমার কী-কাজে আসবে?'

'তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।'

নদীতে ডুব দিল ফারুক। মাথা তুলে দেখল, তারানার জায়গাটা শূন্য। তারানা ডুব সাঁতার দিয়ে ফারুকের আরও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মুগ্ধ চোখে ফারুক তাকিয়ে রইল তারানার শরীরে প্রকৃতির উদার কারুকাজের দিকে। ওর চোখে পানির ছিটা দিয়ে তারানা বলল, 'ভূতে পেয়েছে? অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন?'

ফারুক বলল, 'তা হলে কমপ্লিট বায়োডাটা চাই, তাই না?'

তারানা হাসে। 'কমপ্লিট, আনঅ্যাব্রিজড্, আনএডিটেড। অবশ্য আমার কাছে গোপন করে যাবার মত কোন বিশেষ ব্যাপার থাকলে কিছুই জানতে চাই না।'

কৌতুকের সুরে ফারুক বলল, 'সবার জীবনেই কিছু গোপন ব্যাপার আছে, মেমসাহেব। মানুষের "সব কথা" কোনদিনই অন্যে জানতে পারে না।'

'তোমার কোন্ রাশি, ফারুক?'

ফারুক অবাক হলো। 'কেন?'

'সিংহ রাশির জাতকের চেয়েও তুমি ভয়ঙ্কর। ঠিক আছে। লড়তে যাব না তোমার সঙ্গে। তোমার অতীতের যেটুকু বলা যায়, সেটুকুই বলো।'

ফারুক কী বলবে, ভেবে পাচ্ছে না।

তারানা বলল, 'গোড়া থেকেই শুরু করো না! জন্ম কোথায় তোমার?'

ফারুক ঠাট্টার সুরে বলল, 'হাসপাতালে।'

একই সুরে তারানা প্রত্যুত্তর করল, 'মংলা উপজেলা সদর হাসপাতালে?'

ফারুক হাসল। 'তুমি কোন্ রাশির জাতক, ভেবে পাচ্ছি না। হার মানছি। আমার জন্ম মিটফোর্ড হাসপাতালে।'

'মিটফোর্ড? ঢাকা?'

'অবাক হবার কী আছে?'

তারানা বলল, 'না, তা নয়। কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো? তোমাকে ঢাকার মত একটা শহরের পটভূমিকায় কল্পনা করতে পারছি না।'

'কেন? আমার কানে পালক গোঁজা আছে নাকি? মাথায় বেণী?'

তারানা বলল, 'না। কিন্তু তোমার কথা শুনে মনে হয়, কখনও শহর দেখোনি। সুন্দরবনে জন্মেছ। এখানেই বড় হয়েছ।'

ফারুক হাসল। 'আসল ঘটনাটা বলি। দশ বছর আগে আমি প্রথম গ্রাম দেখেছি। তার আগে ঢাকার বাইরে যাইনি।'

'এত সহজে জঙ্গলের জীবনের সঙ্গে একাত্ম হলে কীভাবে?'

ফারুককে গম্ভীর দেখাল। 'আমার পরিবেশটা ছিল সুন্দরবনের চেয়েও গহন অরণ্যের মত। আসল কথা কী জানো? সভ্যতার আসল উপাদান নগরের অট্টালিকা, মেটাল রোড বা ইলেকট্রিসিটি, কিছুই না। মানুষের মন। সুসভ্য, আধুনিক মানুষ হচ্ছে সভ্যতার আসল কথা। আমি বাস করতাম একদল বর্বর, অসভ্য পশুর সঙ্গে। তার চেয়ে এই···এই জঙ্গলকেই ভাল মনে হয়। এখানকার জানোয়ারগুলো ওদের তুলনায় নিরীহ।'

মিসেস রফিক নওয়াজের কথাগুলো তারানার মনে পড়ল। লক্ষ করল, ফারুকের মুখ থেকে অনেক আগেই উবে গেছে হাসি। শক্ত হয়ে উঠেছে চোয়াল। চোখে অন্য ধরনের দ্যুতি।

তারানা ভয় পেল। 'চলো, ফারুক। তাঁবুতে ফিরে যাই।'

ফারুক তারানার কোমর জড়িয়ে ধরল। অল্প হাসি ফুটেছে মুখে। 'আমার বায়োডাটা নেবে না?'

তারানা ফারুকের গলা জড়িয়ে ধরল। 'এখন না। পরে শুনব। সকাল বেলায় তোমার মনটা খারাপ করে দিলাম, দুঃখ হচ্ছে। চুমু খাও আমাকে। মন ভাল হয়ে যাবে।'

ফারুক অপলক চোখে তাকিয়ে রইল। ওর একটা হাত তারানার কোমরে। অন্য হাতে তারানার মুখ থেকে চুল সরিয়ে দিল সে। হাতটা ফিরে এল না। মুখ থেকে নামতে লাগল নিচে। গলায়। গলা থেকে আরও নিচে। তারানার গলায় একটা সোনার চেইন। লকেটটা ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

'এমন অদ্ভুত লকেট কোথায় পেলে, তারানা? আর কখনও পরতে দেখিনি তো!'

'এটা আমার বড় সাধের জিনিস। আগে সারাক্ষণ পরে থাকতাম। এখন কাছে রাখি। সব সময় পরি না।'

'দেখতে আধখানা স্বর্ণমুদ্রার মত।'

'ঠিক বলেছ। বাবা দিয়েছিলেন আমাকে। চট্টগ্রামের পাহাড়ে এক ঐতিহাসিক নিদর্শন খননের সময় এমন অনেক মুদ্রা পেয়েছিলেন তিনি। মুদ্রার একটা অংশ উপহার দিয়েছিলেন আমাকে। আমি তখন খুবই ছোট।'

'কিন্তু বাকি অর্ধেকটা গেল কোথায়?'

'বাকি অর্ধেকটা বাবা নিজের কাছে রাখতেন। অনেক বছরের কথা। জানি না, শেষ পর্যন্ত সেটা ওঁর কাছে ছিল, না হারিয়ে গিয়েছিল।'

লকেটটা তিন আঙুলে তুলে দেখল ফারুক। 'বোঝা যাচ্ছে না, কোন্ আমলের জিনিস! তবে তিনশো বছরের কম নয় এর বয়স, বলতে পারি।'

তারানা বলল, 'ঠিকই বলেছ। বাবা অনুমান করতেন, এটা অন্তত পাঁচশো বছরের পুরানো।'

ফারুক চিন্তিত মুখে লকেট নাড়াচাড়া করতে লাগল।

তারানা বলল, 'বেলা বাড়ছে, ফারুক। তাড়াতাড়ি করো এখুনি ওরা কেউ এসে পড়বে।'

ফারুকের মুখ নেমে এল তারানার মুখের ওপর। পরস্পরের প্রবল আকর্ষণে কাঁপতে লাগল ওদের শরীর। সে-কাঁপন তরঙ্গ তুলল নদীর পানিতে। ডুব দিল ওরা। যতক্ষণ দম না ফুরোল, ডুবে রইল।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তাঁবুর দিকে এগিয়ে যায় ওরা। দু'জনের চোখেই বিস্ময়, জীবনের নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের আনন্দ।

মুরাদ ডিম ভাজছে। বাতাসে চমৎকার গন্ধ। তারানার পেটে খিদে মোচড় দিয়ে উঠল। অন্য একটা চুলোর ওপর চায়ের পানি ফুটছে। মুজিবর, মতি আর খায়ের ধরাধরি করে তাঁবু গোটাচ্ছে। দেখতে দেখতে দৃশ্যটা তারানার মনে গেঁথে গেছে যেন। যাযাবরের মত জীবন ওদের। তাঁবু ফেলা, খাবারের আয়োজন করা, রাত কাটানো, আবার তাঁবু তোলা, নৌকায় ওঠা। ধরাবাঁধা নিয়মের ব্যতিক্রম বলতে কখনও কখনও বাঘের উৎপাত। ব্যস! তারানা অল্প সময়ের জন্যে জড়িয়ে পড়েছে এদের জীবনের সঙ্গে। বৈচিত্র্যটা তাই ওর কাছে উপভোগ্য মনে হচ্ছে। কিন্তু বেশিদিন এভাবে কাটাতে হলে ও পাগল হয়ে যাবে।

কাপড় ছাড়তে ছাড়তে তারানা ভাবছিল আগামী দিনগুলোর কথা। জীবনের নতুন সূর্যোদয়কে স্বাগত জানাতে দ্বিধা নেই। কিন্তু তারপর কেমন হবে জীবনটা, না ভেবে পারছে না। ফারুক কি এ-পেশাটাই আঁকড়ে ধরে থাকবে? যদি তা-ই হয়, কিভাবে মিলবে ওদের জীবন? ফারুকের জন্ম ঢাকায়, সেখানেই ও বড় হয়েছে, জেনে স্বস্তি পেয়েছে তারানা। কিন্তু ঢাকার ওপর এর চরম বিতৃষ্ণার কথা শুনে দুর্ভাবনাও হয়েছে। সে-বিতৃষ্ণার রহস্য উদ্ধার করা তারানার পক্ষে সম্ভব হয়নি। হয়তো সময়ও আসেনি। কে জানে, কোনদিন ফারুককে ঢাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ওর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা!

যদি না হয়, তারানা কী করবে? এই জঙ্গলে, এই 'বনদেবী'তে চড়ে কাটাতে হবে বাকি জীবন! তারানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু বাকি জীবন যেভাবেই কাটুক, ফারুককে ছেড়ে থাকার কথা ভাবতে পারছে না ও। জোয়ারের উন্মত্ত জল যেমন বালুচরের খড়কুটো ভাসিয়ে নিয়ে যায়, ওর সব দ্বিধা, ভয় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ফারুক। ও জানত না, ভালবাসা এমন সর্বগ্রাসী হয়।

ফারুক 'বনদেবী' র এঞ্জিন পরীক্ষা করছে। কাঙ্গার উপকূল পার হবার সময় ও কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। জায়গাটা বিপজ্জনক। মুজিবর অস্ত্রগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করে নৌকায় তুলেছে। নাশতার পর চায়ের জন্যে ছটফট করতে লাগল তারানা। ক্ষণিকের জন্যে ভুলে গিয়েছিল, ওয়াজেদ নেই। 'আপার' কখন কি দরকার, ওয়াজেদের জানতে বাকি ছিল না। সব সময় দরকারের জিনিসটা সে হাতের কাছে এগিয়ে দিয়েছে। মুখ মানুষের মনের আয়না, কথাটা সর্বদা সত্য নয়। বেশ খানিকটা মূল্য দিয়ে এটা জেনেছে তারানা। ওয়াজেদকেও চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতার। জঙ্গলের পুলিশ বাঘ-ভালুকের চেয়ে কম হিংস্র নয়। স্বাভাবিক জীবনের যে-কোন ব্যতিক্রম মানুষের মনে বন্যতা এনে দেয়, উপলব্ধি

করেছে তারানা। ওয়াজেদের শরীরের হাড়গুলো এখনও অক্ষত আছে কিনা, কে জানে!

একটা মগ জোগাড় করে তারানা চুলোর দিকে এগিয়ে গেল। 'মুরাদ ভাই, ওয়াজেদকে নিয়ে কী করবে পুলিশ?'

মুরাদ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, 'কী আর করবে? বাঁশডলা দিয়ে কথা বের করার চেষ্টা করবে!'

'বাঁশডলা মানে?'

তারানার মগে গরম চা ঢেলে মুরাদ বলল, 'আসামীকে শুইয়ে তার দু'পায়ের ফাঁকে বাঁশ রাখা হয়। তারপর পা দুটো চেপে ধরা হয় হাড় না ভাঙা পর্যন্ত।'

শিউরে উঠল তারানা। 'পাশবিক!'

'ঠিকই বলেছেন, আপা,' মুরাদ হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু কথা বের করতে না পারলে যে ওই পুলিশ বেচারাও সমস্যায় পড়ে!'

তারানা চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আর যদি ও স্বীকারোক্তি করে, তাহলে কি ছেড়ে দেয়া হয়?'

'ওই খানেই মজা, আপা। একটু স্বীকারোক্তি শুনতে পেলেই মহা উৎসাহে টর্চারের মাত্রা বাড়ায় পুলিসের লোক। আরও তথ্য চায়। যত বলতে থাকে আসামী, মার ততই বাড়ে।'

তাঁবু গোটানোর কাজ শেষ করে মুজিবর এসে কাছে দাঁড়াল। মুরাদ তাকেও এক মগ চা দিল।

তারানা বলল, 'ওয়াজেদকে রক্ষা করা যায় না?'

মুজিবর বলল, 'আসল আসামী হচ্ছে সাজেদ আলী। ওকে গ্রেফতার করে যদি পুলিশ কথা বের করতে পারে, তাহলে ওয়াজেদ ছাড়া পাবে। তার আগে হারামিটাকে কোন সাহায্য করা যাবে না, আপা।'

ফারুক মগ খুঁজে না পেয়ে একটা গামলা বাড়িয়ে ধরল মুরাদের দিকে। 'চা দাও, মুরাদ।'

তারানা হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ফারুক বলল, 'হেসো না, মেমসাহেব। কতদিন হাঁড়িতে ভাত খেয়েছি! গিন্নিদের মত শখে নয়, প্লেটের অভাবে।'

মতি বলল, 'মুরাদ ভাই একদিন গোলপাতা গায়ে দিয়ে ঘুমিয়েছিল।'

তারানার মুখ থেকে হাসি উবে গেল। এই জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে হচ্ছে তাকে। হাসার কোন মানে হয় না।

'বনদেবী' আবার এগিয়ে চলেছে। ভিতরে ভিতরে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল তারানা। নিজেকে মনে হচ্ছে সাত বছরের বালিকা। যেন অনেক দিন পর বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে। পথের কষ্টের কথা ভুলে গেছে ও। ভুলে গেছে, সামনে বাবা নয়, শুধুই তাঁর কবর। তা-ও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না, এখুনি বলা যায় না। পদে পদে আছে বিপদ, ভয়।

কাঙ্গা দ্বীপের তটরেখা দেখা গেল। ফারুক হাসিমুখে বাইনোকুলার বাড়িয়ে

ধরল। তারানা বাইনোকুলারে চোখ রেখে বলল, 'বাবার কবরটা এখান থেকে দেখা যাবে?'

ফারুক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'না। প্রেসিডেন্টের বিশেষ সামরিক সচিব আমাকে যে-ম্যাপ দিয়েছেন, তাতে দেখানো হয়েছে, কবরটা উপকূল থেকে অন্তত দেড় মাইল ভেতরে।'

'দেড় মাইল!' তারানার সুরে হতাশা।

ফারুক বলল, 'ঘাবড়ানোর কী আছে? দেড়শো মাইলেরও বেশি পথ পেরিয়ে এসেছ।'

কাঙ্গার উপকূলে সমতল জায়গা নেই বললেই চলে। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে জঙ্গলের শুরু। নৌকা থেকে নামতেই তারানার গা ছমছম করে উঠল। কয়েকটা গাঙচিল ওদের মাথার ওপর দিয়ে চক্কর দিচ্ছে। একটা বড় শকুনও আছে।

তারানার মুখের দিকে তাকিয়ে ফারুকের মায়া হলো। এবার সত্যিই ভয় পেয়েছে বেচারি। তারানার হাতের পর হাত রাখল ফারুক। অভয় দিল। 'সব ঠিক হয়ে যাবে, মেমসাহেব। ভয় পেয়ো না। প্রথমে ক্যাম্প-এর জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। কাঙ্গায় এর আগে কখনও আসিনি আমরা। কোন অভিজ্ঞতা নেই এ-জায়গা সম্পর্কে। পথ ঘাটের হদিস বের করতে হবে। আর···আগেও বলেছি···খুব সাবধান!'

একে একে সবাই নামল নৌকা থেকে। মালপত্র নামানো হলো। সবার ভাগেই পড়ল কিছু কিছু বোঝা। ফারুকের এক হাতে রিভলভার। অন্য হাতে কাঁধে তুলে নিল প্যারাস্যুট কাপড়ের ভারী একটা বস্তা। তারানা নিল একটা ব্যাগ। ওর নিজের ছোট ব্যাগটাও রইল কাঁধে। মুরাদের ঘাড়ে ব্যাগ, হাতে বন্দুক। সোয়া বারোটা বাজে। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা।

তারানা ড. হাশিমের দেয়া ম্যাপটার কথা ভাবতে চেষ্টা করল। বারবার ওর মুখস্থ হয়ে গেছে ম্যাপের আগাগোড়া। ফারুকের ম্যাপের সঙ্গে অনেকখানি মিল আছে সে-ম্যাপের। শুধু দূরত্বটা মেলে না। ড. হাশিমের ম্যাপ অনুসারে উপকূলের কাছেই একটা সমতল জায়গা আর পুকুরের উল্লেখ ছিল। কিন্তু ফারুকের ম্যাপে সমতল এলাকা অন্তত একমাইল দূরে।

প্রজাপতির গায়ের মত চমৎকার, বর্ণালী গাছের ডাল দেখে তারানা থমকে দাঁড়ায়। একেবারে হাতের কাছেই। এত সুন্দর, ডোরাকাটা ডাল ও কখনও দেখেনি। ফারুক এগিয়ে গেছে কয়েক পা। তারানা অনুনয়ের সুরে বলল, 'একটু দাঁড়াও না, ফারুক। ডালটা ভেঙে নিই।'

পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল খায়ের। 'খবরদার, মেমসাহেব!'

আঁতকে উঠে হাত সরিয়ে নিল তারানা। খায়ের হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ওটা সাপ!'

আর না বললেও চলত। তারানা ডালটাকে নড়ে উঠতে দেখল। সর সর করে ডাল থেকে নেমে গেল সাপ। কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফ্যাকাসে মুখে তারানা দাঁড়িয়ে রইল। ফারুক পিছিয়ে এল। তারানার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আবার বলছি, সাবধান! জঙ্গলে না জেনে শুনে কোন জিনিসে হাত দিতে নেই। এ-যাত্রা

খায়ের তোমাকে খায়ের করেছে। ও সময়মত দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল তাই…'

এই জঙ্গলের সব জায়গায় ড. হাশিমের স্মৃতি ছড়িয়ে আছে। হাঁটতে হাঁটতে তারানা বাবার কথা ভাবছিল। কাঙ্গায় অনেকদিন ছিলেন তিনি। এ-জঙ্গলের বর্ণনা দিয়ে অনেক চিঠি লিখেছেন তারানার কাছে। ড. হাশিম বলেছিলেন, অনেক কষ্ট করে পথ তৈরি করে এ-জঙ্গলে চলতে হয়। যদি মাত্র এক মাসও অন্য কোন মানুষের পা না পড়ে, সে পথ ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে যায়। আবার নতুন করে তৈরি করতে হয় পথ।

হাতে ধারাল দা নিয়ে সবার আগে হাঁটছে মতি। গাছের ডাল, ঝোপের লতা, এইসব কেটে পথ তৈরি করছে। ওকে সাহায্য করছে ফারুক। কাজের সময় ফারুকের হাতের পেশি থরথর করে কাঁপছে। তারানা মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

মোটামুটিভাবে সমতল একটা জায়গা পাওয়া গেছে। ফারুক আর মুরাদ অস্ত্র হাতে চারপাশটা ঘুরে দেখে নিল। মুজিবর, মতি আর খায়ের শুরু করল তাদের রুটিন কাজ—তাঁবু খাটানো। আপত্তি শুনল না তারানা, হাত লাগাল ওদের সঙ্গে। সাতজনের এতটুকু দলে একজনের শ্রম কমে যাওয়া অনেকখানি ক্ষতি। সেটা পুষিয়ে নেবার চেষ্টা করবে তারানা। কিছুক্ষণের মধ্যে ফারুক আর মুরাদ ফিরে এল। রান্নার কাজ বাকি আছে।

বাঘের ডাকে চমকে উঠল সবাই। গোল হয়ে বসে খাচ্ছিল ওরা। খাওয়া বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল ফারুক আর মুরাদ।

'শব্দটা কতদূর থেকে আসছে?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল তারানা।

ফারুক উত্তর দিল না। নিজের তাঁবুতে ঢুকে রিভলভার বার করল। মুরাদ বড় তাঁবু থেকে নিয়ে এল বন্দুক।

মুজিবর নিচু স্বরে বলল, 'বাঘ কাছেই, মেমসাহেব। তাঁবুর ভিতরে যান।'

তারানার ইচ্ছে হলো ফারুকের সঙ্গে যেতে। দিনের বেলায় তাঁবুতে একলা থাকতে ওর ভয় নেই, কিন্তু ফারুকের সঙ্গে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ফারুক তারানার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'দু'জন একসঙ্গে বিপদে পড়ে লাভ নেই। তুমি তাঁবুতে থাকো, বাইরে এসো না। মুজিবর, মতি আর খায়ের পাহারা দেবে তোমাকে।'

চোখের পলকে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল ফারুক আর মুরাদ।

তারানা তাঁবুর ভিতরে বসে কান খাড়া করে রইল। বাঘের গর্জন ক্রমেই এগিয়ে আসছে। রাতের মত বিভ্রম হবার সম্ভাবনা এখন নেই। কিন্তু ঠিক বোঝাও যাচ্ছে না, বাঘ কোথায়।

জঙ্গলের ভিতর থেকে প্রচণ্ড আলোড়নের শব্দ আসছে। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে মুহূর্ত গুনছে তারানা।

গুলির শব্দ হলো। বোঝা গেল না, কে করল গুলি। ফারুক, না মুরাদ? কিন্তু

একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হলো তারানা। বাঘের আর সাড়াশব্দ নেই। মারা পড়ল নাকি?

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল মুরাদ।

তারানা তাঁবুর দরজা তুলে উঁকি দিল। 'কী খবর, মুরাদ?'

'গুলি খেয়ে পালিয়েছে বাঘটা।'

'তোমাদের "সাহেব" কই?'

'আমি তো ভাবলাম, ক্যাম্পে ফিরে এসেছেন।'

মতি আর মুজিবর বেরিয়ে এসে বলল, 'কই? না তো!'

তারানা বলল, 'গুলি কে করল? তুমি?'

'না, মেমসাহেব।'

পেছনের জঙ্গলে খসখস শব্দ। ফারুক বেরিয়ে এল। মুখে হাসি। 'পালিয়েছে। প্রাণে যদি না-ও মরে, ভুগবে অনেকদিন।'

মুরাদ বলল, 'দেখে তো মনে হলো না, বাঁচবে।'

মুজিবর বলল, 'জঙ্গলের এসব জানোয়ারের প্রাণ খুব শক্ত। চট করে মরে না।'

মুরাদ বন্দুক ফেলে এঁটো প্লেট-গ্লাস ধুতে বসল। ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল মতি।

ফারুক লক্ষ করল, তারানা চঞ্চল চোখে জঙ্গলের দিকে তাকাচ্ছে। তারানার কাছে এগিয়ে এল ও। 'বাঘের কথা ভাবছ?'

'উঁহুঁ।'

'তাহলে—?'

তারানা উত্তর দিল না। ছলছল চোখে তাকাল ফারুকের দিকে। লজ্জা পেল ফারুক। কবরের কথাটা ভুলে গিয়েছিল সে।

'চলো, কবর খুঁজে বের করি। যাবে?'

তারানা এবারও উত্তর দিল না। নীরবে মাথা দোলাল।

ফারুক রিভলভার পকেটে গুঁজে বন্দুক হাতে তুলে দিল। মুজিবরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বড় লাঠিটা বের করে মেমসাহেবের হাতে দাও।'

মুজিবর লাঠি বার করে দিল।

দলের অন্য সবাইকে প্রয়োজনমত সাবধান থাকার নির্দেশ দিয়ে আবার জঙ্গলের পথে পা বাড়াল ফারুক, সঙ্গে তারানা।

'ভয় করছে?'

'উঁহুঁ,' ফারুকের হাত জড়িয়ে ধরে তারানা বলল, 'তুমি কাছে থাকলে মনে হয়, গোটা পৃথিবীই আমার। ভয় করে না কিছুতেই। অদ্ভুত টিপ তোমার!'

ফারুক পকেট থেকে ম্যাপ বার করে পথ মিলিয়ে দেখছিল। অতি কষ্টে জঙ্গল পরিষ্কার করে আরও একটু এগিয়ে গেল। অন্যমনস্কভাবে বলল, 'তাই বুঝি?'

তারানা বলল, 'অ্যাই, বাঘটা তোমার কাছ থেকে কতদূরে ছিল?'

ফারুক বলল, 'তা···পঞ্চাশ গজ তো হবেই!'

তারানা চোখ কপালে তুলল। 'বলো কি! পঞ্চাশ গজ দূর থেকে ঘায়েল করেছ ওটাকে?'

ফারুক অবাক হয়ে তাকাল তারানার দিকে। 'আমি ঘায়েল করলাম কোথায়?'

'সে কি! মুরাদ যে বলল···'

ফারুক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর কপালে চিন্তার রেখা।

'এসব কী হচ্ছে, ফারুক?'

ফারুক তারানার কাঁধে হাত বুলিয়ে দিল। 'ভয় পেয়ো না। হয়তো ব্যাপারটা খুবই সামান্য। মুরাদ হয়তো না বুঝেই তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে।'

'হয়তো তাই।'

বলল বটে, কিন্তু তারানা নিজেও ভাবনাটা মন থেকে তাড়াতে পারল না। ব্যাপারটা এত সামান্য নয়।

প্রায় দু'শো গজ এগিয়ে ডানদিকের সরু পথ ধরে উত্তরমুখো চলল ওরা। মিনিট পাঁচেক পরে উপস্থিত হলো টিলার মত একটা উঁচু জায়গায়। সামনে জঙ্গলাকীর্ণ একটা ঢিপি। আগাছা সরিয়ে কি যেন খুঁজল ফারুক। তারানা রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইল ফারুকের মুখপানে।

ফারুক মুখ তুলে বলল, 'এই তোমার বাবার কবর, তারানা।'

তারানা হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়ল। ফারুক জড়িয়ে ধরল ওকে। 'খারাপ লাগছে?'

তারানা পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল কবরের দিকে। ওর দৃষ্টি যেন ওপরের আগাছা ভেদ করে চলে যাচ্ছে মাটির ভিতরে। আরও, আরও নিচে। যেন কবরে শোয়ানো ড. আবুল হাশিমকে দেখতে পাচ্ছে সে। শুয়ে আছেন বৃদ্ধ জ্ঞানতাপস। মাথার কাছে বই আর চিঠি লেখার কাগজ। মেয়ের কাছে চিঠি লিখতে লিখতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তারানা যেন অসমাপ্ত চিঠির লাইনগুলোও দেখতে পাচ্ছে।

'মা তারানা, ভাবলাম, তুই আসবি। কিন্তু···'

তারানা অনুভব করল, ওর শরীর কাঁপছে। কথা বলতে গিয়ে ফুলে উঠছে ঠোঁট জোড়া। অনেক কথা ভেবে রেখেছিল, বাবার কবরের দেখা পেলে সেগুলো বলবে। জমিয়ে রেখেছিল অনেক প্রার্থনা। সেসব কিছুই ওর মনে পড়ল না।

তারানা কবরের মাটি জড়িয়ে ধরল দু'হাতের মুঠোয়। চোখের জলে ভিজতে লাগল সে-মাটি। কবরের দু'পাশে দুটো বুড়ো সুন্দরী গাছ; স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

দুই

সন্ধে হয়ে আসছে। ফারুক অসহায়ভাবে তারানার দিকে তাকাল। জোরে পা চালালে মিনিট দশেকের মধ্যেই তাঁবুতে ফিরতে পারে ওরা। তবু ফারুক ঝুঁকি

নিতে চায় না। অন্ধকার নামার আগেই রওনা হওয়া উচিত। তারানা ধ্যানমগ্নের মত তাকিয়ে আছে কবরের দিকে। ফারুক ঘড়ির দিকে তাকাল। আরও পাঁচ মিনিট সময় দেয়া যায় মেয়েটাকে। সে একটা সাপ মারল। বানরগুলো কিচিরমিচির করে পালাল ভয় পেয়ে। তারপর ফিরে এসে তারানার কাছে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল।

তারানা ফিরে তাকাল, চোখে অশ্রুর আঁকাবাঁকা রেখা। তারানার পাশে বসল ও। হাতে তুলে নিল ওর হাত। অসাধারণ সুন্দর দেখাচ্ছে তারানাকে। ফারুক রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইল। এ-তারানাকে আগে দেখেনি ও। ঠিক যেন পাথরের প্রতিমা। মানুষের এমন অনেক দুঃখ-শোক আছে, যার আসলে কোন সান্ত্বনা হয় না। ফারুক ঢোক গিলল। 'ইয়ে···তোমার তো নিশ্চয়ই কোন অনুশোচনা নেই! অতদূর থেকে কি আর করতে পারতে? তবু তো এত বিপদ এড়িয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এসেছ! কবর খুঁজে বের করেছ। বিদায় জানিয়েছ মরহুমকে। তোমার বাবা···সত্যিই···সৌভাগ্যবান। তোমার মত মেয়ে···'

তারানা ফারুকের গলা জড়িয়ে ধরে শিশুর মত ডুকরে কেঁদে উঠল। 'তুমি···তুমি জানো না, ফারুক, আমি বাবাকে···কত···কত কষ্ট দিয়েছি। হতাশ করেছি। আমি···আমার পাপের ক্ষমা হয় না, ফারুক।'

'কোন পাপ করোনি তুমি।'

হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত চেঁচিয়ে উঠল তারানা। 'একশো বার করেছি। আমি বাবার অনুরোধ···শেষ অনুরোধ···রাখিনি।'

ফারুক বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরল তারানাকে। ওকে কথা বলার সুযোগ দিল। যা বলতে চাইছে বলুক তারানা। তাতে ওর মন হয়তো হালকা হবে।

'মৃত্যুর একমাস আগে বাবা চিঠি লিখেছিলেন আমাকে। অনুরোধ করেছিলেন এখানে আসতে। কাঙ্গার কাছে যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা দেখার জন্যে আমাকে ডেকেছিলেন। আমার সাহায্য চেয়েছিলেন কোন একটা কাজে। কাজটা কি, বলেননি। কিন্তু মনেপ্রাণে আমাকে আশা করেছিলেন। অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে পারেননি তিনি। আর···আমি তাঁকে এমনভাবে হতাশ করেছি!'

'প্রাচীন সভ্যতার ব্যাপারটা···ঠিক···আমার মনে হয়···উনি স্বপ্নে দেখেছিলেন,' ধীরে ধীরে বলল ফারুক।

'না, ফারুক। অমন কথা বোলো না। বাবা নিশ্চিত না হয়ে কখনও কোন কথা বলেননি।'

ফারুক ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। সুন্দর চুলের রাশি অযত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাঙ্গার ঝামেলা মিটিয়ে সভ্য লোকালয়ে ফিরে যেতে ক'দিন লাগবে, কে জানে?

'ফারুক, বাবাকে আমি বড় ভালবাসতাম। বাবা ছাড়া···সত্যিকার অর্থে···আমার কেউ ছিল না।'

'জানি।' তারানার কপালে, গালে চুমু খেলো ফারুক। সান্ত্বনা দেবার ভাষা ওর ভাণ্ডারে বেশি নেই। কিন্তু তারানার কষ্টটা সহ্য করাও ওর পক্ষে কঠিন।

শরীরের স্পর্শ দিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল ফারুক।

'খুব ছোটকাল থেকে আমাকে টেনে বেড়াচ্ছেন বাবা। কখনও মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। সেই বাবাকে আমি দুঃখ দিয়েছি। বুকের ভিতরে অনেক কষ্ট লুকিয়ে রেখে মারা গেলেন আমার বাবা।'

ফারুক তারানার ঠোঁট থেকে অশ্রুর ধারা মুছে দিল আঙুলের আলতো ছোঁয়ায়। 'আমার কিন্তু একটুও তেমন মনে হয়নি। ড. আবুল হাশিমকে আমি দেখেছি। দিনের পর দিন মিশেছি ওঁর সঙ্গে। তোমার সম্পর্কে কোন দুঃখবোধ থাকলে কোন না কোন সময় তা প্রকাশ পেত। উনি খুবই যুক্তিবাদী মানুষ ছিলেন। আ ভেরি আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং পারসন। মন খারাপ করার কিছু নেই। উনি জানতেন, তুমি ওঁকে কতখানি ভালবাসো।'

'কে জানে, হয়তো তাই!' বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল তারানা, 'কিন্তু এখানেই শেষ নয়, ফারুক। বাকি কথাগুলো শুনলে···'

ফারুক বাধা দিল। 'আজ আর নয়, তারানা। কাল শুনব। সন্ধে হয়ে গেছে। এখন জোর কদমে ছুটতে হবে। উঠে পড়ো।'

ফারুকের গায়ে ভর দিয়ে তারানা উঠে দাঁড়াল। প্রতিবাদ করার ক্ষমতাও আর নেই।

অদ্ভুত এক অনুভূতি নিয়ে ভোররাতে ঘুম থেকে উঠল তারানা। প্রথমে মনে হলো, ওর মাথাটা ফাঁকা। কিছুই ভাবতে পারছে না। শরীর পাখির পালকের মত হালকা হয়ে গেছে। মনে হলো, ও এখানে কেন? মাথার ওপরে মশারি এল কোত্থেকে? ধীরে ধীরে মনে পড়ল কালকের সব কথা। কবর থেকে ক্যাম্প পর্যন্ত পথ কেটেছে এক ধরনের ঘোরের মধ্যে। শুধু মনে হচ্ছিল, সঙ্গে একজন আছে। ওর ওপর নির্ভর করা যায়। ও থাকতে কোন বিপদ আসবে না।

সন্ধের পর ক্যাম্পে পৌঁছল ওরা। মুরাদ, মুজিবর, মতি আর খায়ের অধীরভাবে পায়চারি করছিল সরু পথের ওপর। অনুমতি থাকলে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ত ওরা।

মুরাদের চমৎকার রান্না উপভোগ করতে পারেনি তারানা। নামমাত্র একটু খাবার মুখে দিয়েছে। ফারুক কখন ওর তাঁবুর ভেতরে বিছানা তৈরি করে মশারি খাটিয়ে শুতে পাঠিয়েছে, কিছুই মনে নেই। ঘুমে ঢলে পড়ার আগে শেষবারের মত বিড়বিড় করে বলেছে, 'মুরাদ মিথ্যে বলল কেন, ফারুক?'

ফারুক জিজ্ঞেস করেছে, 'কী বলছ?'

তারানা উত্তর দিতে পারেনি। ফারুক পরম যত্নে ওর গায়ে চাদর টেনে মশারি গুঁজে বেরিয়ে এসেছে তাঁবু থেকে। পাশেই ওর নিজের তাঁবু। মুজিবর, মতি আর খায়েরের সঙ্গে পালা করে ক্যাম্প পাহারা দিয়েছে ও।

তারানা বড় লাঠিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে ফারুকের তাঁবুতে উঁকি দিল। ঘুমিয়ে আছে ফারুক। পা টিপে টিপে সরে এল তারানা। ফারুককে জাগাতে চায় না। বাবার শেষ অনুরোধ রাখতে না পারার অপরাধবোধ সব সময় ওকে তাড়া করে ফিরছে। কবরের কাছে একলা গিয়ে দাঁড়াতে চায় তারানা। বাকি কাজটুকু সারবে একা। ফারুকেব ঘুম ভাঙার আগেই ফিরে আসবে।

কিন্তু তাঁবুর শেষ প্রান্তে পৌঁছতেই চমকে উঠল তারানা। ফারুক ঘুমজড়ানো স্বরে ডাকল, 'তারানা—'

'উঁ!'

'ভোর হয়নি এখনও। কোথায় যাচ্ছ?'

'দেখি, মুরাদ ঘুম থেকে উঠেছে কি না। এক কাপ চা খেলে বেশ হত।'

ফারুক আর কিছু বলল না। তারানা বড় তাঁবুর কাছে চলে এল। ভেবেছিল, মুরাদ ঘুম থেকে ওঠেনি। কিন্তু ওকে রান্নার জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করতে দেখে ভাবনায় পড়ল। পিছন দিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করল। তা-ও হলো না। দেখে ফেলল মুরাদ। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে এদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সজাগ হয়েছে। কিছুই নজর এড়ায় না।

'চা লাগবে, মেমসাহেব?'

ইতস্তত করে তারানা বলল, 'হ্যাঁ, এক মগ চা পেলে মন্দ হত না।'

'এখুনি দিচ্ছি।'

'তুমি চা তৈরি করো। আমি আসছি। দেরি হবে না।'

তারানা জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল। পুবের আকাশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। লাঠি দিয়ে সামনের মাটি আর দু'পাশের ডালপালা ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে চলল। বুকের ভিতর ভয় আর কর্তব্য পালনের তাগিদের দ্বন্দ্ব।

ওরা কি বুঝতে পেরেছে উদ্দেশ্য? বোধহয় না। যদি বুঝত, তা হলে বেরুতেই দিত না, ভেবে স্বস্তি পেল তারানা। নিরাপত্তার ব্যাপারে সবাই এখানে বেশি সজাগ। বিশেষ করে তারানার ব্যাপারে ওদের উদ্বেগ অনেক বেশি।

ড. হাশিমের কবরের কাছে পৌঁছে তারানা দেখল, অন্ধকার কেটে গেছে। গাছের পাতায় ঝিকমিক করছে প্রভাতের সোনালি আলো। দূরে কোথায় ডাকছে এক নাম-না-জানা পাখি। এখুনি রোদ উঠবে। একরাশ ঝোপঝাড়ের মাঝে মাটির কবরটা যেন তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তারানা চোখ বুজে মনে মনে বলল, 'বাবা, আমায় তুমি ভুল বুঝো না। নিজেই নতুন দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিচ্ছি। কথা দিচ্ছি, এ-দায়িত্ব পালন না করে ফিরে যাব না। অনেক কষ্ট করে তোমার সাধের বিজনপুরে এসে পৌঁছেছি। যদি একবার দেখতে পেতে, বাবা, শুধু···শুধু একবার! যদি জানতে পেতে, তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি!'

মনটা ভাল হয়ে গেল। চোখ মেলল তারানা। বুঝতে পারল, ও একা নয়, আরও কেউ আছে। ওর খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। ধীরে ধীরে ডানদিকে মাথা ঘোরাল। দু'জন আদিবাসী ধরনের লোক স্থির, নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। পরনে জীর্ণ, মলিন কাপড়। মুখভর্তি দাড়ি-গোঁপ। কবজিতে বালা। মাথায় জট-পাকানো লম্বা চুল। সবার হাতে ধারাল অস্ত্র। নিঃশ্বাস নিতে ভুলে গেছে তারানা। এক প্রবল চিৎকার যেন ওর পেটের ভিতর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠে এসেছে গলার কাছে। কিন্তু চেঁচাল না তারানা। লোকগুলোকে বুঝতে দিতে চায় না, ও ভয় পেয়েছে।

বাঁ-দিকে তাকাল। সেখানেও দু'জন। একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে।

পেছনের দিকে পালানোর পথ আছে কিনা দেখতে ঘাড় ফেরাল তারানা। না,

পথ নেই। দু'জন দাঁড়িয়ে।

তারানার মনে হলো, হঠাৎ শীত নেমেছে। কুঁকড়ে যাচ্ছে ও। ওরা কারা? কেন ঘিরে ধরেছে? ড. হাশিমের মৃত্যুর সঙ্গে এদের কোন সম্পর্ক আছে? জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিল তারানা। কিন্তু দেখল, মুখে কথা আসছে না। আড়ষ্ট হয়ে গেছে জিভ।

'তারানা, যা বলছি, মন দিয়ে শোনো,' ইংরাজীতে পরিচিত স্বর শুনতে পেল তারানা।

ফারুক নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে কয়েক ফুট দূরে। তারানা কয়েক সেকেণ্ড সময় নিল স্বাভাবিক হতে। তারপর কাঁপুনি বন্ধ হলে বলল, 'ওরা কারা?'

ফারুক অপরিবর্তিত সুরে বলল, 'সাহস হারিয়ো না। তবে এখন আরও বেশি সাহস আর বুদ্ধির দরকার। কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা আমার কাছে চলে এসো। এখুনি।'

ছ'জন দুর্বৃত্তের বারোটা চোখ তাকে লক্ষ করছে, অনুভব করে তারানা আবার শিউরে উঠল। ধীরে ধীরে পা বাড়াল ফারুকের নির্দেশমত। লাঠিটা তুলে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু ইঙ্গিতে নিষেধ করল ফারুক।

সূর্য উঠেছে। কাঁচা সোনার মত রোদ ছড়িয়ে পড়েছে বনের পাতায়, ডালে। সে-রোদে চিকমিক করে উঠল দুর্বৃত্তদের ধারাল, ধাতব অস্ত্র। লোকগুলোর দিকে তাকাতে পারছে না তারানা। ওদের চোখে হত্যার সংকল্প জ্বলজ্বল করে উঠেছে। ড. আবুল হাশিমের ঘাতকদেরই যেন দেখতে পাচ্ছে তারানা।

ডানদিকের লোকদু'জনের হাতে রাইফেল দেখতে পেল তারানা। আদিবাসীদের হাতে রাইফেল! একেবারে বেমানান। সামনে, একটু দূরে যারা দাঁড়িয়ে আছে, ওদের হাতে কাটা রাইফেল আর রিভলভার।

'তাড়াতাড়ি,' ধমকের সুরে তাগাদা দিল ফারুক। কিন্তু ওর চোখে প্রশান্তির ভাব। তাকিয়ে আছে সশস্ত্র লোকগুলোর দিকে। তারানার দিকে একবারও তাকাচ্ছে না। লোকগুলোকে বুঝতে দিচ্ছে না, তারানাকে কি বলছে। আঞ্চলিক ভাষায় কি যেন বলল লোকগুলোকে। তারপর ফিরে তাকাল তারানার দিকে। ইংরেজীতে বলল, 'ওরা আদিবাসী। খুবই বিপজ্জনক। ইংরেজী জানে না। মন দিয়ে আমার কথা শোনো। যা বলি, ঠিকমত করে যাও। আমি ওদের বলেছি, তুমি একজন শৌখিন চিত্র-পরিচালক। সিনেমা বানাও। শুটিং-এর কাজে এসেছ। এখন এমন কিছু বলো, যাতে কথাটা প্রমাণ হয়। বাংলায় বলো। মুখ থেকে ভয়ের ভাব কাটিয়ে স্বস্তি ফিরিয়ে আনো।'

তারানা বলল, 'জায়গাটা খুব সুন্দর। আমার পছন্দ হয়েছে। আমাদের "জংলী নারী" ছবির জন্যে ভালই।'

ফারুক বলল, 'আমিও তাই ভাবছিলাম। কবরটা উঁচু জায়গায় হওয়াতে বেশ সুবিধে হয়েছে। ওটাকে দুর্গ হিসেবে দেখানো যাবে।'

তারানা বাঁ-দিকের লোকটার গলার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। বাইরে ভাবটা গোপন রেখে হাসি-হাসি মুখ করে ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটার গলায় কী ঝুলছে, দেখেছ?'

মুখভাব একটুও না বদলিয়ে ফারুক বলল 'হ্যাঁ। কপাল ভাল, আজ ওটা পরোনি তুমি! সেই কয়েনের অর্ধেকটা।'

'ফারুক।' কান্নার মত আওয়াজ বেরুল তারানার গলায়। 'ওটা আমার বাবার জিনিস। কোন ভুল নেই।'

'হুঁ।'

'বাবাকে খুন করেছে ও।'

প্রাণপণে স্বাভাবিক থাকতে চাইছে তারানা। কিন্তু বারবার ভাবাবেগ এসে ওর গলা কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

ফারুক তারানার হাতের বাজু আঁকড়ে ধরল প্রবল শক্তিতে।

'এখন ব্যাপারটা চেপে যাও, তারানা। কোন রকম সীন ক্রিয়েট কোরো না।' তারানার শ্বাস-প্রশ্বাস গাঢ় হয়ে উঠল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'ওদের জিজ্ঞেস করো, লকেটটা কোথায় পেল!'

ফারুক বলল, 'খুব সাবধান, তারানা! আমরা ডাকাতদের আস্তানায় এসে পড়েছি। এমন কিছু বলা যাবে না, করা যাবে না, যাতে ওদের সন্দেহ হয়। ওদের হাতে কী, দেখেছ? একটাও খেলনা নয়। এতটুকু সন্দেহ হলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে আমাদের ওপর। মাথা ঠাণ্ডা করো। আর একটি কথাও নয়। সোজা ক্যাম্পে চলে যাও। মুজিবর অপেক্ষা করছে ওই উঁচু গেওয়া গাছটার নিচে।'

'আর তুমি?'

'আমি আসছি। একটুও দেরি কোরো না। হাসিমুখে ফিরে যাও। বুঝতে পারছ আমার কথা?'

কান্না চেপে রেখে হাসিমুখে তারানা চারপাশে তাকাল। আরও একবার নজর বুলাল ড. হাশিমের আধখানা কয়েনের দিকে। তারপর এগিয়ে গেল সোজা। ফারুক স্থানীয় ভাষায় দ্রুতবেগে কথা বলছে লোকগুলোর সঙ্গে। তারানা যেতে যেতে লোকগুলোর সমবেত অট্টহাসির শব্দ শুনতে পেল। ফারুকও যোগ দিল সে-হাসির সঙ্গে। বেশ কিছু পরিচিত শব্দও তারানার কানে এল: শহর··· মেমসাহেব···সিনেমা··· নেশা···সুন্দরী···

তার মানে ফারুক বোঝাতে পেরেছে যে কারুর ক্ষতি করার জন্যে ওরা এখানে আসেনি। ওই কবরের সঙ্গেও কোন সম্পর্ক নেই ওদের। শহরের ধনী মেমসাহেব 'জংলী নারী' নামে একটা সিনেমা বানাতে চান। ওই সিনেমার শুটিং-এর স্পট বাছাই করার জন্যে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মোটা টাকার বিনিময়ে ফারুক আর দলবলকে ভাড়া করেছেন।

এ-ও বোঝা যাচ্ছে, দুর্বৃত্তের দলটা কাছাকাছি কোথাও থাকে। কাল বিকেলে গুলির রহস্যটাও এখন পরিষ্কার। ফারুক বা মুরাদ—কেউই না, গুলি করেছে ওই লোকগুলো।

কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে ওর চোখে ভাসছে লকেটটা। ওর প্রিয় কয়েনের অপর অংশ—যেটা সব সময় ড. হাশিমের কাছে থাকত। যেন ওর হৃদয়েরই একটা অংশ গলায় ঝুলিয়েছে বর্বরটা।

মুজিবর কাছে এগিয়ে এল। 'ভয় পাননি তো, মেমসাহেব?'

তারানা উত্তর দিতে পারল না। কান্নায় আটকে গেছে গলা।

তিন

ফারুকের তাঁবুতে অসহায়ের মত বসে আছে তারানা। মশারি খাটানো আছে এখনও। দড়ির গিট খুলে মশারিটা সরাতে চেয়েছিল। কিন্তু মশার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে আবার মশারি খাটিয়ে নিতে হয়েছে। মুজিবর ওকে ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে কোথায় গেল, কে জানে? দলের অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না। মুরাদ, মতি, খায়ের কেউ নেই। লাঠিটা ফেলে এসেছে কবরের কাছে। হঠাৎ একটা সাপ কিংবা অন্য কোন সরীসৃপ হামলা করলে কী করবে ভেবে তারানা ব্যাকুল হয়ে পড়ল। রিভলভার ফারুকের কাছে। মুরাদ রাইফেল নিয়ে গেছে। হয়তো কবরের আশেপাশে লুকিয়ে আছে ওরা। কি দরকার, তারানা বুঝতে পারছে না। আদিবাসী লোকগুলো ফারুকের সঙ্গে জোর খোশগল্প জুড়েছে। ওদের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের প্রশ্ন উঠছে না নিশ্চয়ই!

কিন্তু শত্রুর সঙ্গে কিসের ঠাট্টা-মস্করা? শত্রুর সঙ্গে মানুষের একটাই সম্পর্ক হতে পারে। শত্রুতার সম্পর্ক। লোকগুলো ওর বাবাকে খুন করেছে। একজন গলায় ঝুলিয়েছে তাঁরই প্রিয় লকেট। তারানা মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। শেক্সপীয়রের কথাটা মনে পড়ল। 'শত্রুরাই হচ্ছে আমাদের সত্যিকার বিবেক।' নতুন করে বিবেকের দংশন অনুভব করল তারানা। ফারুকের বালিশের তলা থেকে এক টুকরো কাগজ আর কলম বের করে ম্যাপ এঁকে ফেলল। মুখস্থ হয়ে গেছে ম্যাপটা।

বাইরে একজোড়া পায়ের শব্দ। ফারুক ঢুকল তাঁবুর ভিতরে। তারানা ভেবেছিল, জড়িয়ে ধরবে ওকে। ওর বুকের মাঝে লুকিয়ে থাকবে শিশুটির মত। কিন্তু ফারুকের কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে চিন্তাটা বাদ দিল। সহানুভূতির চিহ্ন ওই মুখে দেখতে পাচ্ছে না তারানা।

'খুব খারাপ জায়গায় এসে পড়েছি···' কি বলবে ভেবে না পেয়ে ফারুক বলল। 'আর একটু হলেই···চরম বিপদ হয়ে যেত।'

'ওরাই খুন করেছে বাবাকে!'

শান্ত সুরে ফারুক বলল, 'না, তারানা।'

'না মানে? তবে কি বলতে চাও, বাবা ভালবেসে ওটা দান করে গেছেন ওকে?'

ফারুক নীরবে তারানার দিকে তাকিয়ে রইল।

'উত্তর দিচ্ছ না কেন? তুমি কীভাবে জানলে, ও বাবাকে খুন করেনি? কেন ওই বর্বর, খুনীগুলোর সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা করছিলে তুমি? কেন গুলি চালালে না?'

ফারুক তারানার হাত ধরল। ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি। 'ওয়ান কোয়েশ্চন অ্যাট আ টাইম, মেমসাহেব। একসঙ্গে বেশি প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমি সব গুলিয়ে ফেলি।'

তারানা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ফারুকের দিকে তাকিয়ে রইল। বাইরে চুলোয় আগুন জ্বলে উঠেছে। নাশতা তৈরি করতে বসেছে মুরাদ।

'ওই লোকগুলো এখানকার আদিবাসী। ওরা ছাড়া এখানে আর কেউ থাকে না। থাকতে পারে না। ওদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কোন লাভ নেই। একজন আদিবাসী মারা গেলে শয়ে শয়ে ছুটে আসবে। ঘিরে ফেলে আমাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। নিশ্চয়ই বোঝো, শুধু আবেগ দিয়ে যুদ্ধে জেতা যায় না। যুদ্ধজয়ের আসল মন্ত্র হচ্ছে যুক্তি আর বুদ্ধি।'

'ওরা অস্ত্র পেল কোথায়?'

'আগেই জেনেছ, জঙ্গল এলাকায় গোলযোগ করছে কিছু চোরাচালানী। ওদের কাছ থেকে অস্ত্র এনে সুন্দরবনের কোন এক দুর্ভেদ্য ঘাঁটিতে জমা করছে আমাদের দেশের কিছু তস্কর। আমার সন্দেহ, ওদেরই কেউ হত্যা করেছে তোমার বাবাকে। একটু আগে যারা তোমাকে ঘিরে ধরেছিল, ওরা তাদের দলের নয়। অস্ত্রগুলো অবশ্য ওদের কাছ থেকেই জোগাড় করেছে।'

তারানার গলা কেঁপে ওঠে। 'তস্কররা আমার বাবাকে মারল কেন? উনি তো রাজনীতি করতেন না! সশস্ত্র বাহিনীর লোকও ছিলেন না তিনি। কেন তাঁকে অমন মর্মান্তিকভাবে খুন হতে হলো?'

'সেটাই খুঁজে বের করতে চেষ্টা করব আমি…'

কথাটা শেষ না করেই তারানার দিকে তাকাল ফারুক। সংশোধন করে বলল, 'আমরা।'

তারানার চোখ ছলছল করে উঠল। 'আধখানা কয়েনওয়ালা লকেট দেখে সত্যিই মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, ফারুক। এখন বুঝতে পারছি, বেফাঁস কিছু বলে বসলে হয়তো ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে যেত। কিন্তু কী করব, ফারুক? মন মানে না। মনে হচ্ছে, এখুনি আবার ছুটে যাই। লোকটার গলা থেকে কেড়ে আনি আমার বাবার প্রিয় লকেট।'

'ওরা ড. হাশিমের কাছ থেকে নেয়নি জিনিসটা।'

তারানা অবাক হলো। 'তার মানে? তুমি কী করে জানলে?'

ফারুক বলল, 'জানি না। শুধু অনুমান করতে পারি। তবে এটুকু জানি, নিজেদের আসল পরিচয় আর উদ্দেশ্য প্রকাশ করলে আমরা শুধু বিপদেই পড়ব। লাভ হবে না কিছুই।'

তারানা কিছু না বলে ফারুকের দিকে তাকিয়ে রইল। দ্রুত চিন্তা করছে। ফারুক তারানার পিঠে হাত রাখল। তারপর জড়িয়ে ধরল ওকে।

'তোমাকে হিরণ পয়েন্টে রফিক নওয়াজ সাহেবদের বাসায় রেখে আসি, কি বলো?'

তারানার মুখ সাদা হয়ে গেল। তারপর ভাবল, ওর দিক থেকে যতই আকস্মিক হোক, ফারুকের পক্ষ থেকে এ-প্রস্তাব তো মোটেই অস্বাভাবিক নয়! তারানার মুখে কথা যোগাচ্ছে না।

ফারুক আবার বলল, 'তোমার কাজ তো হলো! কাঙ্গায় এসেছ। বাবার কবর খুঁজে পেয়েছ। বিদায় জানিয়েছ তাকে। এবার নিশ্চয়ই তোমার যাবার সময়

হয়েছে!'

তারানার গলায় আর্তনাদের স্বর। 'না, ফারুক। এখনও আমার কাজ বাকি। যাবার সময় হয়নি। এখনই বিদায়ের কথা বোলো না। প্লীজ, ফারুক। তুমি আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছ। তোমার দলের সবাইকে আমি কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু দোহাই তোমাদের, আরও একটু কষ্ট করো আমার জন্যে। কাজ না সেরে যাব না আমি।'

ফারুক চোখ পিটপিট করল। 'এসব কী বলছ তুমি? কী কাজ বাকি?'

'ফারুক, আমার···বিশ্বাস···বিশ্বাস কেন, আমি জানি···বাবা বিজনপুরে একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন।'

তারানাকে আলিঙ্গন মুক্ত করে ফারুক সরে বসল। দু'হাতে মুখ মুছল। যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তারানার কথা শুনতে শুনতে, এমনি সুরে বলল, 'তারানা, দেয়ার ইজ নো লস্ট সিভিলাইজেশন হিয়ার ইন কাঙ্গা।'

তারানার দু'চোখ জ্বলে উঠল। 'ইউ নেভার নো।'

ফারুক ক্লান্ত স্বরে বলল, 'যদি অমন কিছু এখানে থাকেও, তিনি খুঁজে পাননি। তার আগেই খুন হয়েছেন।'

'তিনি খুন হয়েছেন! এখন বলছ এ-কথা! কিন্তু আগে কিছুতেই স্বীকার করতে চাওনি। সব সময় বলেছ, "তিনি মারা গেছেন।" '

'হ্যাঁ। তোমাকে সুস্থ শরীরে, স্বাভাবিক মেজাজে কাঙ্গা পর্যন্ত নিয়ে আসতে চেয়েছি, তাই।'

তারানা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'যা-ই হোক, আমি জানি, ওই আবিষ্কারই ওঁর মৃত্যুর কারণ।'

'জানো না। এটা তোমার বিশ্বাস।'

মুরাদ দুটো প্লেট হাতে নিয়ে তাঁবুর দরজায় উঁকি দিল। ফারুক প্লেটগুলো ভেতরে টেনে নিল। 'নাও, খাও। তোমার খিদে পেয়েছে।'

তারানা প্লেট সরিয়ে রেখে বালিশের তলা থেকে ভাঁজ-করা কাগজ বাড়িয়ে ধরল ফারুকের দিকে।

'ম্যাপটা তোমার চেনা মনে হয়, ফারুক?'

ফারুক স্তম্ভিত। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাকিয়ে রইল কাঙ্গার ম্যাপের দিকে। মুখে কথা জোগাচ্ছে না।

তারানা বলল, 'এটা ড. আবুল হাশিমের দেয়া ম্যাপ। উনি জানতেন, বিজনপুরের ধ্বংসাবশেষ কাঙ্গার কাছেই আছে। কেউ ওঁকে বিশ্বাস করেনি।'

ফারুক তারানার মুখের দিকে তাকাল। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। 'এ তো তোমার নিজের হাতে আঁকা।'

তারানা বলল, 'এটা আসলে বাবার পাঠানো বিজনপুরের ম্যাপ, ফারুক। তোমার-আমার বিশ্বাস বা অবিশ্বাসে কিছু যায়-আসে না। আমি মুখস্থ করে ফেলেছিলাম ম্যাপটা। পরে নিজেই এঁকেছি।'

ফারুক ম্যাপটা খুঁটিয়ে লক্ষ করল আবার। 'হুবহু মনে রাখতে পেরেছ?'

তারানা বলল, 'হ্যাঁ। যক্ষের ধনের মত এতদিন স্মৃতিতে আগলে বেড়াচ্ছিলাম

এটা।'

'আগে বলোনি কেন?' ফারুকের সুরে প্রশ্ন না অভিযোগ, তারানা বুঝতে পারল না।

'আগে বললে তুমি কিছুতেই আমাকে সঙ্গে নিতে রাজি হতে না। তারপর···যখন বুঝতে পারলাম···বলা যায়, তখন উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষায় রইলাম।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফারুক বলল, 'সে-সময় এখনও আসেনি, তারানা। গোটা কাঙ্গা এখন অশান্ত। আদিবাসীদের সঙ্গে অনেক আলাপ হলো। এখন বিজনপুরের সন্ধানে বেরুনো আত্মহত্যারই সামিল হবে।'

হতাশায় মুষড়ে পড়ল তারানা।

'তারানা, যুক্তিবাদী হও। কাঙ্গায় গোলমাল চলছে। এ-ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে হবে। আমার অনেক কাজ। কিন্তু সেটা তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সারা যাবে না। তোমার এতটুকু ক্ষতি হতে দিতে পারি না আমি। তার চেয়ে তোমাকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে আসি। হিরণ পয়েন্টে ক'টা দিন থাকতে কষ্ট হবে তোমার। ডোপা আছে। ওর সঙ্গে বেশ ভাব জমেছে তোমার, মনে হলো। কয়েকটা দিন তুমি ওখানেই থাকো।'

তারানা মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। ওর চোখে দৃঢ় প্রত্যয়ের ছাপ।

'"বিজনপুর" আছে, ফারুক। ওটা খুঁজে বের করতে আমার দেরি হবে না। আমি একাই পারব। শুধু যদি একজন লোক সঙ্গে দাও···আর একটা অস্ত্র···'

ফারুক তারানার হাত ধরল। 'তুমি অবুঝ হয়ে গেছ, তারানা। কিছুতেই বাস্তব অবস্থা বুঝতে চাইছ না। ম্যাপটা প্রমাণ করে না যে ড. হাশিম "বিজনপুরের" অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। যদি করেও থাকেন, এত সহজে তুমি তা পেয়ে যাবে, এটাও যুক্তির কথা নয়। একটু আগে একটা বিপদ থেকে রেহাই পেয়েছ। সবসময় পাবে, এমন কোন কথা নেই। আমি নিজে যথেষ্ট ব্যস্ত থাকব। তোমাকে সঙ্গ দিতে পারব না।'

তারানা রেগে আগুন হলো। 'কিন্তু আমিও এমন সুযোগ রোজ রোজ পাব না। হয়তো দ্বিতীয়বার কাঙ্গায় আসারই সুযোগ হবে না। আমি এতদিন ধরে এই ম্যাপ বুকে আগলে বেড়াচ্ছি। এই সেই কাঙ্গা, যার কাছেই আছে সেই ঐতিহাসিক নগরীর ধ্বংসাবশেষ। বাবা আবিষ্কার করেছিলেন। ম্যাপ এঁকে পাঠিয়েছিলেন আমার কাছে। জায়গাটা খুঁজে বের করার চেষ্টা না করেই চলে যাব আমি! অসম্ভব।'

'তারানা, এমনও হতে পারে, গোটা ব্যাপারটাই আলেয়া। অকারণ ঝুঁকি নিয়ে প্রাণ খোয়ানোর কোন মানে হয় না। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট সাহেবকে কথা দিয়েছি, নিরাপদে মংলায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব তোমাকে। ওই কথাটা আমাকে রাখতে দাও।'

'বিজনপুরে আমি যাবই। বাঘ, সাপ আর অদিবাসীদের ভয়ে পিছিয়ে যাব, কখ্খনো ভেব না।'

ফারুক বলল, 'জোর করতে আমাকে বাধ্য কোরো না।'

'মানে?'

'দরকার হলে ওয়াজেদের মত হাত-পা বেঁধে তোমাকে হিরণ পয়েন্টে নিয়ে যাব।'

'তারপর?'

'যোগাযোগ করব কামার ফরিদ আর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। তাঁদের হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে নিজের কাজে ফিরে আসব।'

'ফারুক···তুমি···তুমি একটা···' কান্নায় ভেঙে পড়ল তারানা। 'তুমি··· এতখানি বাড়তি কষ্ট করতে পারবে, অথচ আমার সঙ্গে···এই···ম্যাপটা ধরে··· বিজনপুর খুঁজে বের করতে পারবে না!'

'বিজনপুর ড. আবুল হাশিমের স্বপ্নবিলাস, তারানা। এটা ওঁর পেশা ছিল, তাই মানিয়েছে। তোমাকে মানায় না।'

'শুধু একটা দিন···ফারুক। কথা দিচ্ছি, একদিনের চেষ্টায় যদি ওটা না পাওয়া যায়, আর কোনদিন বিরক্ত করব না তোমাকে।'

ফারুকের মুখে শুকনো হাসি। 'বিরক্ত করা কিংবা বিরক্ত হওয়ার সুযোগই আমরা পাব না, তারানা। তার আগেই আদিবাসী কিংবা অস্ত্রধারী দুষ্কৃতকারীরা আমাদের মাটিতে পুঁতে ফেলবে। ড. হাশিমের ভাগ্য বরণ করার সাধ আমার নেই। আমার কবরটা দেখার জন্যে অন্তত কামার ফরিদ একবার আসবে। তোমারটা দেখার জন্যে কেউ আসবে বলে মনে হয় না। মত পাল্টাও, তারানা।'

তারানা ছলছল চোখে ফারুকের দিকে তাকিয়ে রইল।

'ব্যাগ গুছিয়ে নাও, লক্ষ্মীটি।'

তারানা বলল, 'আমি···তোমার কাছে···চিরঋণী থাকতে চেয়েছিলাম।'

ফারুক তারানাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। চুমু খেল ঠোঁটে। বলল, 'মানুষ মানুষকে আসলে কিছু দিতে পারে না, তারানা। আমি চাই না, কেউ আমার কাছে কৃতজ্ঞ থাক। বিজনপুর আবিষ্কার করে ড. আবুল হাশিম কি আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন?'

তারানা চোখ মুছে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল আনন্দে। 'ফারুক! তুমি···তুমি তাহলে বিশ্বাস করো, "বিজনপুর" আছে!'

ধরা-পড়া গলায় ফারুক বলল, 'আমি ঠিক তা বলিনি।'

'যা-ই বলো, আমি বুঝেছি, ফারুক। তুমি আসলে বাবার আবিষ্কারের ব্যাপারটা অস্বীকার করো না। কেন মিছেমিছি কষ্ট দিচ্ছ আমাকে?'

ফারুক অসহায়ের মত তারানার দিকে তাকিয়ে রইল। 'তোমাকে হারাতে চাই না আমি। আদিবাসীরা তোমাকে অলরেডি সন্দেহের চোখে দেখছে। আবার যদি কোন ব্যাপারে ওদের সন্দেহ হয়, ভাবতেই পারছি না, তোমাকে নিয়ে ওরা কী করবে!'

তারানা ফারুকের চিবুকে কনিষ্ঠা ছোঁয়াল। 'আচ্ছা, ফারুক, একটা কথা কেন ভাবছ না তুমি? "বিজনপুর" তো তোমার-আমার সবার প্রশ্নেরই উত্তর হতে পারে! পারে না?'

ফারুককে চিন্তিত মনে হলো না। তারানা বুঝল, এ-ব্যাপারটাও ও ভেবেছে। শুধু তারানার কাছে স্বীকার করতে চায় না, এ-ই যা। ফারুক জানে কাঙ্গার

উপজাতীয় আর অস্ত্রধারী দুষ্কৃতকারীদের মধ্যে যোগাযোগ আছে। হয়তো বিজনপুরের সন্ধান পেয়েছে ওদের কেউ, কিংবা ওরা সবাই। নিভৃত ওই জায়গাটা ওরা ব্যবহার করে গোপন যোগাযোগকেন্দ্র হিসেবে। হয়তো আরও কোন বড়, গুরুত্বপূর্ণ, গোপন কাজে। কিন্তু তাতে কী? তারানাকে সঙ্গে নিয়ে 'বিজনপুর' খুঁজে বার করতে যাওয়ার মানে হচ্ছে জেনেশুনে সাপের গায়ে পা দেয়া। ফারুক একা ঝুঁকি নেবে। তারানাকে এর সঙ্গে জড়াতে দিতে পারে না।

তারানা ভুল বুঝছে, জানে ফারুক। তারানাকে এখান থেকে সরানোর জন্যে ওর জেদ তারানার কাছে শুধুই 'পুরুষসুলভ প্রভুত্ব আর অহঙ্কার'। কিন্তু ও বুঝতে চাইছে না, মানুষ যাকে ভালবাসে, তাকে সম্পূর্ণভাবেই পেতে চায়। তার ওপর প্রবল অধিকারবোধ করে সে। এটা একজন পুরুষের বেলায় যেমন, নারীর ক্ষেত্রেও তেমন সত্য। একজন সেনাপতির দেশজয়ের অনুভূতি আর প্রেমিক পুরুষের কাছে একজন নারীকে জয় করার অনুভূতি সমান।

তারানা রুটির এক কোনা ছিঁড়ে মুখে গুঁজল।

'আর ঝগড়া করতে পারছি না,' আপসের সুরে ফারুক বলল, 'ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। লক্ষ্মী মেয়ের মত জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।'

'তারপর?'

'হিরণ পয়েন্টে রওনা হচ্ছি আমরা। ন'টা বাজে। একটানা গেলে বিকেল নাগাদ পৌঁছে যাব।'

'আমি যাচ্ছি না, ফারুক।'

'মানে?'

তারানা হামাগুড়ি দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। পর্দা তুলে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। ফারুকও বেরুল ওর পিছন পিছন।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'জানি না। কিন্তু তাঁবুর ভিতরে আর নয়। তোমার দলে আর থাকছি না আমি।'

বড় তাঁবুর পাশ দিয়ে হন হন করে হেঁটে জঙ্গলের কাছে পৌঁছল তারানা। ফারুক দ্রুত ওর পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

'তারানা, বাড়াবাড়ি কোরো না। রাগিয়ো না আমাকে।'

তারানা বলল, 'তা হলে আমার সঙ্গে থাকো।'

ফারুক কিছুক্ষণ নীরব রইল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'কাঙ্গায় এসে এমন সৃষ্টিছাড়া আচরণ করবে জানলে কখনোই নিয়ে আসতাম না তোমাকে।'

'বিশ্বাস করো, অন্য কাউকে রাজি করাতে পারলে কিছুতেই তোমার ঘাড়ে চাপতাম না আমি।'

ফারুক হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। 'মুরাদ!'

'জ্বে, সাহেব!'

'তাঁবু গুটাও। মুজিবর, মতি, খায়েরকে বলো। হিরণ পয়েন্ট যাব আমরা। কুইক!'

মুরাদ চুলোয় পানি ঢালল। ব্যস্ত হয়ে পড়ল এফ এণ্ড এফ লিমিটেডের অনুগত

কর্মচারীরা। তারানা এগিয়ে গেল। জঙ্গলের ভিতর ঢুকে একটা গাছের নিচে বসে পড়ল।

ফারুক ধীর পায়ে ওর কাছে এসে দাঁড়াল।

'তোমার ব্যাগ সরিয়ে নাও, তারানা। তুমি যখন থাকছ না আমাদের সঙ্গে, তখন তোমার ব্যাগ বইতে আমাদের লোকজন নিশ্চয়ই রাজি হবে না।'

তারানা সরোষে উঠে দাঁড়াল।

'তোমার মত একগুঁয়ে পুরুষ আমি কখনও দেখিনি।'

ফারুকের ঠোঁটের কোণে হাসি। 'তোমার মত শান্ত, সুবোধ বালিকার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক, তাই না?'

'তুমি···তুমি···' রাগে প্রায় বোবা হয়ে গেছে তারানা।

ফারুক আরও একটু এগিয়ে এল। পিঠে এক হাত আর নিতম্বের নিচে অন্য হাত দিয়ে পাঁজাকোলা করে তারানাকে তুলে নিল ফারুক। নরম তুলতুলে এই শরীরে এত কঠিন রাগ!

তারানা হাত-পা ছুঁড়তে লাগল। 'ছেড়ে দাও, ফারুক। জোর কোরো না। তোমার সঙ্গে হিরণে ফিরে যাবার চেয়ে আমি ওই আদিবাসীদের হাতেই প্রাণ দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে ওকে কোল থেকে নামিয়ে ফারুক ঘুরে দাঁড়াল। বিশ্রীভাবে হাসল। 'ওদের এত মনে ধরেছিল তোমার, বুঝতে পারিনি। এ-ও বুঝিনি, সকালবেলা এক চমৎকার অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ থেকে তোমাকে বঞ্চিত করেছি। ঠিক আছে, মাফ করে দিয়ো।'

দ্রুত পায়ে হেঁটে ক্যাম্পে ফিরে গেল ফারুক। আরও দ্রুত হাতে সাহায্য করতে লাগল সঙ্গীদের। তারানার তাঁবু খোলা হয়ে গেছে। সেটা গুটিয়ে বাকসে ভরল ফারুক। খোলা আকাশের নিচে পড়ে রইল তারানার নাইটি, বালিশ, ব্যাগ, আর অন্য দু-চারটে ব্যক্তিগত জিনিস।

খায়ের ভয়ে ভয়ে একবার জঙ্গলের দিকে আর একবার 'সাহেবের' দিকে তাকাল। তারানা এগিয়ে এল। পাথরের প্রতিমার মত দাড়িয়ে রইল প্রাঙ্গণের এক পাশে।

ফারুক বলল, 'মেমসাহেবের জিনিসগুলো থাক, খায়ের। ওগুলো উনি সময়মত তুলে নেবেন।'

প্যাকিং-এর কাজ শেষ। রওনা হবার জন্যে তৈরি সবাই। তারানা ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। সত্যিই চলে যাচ্ছে নিষ্ঠুর মানুষটা। তারানা ভেবে পেল না, একা কীভাবে 'বিজনপুর' খুঁজে বার করবে! সকালবেলায় কবরের কাছে যে লোকগুলো ঘিরে ধরেছিল, ওদের কথা মনে পড়ল। শিউরে উঠল সে।

দলের সহকর্মীরা আগেই রওনা হয়ে গেছে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সবার শেষে দুটো ভারী ব্যাগ হাতে ফারুক পা বাড়িয়েছে। ভাঙা গলায় তারানা ককিয়ে উঠল, 'ফারুক।'

ফারুক ঘুরে দাঁড়াল। 'যাবে আমাদের সঙ্গে?'

তারানা কথা বলতে পারছে না। মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। ফারুক ব্যাগ

নামিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল।

'শুধু···একটা···একটা অনুরোধ, ফারুক। বাবার কবরের কাছে একটিবার যেতে দাও। শুধু যাব আর আসব। ফুফু বিদায় জানাতে বলেছিলেন। ভুলে গেছি।'

'বেশ।'

চার

তারানা চোখের আড়াল হবার সঙ্গে সঙ্গে ফারুক ইঙ্গিতে খায়েরকে ডাকল। 'ব্যাগগুলো রইল, লক্ষ রেখো' বলেই নিঃশব্দে তারানার পিছু পিছু এগিয়ে গেল ফারুক। কিছুতেই ওকে একলা যেতে দেয়া যায় না। আদিবাসীরা হয়তো কাছেই আছে। দ্বিতীয়বার ওকে কবরের কাছে যেতে দেখলে সন্দেহটা বদ্ধমূল হবে। এবার ওদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া তারানার পক্ষে কঠিন হতে পারে।

খায়ের বলল, 'আমরা নৌকার কাছে থাকব।'

ফারুক ঘাড় ফিরিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। মেমসাহেবের জিনিসগুলোও নিয়ে যাও। উনি দয়া করে আমাদের সঙ্গে যেতে চেয়েছেন।'

মাথা নিচু করে হাসি গোপন করল খায়ের।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফারুক কবরের কাছে পৌঁছল। কবরের গায়ে কয়েকটা ইট সাজিয়ে রেখেছে নৌসেনারা। ওই ইটগুলো ছাড়া আর কোন প্রমাণ নেই কবরের। ফারুক একটু দূরে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল, তারানা একটা বড় পেরেকের সাহায্যে প্রাণপণে আঁচড় কেটে চলেছে ইটগুলোর গায়ে। লিখছে দুটো অক্ষর: আ. হা.।

ফারুকের বুকের ভিতর টনটনিয়ে উঠল।

কপালের ঘাম মুছে উঠে দাঁড়াল তারানা। চমকে ফিরে তাকাল।

ফারুক বলল, 'আমি একটু হাত লাগাতে পারি? মৃত্যুর তারিখটা লিখে রাখি!'

তারানা কিছু না বলে পেরেকটা ফারুকের হাতে দিল। ফারুক ইটের গায়ে আঁচড় কেটে তারিখ লিখতে শুরু করল। তারানা পাশে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল কবরের দিকে। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেন যেন আড়চোখে তাকাল ফারুকের দিকে। বুঝতে চেষ্টা করল, ঠিক কী ভাবছে ও? পাহারা দিতে এসেছে 'বেয়াড়া মেয়েলোকটাকে'? নাকি অন্য কিছু?

ফারুকও কাজ করতে করতে ভাবছে, সত্যিই ওর জেদ কমেছে কিনা। যারা চট করে রেগে যায়, তারা বেশিক্ষণ রাগ ধরে রাখতে পারে না। অবশ্য রাগ ধরে রাখলেও করার কিছু নেই, ফারুক ভাবল। যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে পালানো যায়, ততই মঙ্গল। আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আদিবাসীরা। ওদের হাতে অস্ত্র। রাইফেল, ছোরা। অশিক্ষিত মানুষ হাতে অস্ত্র পেলে জানোয়ারের চেয়েও হিংস্র হয়ে ওঠে। ফারুক বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে, তারা ওদের কোন ক্ষতি করবে না। কিন্তু ওরা একেবারে নির্বোধ নয়। নিশ্চয়ই আগন্তুক দলের গতিবিধি নজরে রেখেছে। যে-কোন সময় ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে অতর্কিতে।

তারানার কথাগুলো মন থেকে মুছে ফেলতে পারছে না ফারুক। ক্ষণিকের জন্যে দুর্বল হয়ে পড়ে ফারুক। তারানাকে রফিক নওয়াজের আশ্রয়ে রেখে ও

যোগাযোগ করবে কামার ফরিদের সঙ্গে। ফরিদ কথা বলবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। তারপর ওদের পরামর্শ আর সাহায্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে 'বিজনপুরের' ব্যাপারে।

এই মুহূর্তে আদিবাসীরা এখানে হাজির হলে কি বলবে, ভেবে নিয়েছে ফারুক। বলবে, শুটিং-এর জন্যে জায়গাটা চিহ্নিত করে রাখছে, যাতে পরে এসে খুঁজে পায়।

কাজ শেষ করে ফারুক উঠে দাঁড়াল। আঁকড়ে ধরল তারানার কনুই। গলার স্বর যথাসম্ভব নরম করে বলল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। চলো।'

ফারুকের পেছন পেছন হাঁটতে শুরু করল তারানা। কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকাল ড. আবুল হাশিমের কবরের দিকে। বুকের ভিতর থেকে কান্না ঠেলে উঠছে। মনে মনে বলল, 'বাবা, মন খারাপ কোরো না, আমি আবার আসব। নিশ্চয়ই আসব।'

মুজিবর এঞ্জিন স্টার্ট দিল। পশ্চিমে যাওয়া যাবে না। ওদের যেতে হবে পুবদিকে। কাঙ্গা বাঁয়ে রেখে বেশ কিছুদূর এগিয়ে ওরা মোড় নেবে উত্তরে, ঢুকে পড়বে বাংড়া নদীতে। একটা দ্বীপ ঘুরে চলে আসবে কাঙ্গা নদীতে। তারপর সোজা পশ্চিমে কিছুদূর গেলেই হিরণ পয়েন্ট।

সামনে অনন্ত সাগর। তারানার কেবলই মনে হয়, এ-সাগর পাড়ি দিয়ে কোনদিন তীরে পৌঁছতে পারবে না। হিরণ পয়েন্টে রফিক নওয়াজের বাড়িতে আশ্রয় জুটবে। নিরাপত্তার অভাব হবে না। কিন্তু বাবাকে দেয়া অঙ্গীকার মিথ্যে হয়ে যাবে। তারপর ফারুক ওর কাজ শেষ করবে। ওকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবে মংলায়। মংলায় থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবে তখন। তারানা রওনা হবে খুলনার দিকে। খুলনা থেকে যশোর। বিমানের টিকিট কাটবে। আধঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে ঢাকা। পুরানো কর্মস্থলে ফিরে যাবে। আক্কাস ফিরদাউস রাজার চিত্রনাট্যে সুস্থ হয়ে উঠবে নায়িকা। টেলিভিশন সেটের সামনে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে উঠবে ভক্তরা: 'তারানা···তারানা হাশিম···ভাল হয়ে গেছে। ওই দেখো। সত্যিই বেচারাকে দুর্বল দেখাচ্ছে···'

'কী ভাবছ?'

তারানা চমকে উঠল।

'রাগ করো, আর যা-ই করো, বাঁচিয়ে সুস্থ শরীরে কাঙ্গা থেকে ফিরিয়ে এনেছি। একটা ধন্যবাদ আমার পাওনা।'

তারানা উত্তর না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে রইল।

ফারুক বলল, 'এখন বুঝবে না। জীবনটা আবার যখন উপভোগ্য হয়ে উঠবে, আমার উপকারের কথা মনে পড়বে তখন।'

তারানা এবারও কিছু বলল না। ফারুককে বুঝতে চেষ্টা করছে। এত জেদী, একগুঁয়ে মানুষ ও কখনও দেখেনি। সুন্দর চোখের অশ্রু দেখে প্রেসিডেন্টের মত গলে যাবার লোক নয় ফারুক। ওর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু চাপিয়ে দেয়া খুব কঠিন। কিন্তু তারানা নিজেও কম জেদী নয়, সেটা প্রমাণ করে দেবে।

অনেকক্ষণ সবাই নীরব রইল। একটানা বাতাসের গোঙানি আর এঞ্জিনের শব্দ

ছাড়া অন্য সবই নীরব। আকাশে মেঘ দেখা যাচ্ছে। মুজিবর ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

তারানা নিজেই একসময় কথা বলল। 'কবে তুমি কাঙ্গায় ফিরবে ফারুক?'

ফারুক একটু ভাবল। 'কিছুই বলা যায় না। আমার অন্য কাজও আছে, তুমি তো জানো! সেগুলো আগে সারতে হবে। তারপর প্রেসিডেন্ট আর আমার বিজনিস পার্টনার যা ভাল মনে করেন, তাই হবে।'

তারানা বলল, 'জানি। কিন্তু যেদিনই তুমি আসো, যদি কথা দাও, আমাকে সঙ্গে নেবে, আমি অপেক্ষায় থাকব।'

'কোথায় অপেক্ষা করবে?'

'এখানে। ধরো হিরণ পয়েন্ট···কিংবা মংলায়···'

শান্ত গলায় ফারুক বলল, 'না, তারানা। কতদিন লাগবে, কেউ জানে না। অতদিন এখানে অপেক্ষায় থাকার কোন মানে হয় না। তোমাকে ঢাকায় ফিরে যেতে হবে। তোমার ফুফু নিশ্চয়ই অপেক্ষা করছেন তোমার জন্যে। অপেক্ষা করছে তোমার টিভি দর্শক, সহকর্মীরা। তোমার তো এক পরিপূর্ণ জীবন আছে, তাই না?'

তারানা অবাক হয়ে ফারুকের দিকে তাকিয়ে রইল। কথাটা ওকে আঘাত দিয়েছে, জানে ফারুক। যাত্রাপথে ওদের দু'জনের মনের মাঝে এক মধুর স্বপ্নের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু ফারুক বাস্তব অবস্থার কষ্টিপাথরে এর ভবিষ্যৎ যাচাই করতে চায়। দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসে এখানকার সবকিছু ওর ভাল লাগছে। কিন্তু এ-ভাললাগা বেশিদিন টিকবে না। অস্থির হয়ে পড়বে ঢাকায় ফিরে যাবার জন্যে। তার চেয়ে ও ঢাকায় ফিরে যাক। প্রথম প্রথম কিছুদিন খুবই কষ্ট হবে, কিন্তু কী করা যাবে? শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবন সব বোঝাই বইতে পারে।

তারানা দৃঢ় স্বরে বলল, 'যতই দেরি হোক, আমি অপেক্ষা করব।'

বাতাসের গতি বাড়ছে। বাড়ছে ঢেউয়ের উচ্চতা। বনদেবী প্রবলভাবে দুলছে।

মুজিবর স্টিয়ারিং হুইল ফারুকের হাতে দিয়ে কিট বক্স থেকে একটা পুরানো, অব্যবহৃত ট্রানজিস্টর রেডিও বার করল। বেশ কিছুক্ষণ লাগল সেটাকে ঝেড়ে-মুছে ব্যবহারোপযোগী করতে। নব ঘোরাতে ঘোরাতে এক সময় পেয়ে গেল রেডিও বাংলাদেশ খুলনার অনুষ্ঠান। সৈয়দ মতিনের ভরাট গলার ঘোষণা: 'এখন শুনবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত··· শিল্পী সুশান্ত সরকার···গানের প্রথম ক'টি কথা "যদি প্রেম দিলে না প্রাণে···" ।'

মুজিবর নব ঘোরাতে যাচ্ছিল। বাধা দিল ফারুক।

'আল্লাতালা সত্যিই তোমার প্রাণে প্রেম দেননি।'

মুজিবর মাথা দুলিয়ে ফারুকের কথা মেনে নিল। কিন্তু তারপর যে আঘাত হানল, ফারুক তার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। 'এত ঝগড়া-ঝাটি করে পোষাবে না, সাহেব। এ-ই ভাল আছি।'

ভীষণ হাসি পেল তারানার।

খবর শুরু হয়েছে। প্রথম পঁচাত্তর শতাংশ সময় জুড়ে শুধু দেশ-নেতাদের খবর। শেষের পঁচিশ ভাগে দেশের কিছু কিছু খবর পাওয়া গেল। সবার শেষে

আবহাওয়ার খবর:

'…বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণে যে-নিম্নচাপ ঘনীভূত হচ্ছিল, তা হঠাৎ উত্তরে এগিয়ে এসেছে। আজ দুপুর নাগাদ খুলনা ও বরিশাল জেলার দক্ষিণে আঘাত হানতে পারে। উপকূলীয় এলাকায় সব মাছ-ধরা ট্রলার ও অন্যান্য নৌযানকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মংলা সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর ও বরিশালসহ অন্যান্য নদীবন্দরকে পাঁচ নম্বর বিপদ সংকেত দেখিয়ে যেতে বলা হয়েছে। আবহাওয়া বিভাগ জানায়, উপকূলীয় এলাকাগুলোতে চার থেকে পাঁচ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস হতে পারে। এসব জায়গা থেকে লোকজন সরিয়ে নেবার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ-সময় বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায়…'

ফারুক মুজিবরের দিকে তাকাল। 'আবহাওয়ার অবস্থা এত খারাপ, তুমি কোন খবর রাখো না। কেমন ক্যাপ্টেন তুমি?'

'আমি মাঝির চেয়ে বেশি দাম পাই না, সাহেব।'

মুজিবর মাথা নিচু করে আছে, প্রায় বুকের সঙ্গে লেগেছে চিবুক। কিন্তু গলার স্বরে দৃঢ়তা।

ফারুক কটমট করে তাকাল ওর দিকে। 'একটা ট্রানজিস্টর রেডিও তো পেয়েছ! ওটা কাজে লাগাতে পারো না?'

দেখতে দেখতে ঘন মেঘে আকাশ আঁধার হয়ে এল। সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মত উঁচু ঢেউ উঠছে। বনদেবী মোচার খোলার মত নাচছে। কখনও হুমড়ি খেয়ে পড়ছে দুটো ঢেউয়ের মাঝখানে। পাটাতনের ছিদ্রে উঁকি দিয়ে মতি বলল, 'পানিতে খোল ভরে গেছে।'

মুজিবর হুকুম দিল, 'পানি সেচতে শুরু কর।'

মতি আর খায়ের দুটো প্লেট নিয়ে খোলের ভিতরে নেমে গেল।

আর দেরি করা যায় না। ফারুক নৌকা ঘুরিয়ে নিতে বলল মুজিবরকে।

তারানা জলোচ্ছ্বাসের গল্প শুনেছে, কখনও চোখে দেখেনি। এই প্রলয়কাণ্ড চোখে দেখে যত না ভয়, তার চেয়ে বেশি জাগল বিস্ময়। কূলের কাছে এসে এর আরও ভয়াবহ রূপ দেখতে পেল ওরা। বিরাট ঢেউগুলো সগর্জনে ছুটে যাচ্ছে, প্রবল আঘাত হানছে কূলের গাছপালা আর মাটির ওপর। যেন কতকালের আক্রোশ!

'বাতাসের বেগ আরও বাড়বে,' সবাইকে সাবধান করে দিল মুজিবর।

মালপত্রের গাদা থেকে একটা ছোট বস্তা ছিটকে পড়ল। চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল সেটা।

'ওতে কয়েকটা হাঁড়ি-বাসন আর চিনি ছিল!' কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল মুরাদ।

ফারুক সান্ত্বনা দিল। 'ভেবো না, যদি প্রাণে বেঁচেও যাই, চা খাবার মত অবস্থা থাকবে না। সামনের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ?'

সবাই দেখতে পাচ্ছে। নৌকা ভেড়ানোর জায়গা নেই। উপকূল ডুবে গেছে। জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়েছে পানি। মতি, খায়ের আর মুরাদ বিড়বিড় করে দোয়া পড়তে শুরু করল। তারানা কিছু ভাবতে পারছে না। ভয় লোপ পেয়েছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের সাদা ফেনার সঙ্গে ধেয়ে আসছে মৃত্যু, ওর মনে রেখাপাত করছে না।

একটু আগে জীবনটাকে হঠাৎ শূন্য মনে হয়েছিল। এরকম মানসিক অবস্থায় মৃত্যুকে ভয় পাওয়া যায় না।

খোলের পানি সেচতে সেচতে মতি আর খায়ের হয়রান হয়ে গেছে। দশ মিনিট কষ্ট করে যেটুকু পানি ফেলে দেয়, ঢেউয়ের একটা আঘাতে কয়েক সেকেণ্ডে তার চেয়ে বেশি ঢুকে পড়ে। মুরাদ চেষ্টা করছে মালপত্র বাঁচাতে। বিশেষ করে চাল-আটা শুকনো রাখতে না পারলে উপোস করতে হবে। বিছানা ভিজে গেলেও বিপদ। এত চেষ্টা সত্ত্বেও ঢেউয়ের ধাক্কায় ভিজে গেল একটা বস্তা। আটা গেল!

একটা কাঠের বাকসের ভিতর ছিল কার্তুজ আর কিছু দরকারী কাগজপত্র। সেটা পড়ে গেল পানিতে।

'ওটা হারালে চলবে না, মুজিবর। টেক কেয়ার।'

কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে প্যান্ট-শার্ট খুলে লাইফ জ্যাকেট পরে পানিতে নেমে পড়ল ফারুক। বেশি দূরে যাবার আগেই বাকসটা ধরে ফেলল। মুজিবর নৌকার মুখ ঘুরিয়ে পৌঁছে গেল ফারুকের কাছে।

তারানা চিৎকার করে উঠতে গিয়েছিল। বাধা দিল মুরাদ। 'ভয় পাবেন না, মেমসাহেব। ওনার কিচ্ছু হবে না।'

এক হাতে বাকস, অন্য হাতে নৌকার গলুইয়ের কাছটা আঁকড়ে ধরল ফারুক। ও নৌকায় উঠে না বসা পর্যন্ত স্বস্তি পেল না তারানা। লোকটাকে প্রাণপণে ঘৃণা করতে চেয়েছে। কিন্তু ওর নিরাপত্তার ব্যাপারটা ভীষণ দুশ্চিন্তায় ফেলেছে তাকে, ভেবে অবাক হলো।

একটা ছোট খালের ভেতর ঢুকে পড়ল ওরা। সমুদ্রের পানিতে উপচে ে হ খালটা। কয়েকটা হরিণের মৃতদেহ দেখে তারানা কেঁদে ফেলল। কাঙ্গায় আসার পথে নৌকা থামিয়ে ফারুকের হরিণ দেখানোর কথা মনে পড়ল। ফারুকের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করল, মৃত হরিণের দলটা দেখে ওর মনে কোন ভাবান্তর হয়েছে কিনা। বোঝা যাচ্ছে না। নৌকার মালপত্রের আশা বাদ দিয়েছে। এখন শুধু ভাবছে নিজেদের কথা। বাঁচতে হবে। রক্ষা করতে হবে নৌকাটাকে। এই গহন অরণ্যে নৌকা ছাড়া বাঁচতে পারবে না ওরা।

মতি আর খায়েরের সঙ্গে পানি সেচার কাজে হাত দিল ফারুক। তারানা পেছনের আসনে বসে দেখতে পাচ্ছে ওর শরীরের শক্ত গাঁথুনি। যন্ত্রের মত নড়ছে পেশি। ছন্দপতন হচ্ছে না একবারের জন্যেও। হঠাৎ এই বিপদের মধ্যেও লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তারানা। মনে পড়ল কাঙ্গায় এসে পৌঁছনোর আগের কয়েকটা দিনের কথা।

লোকটাকে ঘৃণা করতে চায় তারানা। কিন্তু কিছুতেই মনের ওপর জোর খাটানো যাচ্ছে না। ওর সারা শরীর আর মন ফারুককে কামনা করছে। প্রবল আবেগে জড়িয়ে ধরে তাকে চুমু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

একটা পাত্র হাতে তুলে নিল তারানা। পানি সেচতে শুরু করল ফারুকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। ওর শরীরের গন্ধ, গলার শব্দ প্রত্যেক হৃৎস্পন্দন আর নিঃশ্বাসের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করছে তারানা।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বনদেবী হঠাৎ থেমে গেল। মুজিবর চেঁচিয়ে উঠল, 'প্রপেলার আটকে গেছে।' খালের পাশে ৪৫ ডিগ্রি কোণে দাঁড়িয়ে ছিল একটা উঁচু গর্জন গাছ। ওপরে হাওয়ার তীব্র ঝাপটা আর নিচে পানির তোড় সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে নদীর ওপর ভেঙে পড়েছে গাছটা। বনদেবী আছড়ে পড়েছে গাছের ওপর। প্রথমে কাত হয়ে গেল, তারপর ধীরে সুস্থে ওল্টাল। মুজিবর চেঁচিয়ে উঠেছে। কিন্তু সাবধান হবার আগেই সবাই দেখল, পানিতে হাবুডুবু খাচ্ছে ওরা।

ফারুক তারানাকে জাপটে ধরল। 'আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরো। আরও শক্ত করে আঁকড়ে রাখো।'

স্রোতের তীব্র টানে ভেসে যাচ্ছে মুজিবর, মুরাদ। ফারুক চেঁচিয়ে উঠল, 'মতি আর খায়ের কই?'

মুরাদ বলল, 'সামনে। ভেসে আছে।'

'সাবধান থেকো। আধ মাইল দূরে খালের বাম তীরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা পয়েন্ট আছে। ওদের সাহায্য নিয়ে সোজা কাঙ্গায় চলে যাও। পুরানো ক্যাম্প। ওখানেই আমরা একত্র হব।'

মুরাদ চেঁচিয়ে বলল, 'আচ্ছা। যে যখন পারি…'

ওর বাকি কথাগুলো আর শোনা গেল না। তারানা আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল ফারুকের কাঁধ। প্রবল ঝড়ে, জলোচ্ছ্বাসে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে চারপাশের পৃথিবী। এখন ফারুক ছাড়া ওর আর কেউ নেই। কিছু নেই।

'এখন কী হবে?'

'আর কিছুক্ষণ ভেসে থাকো। এই বিপদে কুমির আমাদের কামড়াবে না। সামনেই আশ্রয় পাব।'

'আর নৌকাটা?'

'ওটার কথা ভেবে আর লাভ নেই। গন কেস।'

'আমাদের সব জিনিসপত্র ওতে ছিল।'

কয়েকটা সাপ জড়াজড়ি করে ভাসছিল। ফারুক তারানাকে এক টানে সরিয়ে নিল। তারানা শিউরে উঠে ফারুকের পিঠে মুখ লুকাল।

কয়েক মিনিট পরেই বাঁ দিকে ডাঙার হদিস পেল ফারুক। স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে তীরে চলে এল। উঠে পড়ল মাটিতে। হাত ধরে ডাঙায় টেনে তুলল তারানাকে।

আরও কয়েক মিনিট কাটল শক্তি সঞ্চয় করতে। তারানার চোখ এরই মধ্যে গর্তে বসে গেছে। সকাল থেকে বেচারি কিছু খায়নি। তারপর এই ধকল! মায়া হলো ফারুকের।

'আর একটু কষ্ট করতে হবে, তারানা।'

'কষ্ট করে…কী হবে?' তারানা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'হয় বাঘের পেটে…না হয়…গাছ চাপা পড়ে মারা যাব আমরা।'

ফারুক চারদিকে তাকাল। তারানা খুব একটা মিথ্যে বলেনি। ঝড়ে অনবরত ভেঙে পড়ছে গাছপালা। জলের বিভীষিকা কাটিয়ে ডাঙায় উঠতে পেরেছে, কিন্তু

বিপদ কাটোন ওদের।

কে জানে কোথায় ভেসে গেছে মুজিবর, মুরাদ, খায়ের আর মতি!

'আমাদের দলের সবচেয়ে ভাগ্যবান ওয়াজেদ আলী।'

মাথা নাড়ল তারানা। 'ঠিক বলেছ।'

তারানার দিকে ভাল করে তাকাল ফারুক। চোখ ফেরাতে পারছে না।

পাঁচ

সন্ধের একটু আগে একটা মাচা খুঁজে পাওয়া গেল। হয়তো শিকারীদের তৈরি। বনরক্ষীদেরও হতে পারে। কিন্তু তা নিয়ে মাথা ঘামানোর অবকাশ নেই ওদের। খুবই শক্ত মাচা। ওঠার জন্যে মইও আছে। প্রচণ্ড ঝড়ে বনের অনেক গাছ উপড়ে গেছে, ভেঙে গেছে ডালপালা। কিন্তু মাচাটার কোন ক্ষতি হয়নি।

'দুনিয়াটা আসলে ভাল আর মন্দের এক জটিল জাল। কোথাও সবটা ভাল নয়, সবটা খারাপও নয়।'

ফারুক মাঝে মাঝে খুব দামী কথা বলে। তারানা অবাক হয়ে তাকিয়ে ভাবে, এ-পেশা ওর জন্যে মানানসই হয়েছে কি? কিন্তু এর উত্তর ওর নিজের কাছেই আছে। এ-দেশে পেশা বাছাই করে নেয়ার সুযোগ ক'জনার হয়? শিক্ষা আর মেধার সঙ্গে পেশার সম্পর্ক খুবই কম।

মাচায় উঠে বসল তারানা অবসন্ন শরীরে।

ফারুকের বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'আবার একবার পরমায়ু ফিরে পেলাম, ফারুক। ধন্যবাদ জানিয়ে তোমাকে খাটো করতে চাই না।'

ফারুক ওর কানে মুখ রেখে বলল, 'তা হলে ভালবেসে বড় করে দাও। আশেপাশে কেউ নেই। নিবিড় জঙ্গল। একটা বন্য প্রাণীও দেখছে না আমাদের।'

নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিলি হলো নিঃশ্বাস। ঠোঁটের সঙ্গে ঠোঁট। প্রবল আবেগে ওরা পরস্পরকে দখল করল।

'খিদে পেয়েছে, ফারুক,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল তারানা।

'কোন রকমে রাতটা পার করে দাও। সকাল নাগাদ পানি নেমে যাবে। দেখি, বনদেবী লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে কিছু জোগাড় করা যায় কি না।'

তারানা হতাশার সুরে বলল, 'লক্ষ্মী অসহায় অবস্থায় মুখ গুঁজে পড়ে আছেন। তাঁর ভাণ্ডারে কিছু আশা করা উচিত কি?'

ফারুক বলল, 'কিছু খাবার, মশলা আর চাল ত্রিপলে প্যাক করা আছে। যদি স্রোতের তোড়ে ভেসে হারিয়ে না যায়, সকাল বেলা দু-মুঠো ভাতের ব্যবস্থা করা যাবে।'

ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

সকালে জেগে তারানা দেখল, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস নেই। প্রকৃতি শান্ত হয়ে গেছে।

সুন্দরী, গেওয়া আর গর্জন গাছের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। তার তীক্ষ্ণ রশ্মি ওর চোখের পাতা আর পাপড়ি ভেদ করে ভিতরে ঢুকে পড়ছে। অতি কষ্টে চোখ মেলল তারানা।

মাথার ওপর গাছের পাতার ফাঁকে নীল আকাশ হাসছে। শরীরের কষ্ট সত্ত্বেও মনটা ভাল হয়ে গেল। হাই তুলে পাশ ফিরল ও। রিভলভার পড়ে আছে মাচায়। ফারুক নেই।

মনে পড়ল, ফারুক বনদেবীর কাছে গেছে খাবারের সন্ধানে। হাসি পেল তারানার। রিভলভারটা রেখে গেছে ওর নিরাপত্তার জন্যে। জঙ্গলটাকে এতদিনে ওর আপন মনে হচ্ছে। ভয় লাগছে না।

হাত-মুখ ধোবার জন্য নিচে নামল তারানা।

কান পেতে পানির শব্দ শুনল। খাল অনেকটা দূরে। অন্য কোন পানির উৎস থেকে আসছে এ-শব্দ। পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলল তারানা। অনেক জায়গায় গাছ আর ডাল ভেঙে পড়েছে পথের ওপর। একটা ডাল তুলে নিল হাতে। ডালপালার স্তূপের চড়াই-উতরাই পার হয়ে পৌঁছে গেল জলাভূমির কাছে। একটা ছোট নালা বেয়ে পানি গড়িয়ে আসছে। তার মানে, জঙ্গলের এ-অংশ একেবারে সমতল নয়, উঁচু-নিচু। হয়তো কাছেই কোথাও আছে উঁচু জায়গা।

হাত-মুখ ধুয়ে নিল তারানা। খিদে মরে গেছে। শুধু শরীরটা দুর্বল। পা এগোতে চায় না একটুও। এ-ছাড়া অন্য কোন অসুবিধে অনুভব করছে না ও। কামিজের কোনা দিয়ে মুখ মুছল। মাচার দিকে ফিরে আসতে গিয়েও কেন যেন পশ্চিম দিকে তাকাল তারানা। বিজনপুরের ম্যাপের কথা মনে হলো। মনে পড়ল কাঙ্গার ক্যাম্প আর ড. আবুল হাশিমের কবরের জায়গাটার কথা। কতদূরে সেটা?

সম্ভাবনার কথা মনে হতেই তারানার বুকের ভিতর নতুন করে তোলপাড় শুরু হলো। নৌকার কাজ সেরে ফিরতে ফারুকের দেরি হবে। অন্তত আরও এক ঘণ্টার ব্যাপার। ইতস্তত করে পশ্চিম দিকে পা বাড়াল তারানা। আধঘণ্টায় যতদূর যাওয়া যায় যাবে ও, তারপর ফিরে আসবে।

একটা 'ইউ' টার্ন নিয়ে আঁতকে উঠল তারানা। রিভলভারটা কোমরে গোঁজা ছিল। কিন্তু ওটার কথা ভুলে গেল সে। লাঠিটা উঁচু করে ধরল দু'হাতে, আত্মরক্ষার স্বাভাবিক তাগিদ থেকেই। একটা বাঘ শুয়ে আছে পথের ওপর। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই চমক সামলে লাঠি নামাল তারানা। মরা বাঘ। গাছের নিচে আটকে আছে শরীর। ঝড়ের সময় দৌড়াচ্ছিল হয়তো। গাছ চাপা পড়ে মরেছে।

আরও একটু যেতেই একটা মোড় পেল তারানা। পথ দু'ভাগ হয়ে গেছে এখানে। একটা পশ্চিম-উত্তর কোণে চলে গেছে। অপরটা গেছে সোজা উত্তরে। তৃতীয় নয়নে ড. আবুল হাশিমের দেয়া ম্যাপটার কথা কল্পনা করল তারানা। নির্ণয় করল নিজের অবস্থান। তারপর অনুমানের ওপর ভরসা করে এগিয়ে চলল উত্তর-পশ্চিম কোণের পথ ধরে। আরও একটা পশুর মৃতদেহ চোখে পড়ল। বুনো শুয়োর। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে ক্ষুধিত শকুন। মচ্ছব শুরু হবে এখুনি।

তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে তারানার প্রাণ আনন্দে নেচে উঠল। একটুও ভুল হয়নি অনুমান। পাশাপাশি একজোড়া সুন্দরী গাছ দেখা যাচ্ছে। আশেপাশে

অমন গাছ আর নেই। জায়গাটা বেশ উঁচু। ওখান থেকেই নেমে আসছে পানি।

ওই খানেই বাবার কবর! মনে মনে বারবার কথাটা আওড়াতে লাগল তারানা। তার মানে কাঙ্গা কাছেই। আর একটু এগিয়ে ডানদিকে যেতে হবে অন্য একটা পথ ধরে। মাইলখানেক দূরে ঐতিহাসিক বিজনপুর! বাবার সাধের বিজনপুর! ওঁর অনেক সাধনার ধন! ফারুককে কিছু বলবে না ও। শুধু বলবে এ-পথে এগিয়ে যেতে। হয়তো ফারুক না-জেনেই পৌঁছে যাবে সেই বিতর্কিত বিজনপুরে।

ফিরে চলল তারানা। প্রাণে খুশির তুফান।

একঘণ্টার মধ্যেই মাচায় ফিরে এল তারানা। শূন্য মাচা। মইয়ের ওপর মাটির প্রলেপ দিয়ে গিয়েছিল। সেটা তেমনি আছে। তার মানে ফারুক ফিরে আসেনি। মাচায় উঠে তারানা বিশ্রাম নিল। নানান রকমের পরিকল্পনা করল। ভাঙল, আবার গড়ল। কিন্তু বুঝতে পারল, সব পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম শর্ত ফারুকের ফিরে আসা। যদি ও ফিরে না আসে···নাহ্, তারানা ভাবতেই পারছে না, কোথায় যাবে, কী করবে? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পয়েন্টটা কতদূরে? একলা সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারবে? সেখানে কারও দেখা পাবে? না হয় পেল! তারপর?

অস্থির, অশান্ত হয়ে উঠেছে মন। অনেকখানি বেলা হয়েছে। রিভলভারটার অভাবে কোন বিপদে পড়েনি তো ফারুক? এত দেরি হবার কথা নয়। তারানা নিচে নেমে এল। হাঁটতে শুরু করল খালের দিকে।

কাল যখন ওরা এ-পথে আসছিল, চারপাশের অবস্থা এত খারাপ ছিল না। আজ পথটা অচেনা মনে হচ্ছে। লাঠি দিয়ে সামনের জায়গা ঠুকে নিশ্চিন্ত হয়ে পা বাড়াতে লাগল তারানা। ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ভয়ে বাঘ, বুনো শুয়োর হয়তো পালিয়েছে, কিন্তু সাপ তো পালায়নি! 'য পলায়তি স জীবতি' তত্ত্বে বিশ্বাস করে না সাপ।

খালের পাড়ে পৌঁছেও মনটা শান্ত করতে পারল না তারানা। যদি কোনভাবে ফারুকের কাছে চলে যেতে পারত! কিন্তু উপায়ও দেখতে পাচ্ছে না। খালের পাড় ধরে দক্ষিণে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। ঠাস-বোনা, দুর্ভেদ্য বন। হোগলা, গোলপাতা আর রকমারি নাম-না-জানা গাছ নুয়ে পড়েছে খালের ওপর।

কিন্তু এটা সুন্দরবন। সুন্দর কোন বন নয় ঢাকার সোহরাওয়ার্দি উদ্যান কিংবা ন্যাশনাল পার্কের মত। কিংবা নদীপারের গেরস্থবাড়ির দেহলিও নয়। এখানে দাঁড়িয়ে প্রিয়জনের জন্যে অপেক্ষা করা কতটা নিরাপদ, তারানা বোঝে। মাচায় অপেক্ষা করাই উচিত ছিল ওর। কিন্তু মন মানে না। ডানদিকে শূন্য খাল বরাবর চেয়ে থাকতে থাকতে তারানার চোখ ব্যথা হয়ে যায়। ফারুকের দেখা নেই। তারানা যখন শ্রান্ত হয়ে মাচার দিকে ফিরে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে, তখন পানিতে বৈঠা ফেলার শব্দ শুনতে পেল। হাঁটু পানিতে নেমে দক্ষিণ দিকে তাকাল তারানা। ফারুক আসছে। তারানার শরীর-মনে আনন্দের ঝর্ণাধারা। আহা! ফারুক আসছে। কষ্টে পাওয়া জিনিসই সবচেয়ে আনন্দের।

তারানা দেখতে পেল, একটা ডেলা এগিয়ে আসছে। অনেক খাটতে হয়েছে বেচারাকে। বনদেবী থেকে কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার করেছে। ডেলা বানিয়েছে গাছের

ডাল জোড়া দিয়ে। তারপর বেয়ে আসছে সেটা।

কালকের দিনটা খুব খারাপ গেছে। আজকের দিনটা বোধহয় ভাল যাবে। দিনের শুরুতে দুটো ভাল খবর। আরও দুটো চাই। সঙ্গীদের খবর আর সবশেষে বিজনপুরের হদিস।

ভেলায় কয়েকটা মালপত্র ত্রিপলে ঢাকা। ত্রিপলে কাদার দাগ। ফারুকের সারা শরীর আর কাপড়ে লেগে আছে কাদা। এই অবস্থাতেই ডাঙায় নেমে তারানাকে জড়িয়ে ধরল ফারুক।

'ভাল আছ?'

তারানা টপ্ করে একটা চুমু খেয়ে বলল, 'হ্যাঁ। তুমি?'

'ভাল।'

'খুব কষ্ট হয়েছে, না?'

'যেতে-আসতে বিশেষ কষ্ট হয়নি। "বনদেবীর" পেট থেকে খাবার আর দরকারী জিনিসগুলো উদ্ধার করাটাই ছিল কষ্টের। খুব সামান্যই উদ্ধার করতে পেরেছি। শুধু যেগুলো ত্রিপলে ভালভাবে বাঁধা ছিল, সেগুলোই।'

ভেলা থেকে বাকস আর বস্তাগুলো নামাতে নামাতে তারানা বলল, 'এবার তুমি মহারাজের মত মাচায় বসে থাকবে। আমি তোমাকে রেঁধে খাওয়াব।'

ফারুক তারানাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল। 'শুনে কান জুড়িয়ে যাচ্ছে। কতকাল মেয়েদের হাতের রান্না খাই না।'

তারানা ফারুকের গাল টিপে দিয়ে বলল, 'মেয়েদের হাতের রান্না খাওয়ার বিশেষ যোগ্যতা দরকার, সাহেব। শুধু গোঁয়ার্তুমি করলে ওটা কপালে জুটবে না।'

'তাই!' প্রণত হওয়ার ভঙ্গিতে ফারুক বলল, 'এক দেবীকে হারিয়েছি। এ-দেবীকে হারালে জীবন মরুভূমি হয়ে যাবে। বলো, দেবী, কী করতে হবে? এ-অধম তোমার···'

বাধা দিয়ে তারানা বলল, 'রসিকতার অনেক সময় পাবে। তাড়াতাড়ি মাচায় চলো।'

ভিজে মাটিতে আগুন ধরিয়ে একটু ভাত রাঁধতে আর আলু সেদ্ধ করতে দু'জনে ঘেমে নেয়ে উঠল। লবণ পাওয়া গেল না। তবু ওই খাবার অমৃতের মত মনে হলো। একটা টিনের কৌটায় মাখন পাওয়া গিয়েছিল। খুব কাজে দিল।

তারানাকে জড়িয়ে ধরে ফারুক চুমু খেল ওর মুখে। 'থ্যাঙ্কস্ ফর এভরিথিং।'

তারানা ফারুকের বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'তোমাকেও।'

'মানুষের মৌলিক চাহিদা কি কি, বলো তো?'

তারানা আউড়ে গেল, 'অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা···'

ফারুক বাধা দিয়ে বলল, 'উঁহুঁ। অন্ন, বস্ত্র,···তারপর ভালবাসা। এই দেখো, অন্ন আর বস্ত্রের সমস্যা মিটে যাবার পরই ভালবাসার বান ডাকছে শরীরে···মনে···'

তারানা আলতো করে কিল বসাল ফারুকের পিঠে। 'ডাকুক বান। এখন কোন ভালবাসাবাসি নয়। কাঙ্গা যেতে হবে। সঙ্গীদের খোঁজখবর নিতে হবে।'

ফারুক আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরল তারানার পিঠ। ওর বুকের মধ্যে হারিয়ে গেল তারানা। সভয়ে চারদিকে তাকাতে চেষ্টা করল।

ফারুক ফিসফিস করে বলল, 'কেউ নেই, দেবী, কোথাও কেউ নেই। শুধু আমরা।'

চোখ বুজল তারানা।

কিছু জিনিস মাচায় রাখা হলো। সবচেয়ে দরকারী জিনিসগুলো পোরা হলো দুটো ব্যাগে। ছোট ব্যাগটা তারানা কাঁধে তুলে নিল। ফারুক নিল বড় ব্যাগটা।

'অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, তারানা। আমার হিসেব অনুযায়ী অন্তত চার মাইল।'

জলাভূমি ডানে রেখে ওরা এগিয়ে চলল পশ্চিমে। তারানা বারবার পিছিয়ে পড়ছে। ফারুক কিছুদূর যায়, আবার থমকে দাঁড়ায়। তাগাদা দেয়।

'আরও জোরে পা চালাতে হবে, মেমসাহেব।'

'ইউ' টার্ন নিয়ে তারানার মতই থমকে দাঁড়াল ফারুক। কিন্তু কোন শব্দ বেরুল না ওর মুখ থেকে। তারানা ওর কাঁধে হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলল, 'বাঘটা মরা, ফারুক। তাকিয়ে লাভ নেই। ওর চামড়াটাও বন বিভাগের সম্পত্তি।'

ফারুক আবার তাকাল ওর দিকে। 'তোমার ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে যাচ্ছে, দেবী। জঙ্গল সম্পর্কে বেশ ভাল ধারণা অর্জন করেছ, দেখছি।'

পরের আঘাতটা আরও সাঙ্ঘাতিক। তেমাথায় দাঁড়িয়ে ফারুক যখন দ্বিধা করছে, তারানা বেশ জোরের সঙ্গে বলল, 'বাঁ-দিকে চলো, ফারুক।'

'ডানদিকে গেলে অসুবিধে কোথায়?'

ডানদিকেরটা গেছে উত্তরে। কিন্তু কাঙ্গা যেতে হলে আমাদের পশ্চিমে যাবার চেষ্টা করা উচিত।'

'তুমি আমাকে নতুন করে দুর্ভাবনায় ফেলে দিয়েছ, দেবী।'

ঘণ্টাখানেক পর দূরে তাকিয়ে ফারুক থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

'আমরা···আমরা···' ফারুকের মুখে কথা আটকে গেল। তারানা পূরণ করল অসমাপ্ত কথাগুলো। 'আমরা কাঙ্গার কাছে এসে পড়েছি, তাই না, ফারুক?'

ফারুক কাঁধ থেকে ব্যাগ নামিয়ে কোমর জড়িয়ে উঁচুতে তুলে ধরল তারানাকে। সশব্দে চুমু খেল ওর ঠোঁটে।

'তোমার সিক্সথ্ সেন্স আর উইটের তুলনা হয় না, দেবী।'

তারানার মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। 'সিক্সথ্ সেন্স আর উইটের কিছু নেই, ফারুক। একটু আগে এ-পথে ঘুরে গেছি আমি।'

ফারুক অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে রইল। ধীরে ধীরে বলল, 'ডোন্ট টেল মি।'

'তোমার রিভলভারটা খুব সাহস যুগিয়েছে। গুলি খরচ করিনি অবশ্য।'

ফারুক ব্যাগের ওপর বসে পড়ল। 'তোমার মতলবটা কী, বলো তো, দেবী! তোমার ভাবসাব সুবিধের মনে হচ্ছে না।'

'আমি মাত্র দুটো মতলবে কাঙ্গায় এসেছিলাম, ফারুক। একটা আগেই বলেছি। পরেরটা বলতে গিয়ে আমাদের মধ্যে বিশ্রী ঝগড়া হয়ে গেছে। বলতে বাধছে এখন।'

ফারুক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ঝগড়াটা এখনও চলছে, তবে খুব মিঠে ভাষায়। কেউ শুনলে বুঝতে পারবে না, আমার বুকের কোন গভীর নরম জায়গায় ঘা দিচ্ছ তুমি। হয়তো সব শুনতে জানি না। কিন্তু কম পড়লে বুঝি, তারানা।'

তারানা ফারুকের দৃষ্টি এড়ানোর জন্যে মুখ ঘোরাল।

ফারুক বলল, 'তোমার ম্যাপের সঙ্গে আমার ম্যাপ এতক্ষণে মিলেছে। আমরা "বিজনপুরের" খুব কাছেই আছি। অবশ্য যদি সত্যিই ওটার অস্তিত্ব থাকে।'

তারানা বলল, আর কোন অনুরোধ করব না, ফারুক। জানি, সবাইকে অনুরোধে ঢেঁকি গেলানো যায় না। প্রেসিডেন্টের মত "নরম মনও" নয় সবার। তবু··· বুকে একটা আশা আছে। তুমি···তুমি তো জানো, অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। এই মুহূর্তে এলাকাটা বন্য প্রাণী আর আদিবাসী— দুই অপশক্তির হাত থেকে মুক্ত। হয়তো এমন সুযোগ আর কখনও পাব না আমরা। আমার সুযোগ পাবার তো প্রশ্নই উঠছে না! তুমিও হয়তো এমন অনুকূল পরিবেশ আর পাবে না। তাই··· ঝগড়ার কথা যদি ভুলে যাও, ঝেড়ে মুছে ফেল ইগোটা, হয়তো··· হয়তো···'

ফারুক অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারল না।

তারানা তাগাদা দিল। 'দেরি হয়ে যাচ্ছে, ফারুক।'

ফারুক মুখ তুলে তারানার দিকে তাকাল। ওর দু'চোখে আবার অশ্রুর ঘনঘটা। প্রত্যাশার চিহ্ন সেখানে।

'তুমি জিতলে, তারানা। তোমার সাহস, বুদ্ধি আর অধ্যবসায়ের কাছে আমি হেরে গেলাম।'

'খারাপ লাগছে? সত্যি করে বলো। কিচ্ছু চাই না আমি। "বিজনপুরের" রহস্য ভেদ করে আমার কাজ নেই। আমার ওপর রাগ কোরো না তুমি। তুমি ছাড়া সত্যিই আজ আমার কেউ নেই। কিছু নেই।'

ফারুক তারানার পিঠে হাত রাখল। 'আচ্ছা, যুদ্ধবিরতি। একসঙ্গে "বিজনপুর" খুঁজব আমরা।'

কানে তালা লাগানোর শব্দে ফারুকের ঠোঁটে চুমু দিল তারানা। সে-শব্দে ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল কয়েকটা শকুন। দু'জনেই হেসে ফেলল।

উঁচু জায়গা ছেড়ে নিচে নেমে এল ওরা। বন্যার পানিতে কোমর পর্যন্ত ডুবে আছে পথের কোন কোন জায়গা। কিছুদূর যাবার পর আবার উঁচু জায়গা পাওয়া গেল।

কিন্তু এ-নিয়ে ভেবে লাভ নেই, মনকে বোঝাল তারানা। জীবনটাই চড়াই আর উতরাই।

ছয়

অ্যাকাউন্টস্-এর ঝামেলায় ব্যস্ত ছিল আলাউদ্দিন। বেশির ভাগ লোক কাজে ফাঁকি দিচ্ছে। অনেক খরচের ঠিকমত হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। হিসেব মেলানোর কথা তুললে কর্মচারীরা দাবি তোলে, ওভারটাইম অ্যালাউন্স দিতে হবে। আপত্তি করলে মংলা পোর্ট-এর উদাহরণ হাজির করে। পোর্টের লোকজন যে সব সুবিধে পায়, হোটেল শিবসার কর্মচারীরা সে সব পাবে না কেন? রাগ করে দু'দিন হোটেলে আসাই বন্ধ করে দিয়েছিল আলাউদ্দিন। তারপর ভেবে দেখল, এরকম পাগলামির কোন মানে হয় না। দেশজুড়ে চলছে এই নিয়ম। সবাই বেতন আশা করে শুধু অফিসে আসার জন্যে। কাজ করার জন্যে চায় ঘুষ অথবা ওভারটাইম ভাতা।

'গোল্লায় গেছে দেশটা,' বিড়বিড় করতে করতে আউটস্ট্যাণ্ডিং বিষয়ক ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছিল আলাউদ্দিন। ফোন বাজল।

'এই হয়েছে একটা বাড়তি জ্বালাতন!' বিরক্তির সঙ্গে ফাইলের পাতায় চোখ বুলাল ও। ফোন ধরল না। ওপাশের ব্যক্তিটিও নাছোড়বান্দা। রিং বন্ধ হলো না।

ফাইলটা আলমারির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বাম হাতে রিসিভার তুলল আলাউদ্দিন। রাগে আগুন হয়ে উত্তর দিল, 'কে?'

উত্তরটা প্রথমে বুঝতে পারেনি। যখন বুঝল, হতভম্ব হয়ে উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। সালাম দেবার জন্যে কপালে হাত তুলল, কিন্তু মুখে বলতে ভুলে গেল বেচারা।

প্রেসিডেন্ট এরফান বললেন, 'কামার ফরিদ কোথায়, বলতে পারো?'

'এই মুহূর্তে···কাছে নেই, স্যার। আ···আমি খবর দিচ্ছি। এখুনি ও আপনাকে রিং ব্যাক করবে।'

'আনোয়ার ফারুকের খবর জানো?'

'না, স্যার। কাল ওখানে প্রচণ্ড ঝড় আর জলোচ্ছ্বাস হয়েছে।'

'জানি। সেজন্যেই চিন্তা হচ্ছে। ওদের সঙ্গে আবার একটি মেয়ে আছে!'

'কামার ফরিদ খবর নেবার চেষ্টা করছে, স্যার।'

আলাউদ্দিনের নার্ভাসনেস কেটে গেছে।

এরফান বললেন, 'ওকে বলো আমার সঙ্গে কথা বলতে।'

'এ···এক্ষুণি বলছি, স্যার। স্লামালাইকুম, স্যার।'

রিসিভার রেখে চোখ বুজে বুকে হাত দিল আলাউদ্দিন। বিড়বিড় করে বলল, 'নাহ্! জানে মারা পড়িনি। বেঁচে আছি এখনও। বাপরে বাপ! প্রেসিডেন্ট! দেশের রাজা!'

অ্যাকাউন্টস্-এর কাজ মাথায় থাকল। আলাউদ্দিন চরকির মত ঘুরতে লাগল মংলা বন্দর। যেখানে যায়, সেখানেই শুনতে পায়, কামার ফরিদ এইমাত্র বেরুল। সবখানে সে আছে, আবার কোথাও নেই।

একটা বিদেশী জাহাজের হুইল হাউজে ওকে খুঁজে পাওয়া গেল অনেক কষ্টের পর। জাহাজের বেতারযন্ত্রের সামনে হুমড়ি খেয়ে আছে ও।

'কী খবর, আলাউদ্দিন?' বন্ধুর দিকে না তাকিয়েই কামার ফরিদ বলল, 'হাঁপাচ্ছ কেন?'

'প্রে···প্রেসিডেন্ট সাহেব! তোমাকে খু··· খুঁজে সারা···'

ফরিদ রেডিও থেকে মুখ তুলল। 'প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে খুঁজছেন না, খুঁজছ তুমি। এবার বলো, উনি কী বলেছেন।'

আলাউদ্দিন নিজের অফিস কামরার বাইরে পায়চারি করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ল। দরজা বন্ধ করে নিচু স্বরে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এসটিডি লাইনে কথা বলছে কামার ফরিদ। বলছে তো বলছেই!

অনেকক্ষণ পর দরজা খুলল ফরিদ। আলাউদ্দিন ওর নিজের চেয়ারে বসে উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'কী বললেন প্রেসিডেন্ট সাহেব?'

কামার ফরিদ বলল, 'হোটেল শিবসার দায়িত্ব অন্য কারুর হাতে দেবার আদেশ দিয়েছেন উনি।'

আলাউদ্দিন সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে ধরল কামার ফরিদের দিকে। 'ঠাট্টা কোরো না, ফরিদ। বড় সমস্যায় আছি।'

'তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির যা অবস্থা, তাতে হোটেল শিবসা কিভাবে চলছে, ভেবে পাই না।'

'কেন?'

'প্রেসিডেন্ট কি বললেন, তা যদি তোমাকে বলতেই পারি, তাহলে কামরার দরজা বন্ধ করলাম কেন, আর প্রেসিডেন্টই বা যা বলার, তোমাকে বললেন না কেন?'

আলাউদ্দিন নতুন করে চিন্তায় পড়ল। 'হ্যাঁ···তা-ও তো বটে!'

কামার ফরিদ বলল, 'বুঝতে পারছি, লাভ-লোকসানের হিসেব নিয়ে বেশ সমস্যায় আছ তুমি। কিন্তু আমার কোন সমস্যা নেই। ফারুক টিভি তারকাকে নিয়ে কাঙ্গা গেল। ব্যস! আর কোন খবর নেই। প্রেসিডেন্ট সাহেব সবচেয়ে উদ্বিগ্ন ওই তারকার জন্যে। আরও অনেক খবর জানতে চান তিনি। আমার কাছে কোন খবর নেই। এফ এণ্ড এফ লিমিটেডের বিশেষ দলটাকে তিনি সাহায্য পাঠাতে চান। উড়িরচরে রিলিফ পাঠানো আর ফারুক সাহেবকে বাড়তি খাবার, আর্মস-অ্যামিউনিশন পৌঁছে দেয়া যে এক কথা নয়, সেটাও ওনাকে বোঝানো যাচ্ছে না। অর্থাৎ আমার আবার সমস্যা কোথায়? সব সমস্যা তোমারই।'

আলাউদ্দিন লজ্জা পেল। 'না, দোস্ত। তোমার সমস্যার কাছে আমারটা কিছুই না। এখন বলো, তোমার কোন উপকারে আসতে পারি?'

কামার ফরিদ বিচলিত হয়ে পড়ে। মাথা চুলকাচ্ছে সে।

'রফিক নওয়াজ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে···আমার মনে হয়···'

ফরিদ বলল, 'তোমার এখনও কিছু মনে হয়নি, আলাউদ্দিন। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। শুনবে?'

'হ্যাঁ, বলো।'

'তুমি আর আমি হিরণ পয়েন্টে ঘুরে আসতে পারি। কাল ঝড় হয়ে গেছে। আজ জঙ্গল মোটামুটি নিরাপদ থাকবে। সাহস আছে?'

আলাউদ্দিন বুক ফুলিয়ে সিনেমার ভিলেনের ঢঙে বলল, 'ইনসাল্ট আমার ধাতে সয় না, ফরিদ। আমি কাপুরুষ নই। এখুনি রাজি।'

'তাহলে তৈরি হয়ে নাও। একটা স্পীড বোট পাওয়া যাবে। প্রেসিডেন্ট সাহেব একদিনের জন্যে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।'

'ভেরি গুড। শুধু আমরা দু'জন?'

'উঁহুঁ। স্পীড বোটের চালক থাকবে। আরও একজন লোক থাকবে। নাম মাহমুদ। তার হাতে থাকবে কিছু অস্ত্রশস্ত্র। ফারুকের কাছে ওগুলো পৌঁছে দেবে সে।'

'দারুণ জমবে!'

'কথায় কথায় ক্রিয়া-বিশেষণ ব্যবহার কোরো না। খুব মউজে আছ। ফারুক ব্যাটাও তোমার চেয়ে কম মউজে নেই। যত বিপদ আমার!'

আলাউদ্দিনের মুখ মলিন দেখাল। 'অমন কথা বোলো না, কামার ফরিদ। আমরা কেউ জানি না, ফারুকদের কপালে কি ঘটেছে!'

ফরিদ বলল, 'যদি ঝড়ে সমুদ্রে ডুবে মরে, তাহলে তো ও-ব্যাটার সবচেয়ে মজা! সুন্দরী টিভি-ওয়ালীও নিশ্চয়ই ওর সঙ্গে স্বর্গে যাবে!'

আলাউদ্দিন বলল, 'তুমি বলছিলে, সময় বেশি নেই, তাই না?'

ফরিদ উঠে পড়ল। চোখ পাকিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে নেই।'

জার্নিটা জমিয়ে রেখেছিল কামার ফরিদ। মাহমুদ আর স্পীড বোটের চালক জব্বার ওর ভক্ত হয়ে পড়ল। ফরিদ সাহেবের মত মজার লোক আর হয় না! আলাউদ্দিন হ্যাঁ-হুঁ করে তাল দিয়ে গেল, কিন্তু এটা বুঝিয়ে দিতে কসুর করল না যে, এত প্রশস্তির কিছু নেই। বাঙালী অ্যাপ্রিসিয়েশনের বেলায় যতটা কৃপণ, ঠিক ততটাই বেহিসেবী স্তবের সময়। এতটা বীরপূজা খুব কম জাতির মধ্যে আছে।

রফিক নওয়াজ সাহেবের জেটিতে পৌঁছে ওদের মুখ শুকিয়ে গেল। বাড়ির ভিতর থেকে কান্নার শব্দ আসছে। সামনে কয়েকজন মানুষের অসহায় মুখ।

'কী হয়েছে?' ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল কামার ফরিদ।

'নওয়াজ সাহেবের শালী আত্মহত্যা করেছে।'

ভীষণভাবে চমকে উঠল কামার ফরিদ। আলাউদ্দিন ওর কনুইয়ে খোঁচা দিয়ে বলল, 'সেই ডেঁপো?'

কামার ফরিদ কিছু বলল না। মাথা দোলাল।

রফিক নওয়াজ পাথরের মূর্তির মত বসে আছেন। মিসেস নওয়াজের চোখ জবা ফুলের মত লাল।

'কীভাবে হলো?' একজন পরিচারিকার কাছে জিজ্ঞেস করল ফরিদ।

'ঢাকা থেকে একটা চিঠি এল সেদিন। কোথায় যেন আবেদন করেছিল অভিনেত্রী হবার জন্যে। ওদের বাছাইয়ে বাদ পড়েছে ডোপা। চিঠিতে তা-ই লেখা

ছিল। চিঠিটা পড়ার পর যেন কেমন হয়ে গেল বেচারি। দশ মিলিগ্রামের পঁচিশটা ভ্যালিয়াম একসঙ্গে খেয়েছে।'

সমবেদনায় বিকৃত দেখাল ফরিদের মুখ। ও মৃত্যুশোক সহ্য করতে পারে না। সান্ত্বনার কথাও আসে না মুখে।

পরিচারিকা বলল, 'অনেক দূর থেকে এসেছেন আপনারা। নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত! আসেন, বিশ্রাম করেন।'

ফরিদ বাড়ির পেছনদিকের বারান্দায় গেল। সাদা চাদরে ঢাকা একটা খাটিয়ায় শুয়ে আছে ডোপা— ডোপার দেহ। কামার ফরিদ চাদর সরিয়ে দেখল। টনটন করে উঠল বুকের ভিতর। ডোপা নেই, আর কখনও হাসিতে-গল্পে-গানে সে ওদের হিরণ পয়েন্টের দিনগুলো আনন্দময় করে তুলবে না। আর কোনদিন বলবে না, 'ফরিদ ভাই, আপনাকে দেখতে লাগে ঠিক "উজান পবন" নাটকের নায়কের মত,' অথবা, 'ফরিদ ভাই, "দি লিট্‌ল্ র‍্যাঙ্ক" ছবির নায়কের মত হাসতে পারেন না?' ফারুক অনেকবার ধমক দিয়েছে ওকে। 'নাটকের চিন্তা ছাড়তে পারো না?' ডোপা হেসে গড়িয়ে পড়েছে। ' "নীল পদ্ম" নাটকের নায়িকাকে "আস্কার হোসেন" কড়া ধমক দিয়েছিল। কি যে সুন্দর লেগেছিল!···তোমার ধমক একটুও ভাল না।'

শুধু ফারুক নয়, আশেপাশের প্রায় সবাই বকেছে ওকে। কিন্তু ফরিদের কেবলই মনে হয়, ওই মেয়েটাই বুঝি দুনিয়াকে ঠিকমত চিনতে পেরেছিল। 'পৃথিবী হচ্ছে প্রকাণ্ড এক রঙ্গমঞ্চ; আমরা সবাই পাত্র-পাত্রী— নিজ নিজ ভূমিকায় অভিনয় করে যাচ্ছি'— শেক্‌স্‌পীয়রের কথাটা ওর চেয়ে ভাল করে বুঝি আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেনি। কিন্তু শুধুই অভিনেত্রী হতে না পারা ওর আত্মহত্যার কারণ? মেনে নিতে পারছে না কামার ফরিদ।

আলাউদ্দিন পেছন থেকে ওর কাঁধে হাত রাখল। 'তোমার বিশ্রাম দরকার।'

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ফরিদের। বাইরে কে যেন পায়চারি করছে। দরজা খুলে বেরিয়ে এল ফরিদ।

'রফিক ভাই, ঘুমাবেন না?'

'ঘুম আসছে না।'

'আঘাতটা সহ্য করা সত্যিই কঠিন।'

রফিক নওয়াজ বললেন, 'বরাবরই ও একটু নাটক-পাগল মেয়ে। কিন্তু হঠাৎ এমন একটা কাণ্ড করে বসবে, কেউ ভাবেনি।'

ফরিদ একটা কথা বলতে গিয়েও চেপে গেল। অনুমানের ওপর ভরসা করে কথা বলা এ-অবস্থায় ঠিক নয়।

রফিক নওয়াজ রেলিঙের ওপর পা তুলে বসলেন। 'একটা কথা কখনও বলা হয়নি। ডোপার বোন খুব পছন্দ করত ফারুককে।'

ফরিদ চমকে উঠল। সেটা রফিক নওয়াজ লক্ষ করলেন।

'ও চেয়েছিল ডোপার সঙ্গে ফারুকের বিয়ে দিতে।'

ফরিদ বলল, 'ফারুক সেটা জানত?'

'না। ফারুক নিজে কিছু অনুমান করেছে কিনা জানি না। কিন্তু যতদূর জানি, কখনও এ-নিয়ে আলোচনা হয়নি।

কি বলবে ভেবে না পেয়ে ফরিদ বলল, 'খবর পেলে ফারুক খুবই কষ্ট পাবে। ফারুক অত্যন্ত স্নেহ করে ওকে।'

রফিক প্রসঙ্গ পাল্টাতে চান। ওয়াজেদের বিশ্বাসঘাতকতার ঘটনা ওদের জানাতে শুরু করলেন সবিস্তারে।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার অংশবিশেষ রফিক নওয়াজকে জানাল ফরিদ।

মাঝরাতেই ওকে সঙ্গে নিয়ে পুলিস ফাঁড়িতে গেলেন রফিক নওয়াজ। কাঙ্গার নিকটতম ফাঁড়ির সঙ্গে বেতারে যোগাযোগ হলো। টহল পুলিসের প্রথম দলের সঙ্গে ভোর রাতে রওনা হবে মাহমুদ। সব ব্যবস্থা করে ফিরে এল ওরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। ফারুকের কাছে একটা চিঠিও লিখল ফরিদ। তারপর জাগাল মাহমুদকে। 'রেডি হয়ে নাও। তোমার জাহাজামে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে।'

ঘুমঘুম চোখে উঠে বসল মাহমুদ। হাসল। তারপর রওনা হলো পুলিসের গানবোটে চড়ে। একটা লম্বা কাঠের বাকসও তুলে দেয়া হলো গানবোটে। ফরিদ আর আলাউদ্দিন জেটিতে দাড়িয়ে রইল। যতক্ষণ দেখা যায়, মাহমুদ ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর মনে হলো, নদীতে আরও একটা গানবোট আছে। নদীর অপর পার থেকে এগিয়ে আসছে সেটা।

একজন কনস্টেবলকে মাহমুদ জিজ্ঞেস করল, 'ওই গানবোটটা কাদের?'

কনস্টেবল তাচ্ছিল্যের সুরে বলল, 'কত লোকে কত ধান্দায় আসে এখানে! সব খবর কি আর আমরা রাখতে পারি?'

অবাক হয়ে গেল মাহমুদ।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই গানবোট নদীর কূলে ভিড়ল। জঙ্গলের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা উঁচু কাঠের বাড়ি।

'নেমে যান। ওটাই চর নিহাল ফাঁড়ি।'

মাহমুদ বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'আপনারা! আপনারা নামবেন না?'

কনস্টেবল ধমকের সুরে বলল, 'আমাদের অনেক কাজ। নামেন।'

মাহমুদ তীরে নামল। কাঠের বাকসটা নামাল। গানবোট দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবার পর জঙ্গলের দিকে ফিরল। কাঠের বাড়িটার দিকে তাকালেই অস্বস্তি হচ্ছে তার। এটা আবার একটা ফাঁড়ি হলো?

কিন্তু উপায় কী? প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুসারেই সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। পা বাড়াল ও। কূলে আবার গানবোটের শব্দ। আশায় আশায় ফিরে তাকাল মাহমুদ। ভাবল, হয়তো পুলিসের গানবোটটা ফিরে এসেছে। কিন্তু ওটা পুলিসের গানবোট নয়। একদল লোক লাফিয়ে নামল। ছুটে এল ওর দিকে। ব্যাপারটা বুঝে উঠে কাঠের বাকসটা কাঁধ থেকে নামিয়ে দৌড় দিতে শুরু করল মাহমুদ। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে।

সকাল দশটার দিকে দাফন হয়ে গেল। রফিক নওয়াজের পেছন পেছন বাসায় ফিরে

এল ফরিদ।

'আমাদের কি এখানে অপেক্ষা করাটা ঠিক?' সংশয়ের সুরে বলল আলাউদ্দিন।

'না, আমরা মংলা ফিরে যাব। ওয়াজেদ আলীর ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে আমাকে। থানায় যোগাযোগ করতে হবে। সাজেদ আলীর সঙ্গেও কথা বলা দরকার। ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে মনে হচ্ছে। এমনও হতে পারে, সাজেদ আলীকে চাপ দিলে অনেক দরকারী তথ্য পাওয়া যাবে।'

রফিক নওয়াজ আর ওর স্ত্রীর কাছে বিদায় নিয়ে ওইদিনই মংলায় ফিরে এল কামার ফরিদ আর আলাউদ্দিন।

স্বাভাবিকভাবেই প্রথমে সাজেদ আলীর খোঁজ করা হলো। জানা গেল, গতকালই পালিয়েছে সে।

সাত

পঞ্চাশ গজও গিয়েছে কিনা সন্দেহ। আবার চলার গতি কমল। ফারুক ভুরু কুঁচকে কাঙ্গার দিকে তাকাল। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করল তারানা। ধোঁয়া উড়ছে কাঙ্গার আকাশে।

তারানা ফারুকের হাত আঁকড়ে ধরল। ফারুক হাত রাখল তারানার কাঁধে।

'সঙ্গীরা আমাদের আগেই কাঙ্গায় পৌঁছে গেছে মনে হচ্ছে।'

'কীভাবে, ফারুক? ওরা অনেক ঘুরপথে এসেছে।'

ফারুক চিন্তিত স্বরে বলল, 'আমিও তাই ভাবছি।'

তারানা বলল, 'এখন কী করবে?'

'আমাদের প্রোগ্রামে একটা ছোট্ট পরিবর্তনের দরকার হচ্ছে। আগে কাঙ্গা যাব আমরা। সত্যিই যদি ওরা এসে থাকে...'

তারানা শুকনো মুখে বলল, ' "যদি এসে থাকে" মানে?'

ফারুক তারানার দিকে শান্ত চোখে তাকাল। উত্তর দিল না। তারপর চকিতে নিজের ভুল বুঝতে পারল তারানা। শিউরে উঠল। আদিবাসীদের কথা ভুলে গিয়েছে ও। ধোঁয়াটা তাদেরও হতে পারে।

'সরি, ফারুক।'

ফারুক হাসল। 'দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমরা সাবধান থাকব। দূর থেকে লক্ষ করব, বুঝতে চেষ্টা করব। যদি টের পাই, ওরা আদিবাসী, আর এগোব না। ফিরে আসব। কিন্তু ওরা যদি আমাদেরই লোক হয়ে থাকে, প্রথমে ওদের সঙ্গে দেখা করা উচিত, তাই না?'

কবরের ঢিপি বাঁ-দিকে রেখে ধীর পায়ে সামনে এগিয়ে যায় ওরা। কাঙ্গার ক্যাম্প সাইট থেকে অট্টহাসির শব্দ ভেসে আসছে। গাছে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে সে-হাসি। বোঝা যাচ্ছে না, ওটা কার হাসি।

'এক কাজ করলে হয় না, ফারুক?'

ফারুক প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল।

'আমরা এমন একটা কিছু করি, যাতে ওদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তা হলে নিশ্চয়ই ছুটে আসবে ওরা। আমরা জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থাকি। ওরা আমাদের দেখতে পাবে না। কিন্তু আমরা ওদের দেখে ফেলব।'

ফারুক হাসল। 'সুন্দরবন লুকোচুরি খেলার জায়গা নয়, দেবী। অত বড় ঝুঁকি নিতে পারি না আমরা। তা ছাড়া জঙ্গলটাও নিরাপদ নয়। ভয়ঙ্কর সাপের আড্ডা এখানে। মনে নেই পরশুদিনের কথা?'

তারানা কেঁপে উঠল সাপের কথা ভেবে।

ফারুক বলল, 'তার চেয়ে সাবধানে এগিয়ে যাই। ক্যাম্প সাইটের পাশে লুকানোর জায়গা আছে। ওখানে দাঁড়িয়ে দেখব আমরা।'

তারানা সম্মতি জানাল।

ক্যাম্প সাইটের কাছে গিয়ে মুখ শুকিয়ে গেল ওদের। অপরিচিত একটা তাঁবু সেখানে। তাঁবুর পেছনে চুলো জ্বলছে। ভিজে কাঠ। ধোঁয়ায় ভরে গেছে জায়গাটা।

কিন্তু সরু হাঁটা-পথ ছেড়ে জঙ্গলে ঢোকার মুখে বাধা পেল ওরা। ক্যাম্পের ভিতর থেকে রুক্ষ গলার চিৎকার শোনা গেল। 'কে? কে ওখানে?'

বন্দুক কক্ করার শব্দ শোনা গেল। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল দু'জন। ফারুক চেঁচিয়ে উঠল, 'মুজিবর!'

মুজিবর বন্দুক ফেলে ছুটে এল। 'সাহেব! আপনি!··· আপনারা!!'

ছুটে এল মতি আর খায়ের। 'মেমসাহেব, ভাল আছেন?'

'হ্যাঁ। তোমরা কেমন আছ?'

মতি বলল, 'ভাল, মেমসাহেব।'

ফারুক ক্যাম্প সাইটে ঢুকল। মুরাদ চুলো থেকে কড়াই নামিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল।

'তোমরা এত তাড়াতাড়ি কিভাবে কাঙ্গায় পৌঁছেছ, মুরাদ?'

'অনেক লম্বা কাহিনী। আপনারা বসেন। রেস্ট নিন। সব বলব।'

তাঁবুর দরজার কাছে একজন অপরিচিত লোক ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। ফারুক ওর দিকে তাকাল। বেঁটে। মাথায় টাক। মুখে লাজুক হাসি। ঠোঁটের নিচে পুরু গোঁফ। ডান চোখের নিচে কালো জড়ুল। হাবভাবে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। তবু এই পরিবেশে, এমন মুহূর্তে দলের ভিতর একেবারে অপরিচিত লোক দেখলে অস্বস্তি লাগে। ফারুক আড়চোখে তারানার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল, লোকটার উপস্থিতি ওকেও ভাবনায় ফেলেছে। মুরাদ আর মুজিবরকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। ওরা নিশ্চয়ই আজেবাজে লোককে সঙ্গে রাখবে না।

মুজিবর ওদের চোখের ভাষা বুঝতে পেরেছে। পকেট থেকে একটা খাম বের করে এগিয়ে দিল। ফারুক খাম খুলে একটা চিঠি বের করল। কামার ফরিদের হাতের লেখা আর স্বাক্ষর ওর অচেনা নয়।

সে লিখেছে: 'প্রিয় ফারুক, পত্রবাহকের নাম মাহমুদ। জানি না, সে তোমার

দেখা পাবে কি না। তোমরা কোথায়, কেমন আছ, তা-ও জানি না। প্রেসিডেন্ট নিজে তোমাদের খবর জানার জন্যে অস্থির। মিস তারানা হাশিমের ব্যাপারেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। তাঁর পরামর্শ অনুসারে কিছু অস্ত্রশস্ত্রসহ মাহমুদকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি, সহযোগী হিসেবে।

'প্রাকৃতিক দুর্যোগ আর পরিবেশের প্রতিকূলতা—এসব কারণে খুব কষ্টে আছ তুমি। উপরন্তু কাঁধে বড় দুটো দায়িত্ব। একটা কাঙ্গার গোপন তথ্য বের করা, অন্যটা মিস তারানা হাশিমের নিরাপত্তা। এরপরও তোমাকে ভারাক্রান্ত করা আমার পক্ষে অনুচিত। কিন্তু একটা খবর না জানিয়েও পারছি না। রফিক নওয়াজ সাহেবের শ্যালিকা আত্মহত্যা করেছে। তুমি ওকে বড় স্নেহ করো, এ-সংবাদ তোমাকে কতখানি বিচলিত করবে, জেনেও খবরটা তোমাকে জানালাম, যাতে ভবিষ্যতে তুমি আমায় ভুল না বোঝো।

'একটা ব্যাপারে বোধহয় আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারি। অতি অপছন্দের টিভি-নায়িকাটিকে তাহলে শেষ পর্যন্ত তোমার মনে ধরেছে! স্বীকার করতে হচ্ছে, মেয়েটি শুধু অভিনয়েই নয়, আরও অনেক ব্যাপারে পটু। প্রেসিডেন্টের মন গলিয়েছে, তাতে অবাক হইনি। কিন্তু তোমাকে যদি প্রেমের ফাঁদে আটকে থাকে, সত্যিই সে ক্ষমতা রাখে।

'যদি তা-ই হয়, আমার উল্লসিত হবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে! আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, ফারুক, তারানা অনেক কিছু জানে। ড. হাশিম ওকে কিছু বলে যাননি—এটা হতে পারে না। হয়তো এতদিনে তুমিও সেটা জেনেছ। শুধু নিজের বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থেই নয়, দেশের স্বার্থেও তথ্যটা আমাদের জানা দরকার।

'আশা করি, অ্যাসাইনমেন্টের অগ্রগতি সন্তোষজনক। আজই আমরা মংলায় ফিরে যাচ্ছি। সেখান থেকে তোমাদের সাহায্যের জন্যে অতিরিক্ত ফোর্স পাঠানোর ব্যবস্থা করব। তোমাদের সাফল্য কামনা করি। শুভেচ্ছা নিয়ো। ফরিদ।'

চিঠিটা তারানার হাতে দিল ফারুক। অবসন্ন শরীরে মাটিতে বসে পড়ল। ডোপা—তারকা-বিমোহিতা সেই কিশোরীটি নেই। কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

চিঠি পড়ে তারানার চোখ ভিজে উঠল। অসহায় দৃষ্টিতে ফারুকের দিকে তাকাল ও। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলল, 'মেয়েটা···যত অল্প সময়ের জন্যেই হোক··· আমাকে··· ভালবেসেছিল। ও কেন আত্মহত্যা করল, ফারুক?'

ফারুক দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'জানি না।'

'দুনিয়ার সব সরল মানুষের কষ্ট একটাই। ভালবেসে কষ্ট পায়।'

ফারুক মাহমুদের দিকে তাকাল। 'ওদের খুঁজে পেলেন কীভাবে?'

মাহমুদ ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলল, 'পুলিসের গানবোট আমাকে চর নিহাল ফাঁড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম, একা কাঙ্গায় গিয়ে আপনাদের খুঁজে বের করব। তার আর দরকার হয়নি। ফাঁড়িতে এসে ওঁদের পেয়ে গেলাম।'

ফারুক বলল, 'আপনার গলার এমন হাল কেন? ঠাণ্ডা লেগেছে?'

মাহমুদ বলল, 'না। গলাটাই এমন।'

'তোমাদের পেটে কিছু পড়েছে?'

মাথা দোলাল মুরাদ। 'চর নিহালের ফাঁড়িতে খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিছু চাল-ডাল জোগাড় করে এনেছি। তিনটে তাঁবুও পেয়েছি।'

'চমৎকার!' মুরাদের পিঠ চাপড়ে ফারুক বলল, 'একটা তাঁবু খাটাও মেমসাহেবের জন্যে। আমার জন্যে একটা। বড় তাঁবুতে তোমরা সবাই থাকবে। মতি আর মুজিবর ভোর বেলায় উঠে চলে যাবে এড়েঙ্গা। নতুন সঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। বাকি জিনিসপত্র উদ্ধারের চেষ্টা করবে। মুরাদ থাকবে ক্যাম্পে। খায়ের ওকে সাহায্য করবে। আমি যাব শিকারে। মেমসাহেবের যদি দয়া হয় সঙ্গে যেতে পারেন।'

তারানার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে কথা শেষ করল ফারুক। তারানা ইঙ্গিতটা বুঝল।

মুখ টিপে হাসল ও। 'দয়া হবে কিনা এখনই বলতে পারছি না।'

মাহমুদ নাকিসুরে প্রতিবাদ করতে চেষ্টা করল। 'আমি···মানে··· নতুন মানুষ···পথ ঘাট চিনি না···'

ফারুক বলল, 'সেজন্যেই ওদের সঙ্গে পাঠাচ্ছি আপনাকে।'

মাহমুদ বলল, 'কামার ফরিদ সাহেব বলেছিলেন সব সময় আপনার সঙ্গে থাকতে।'

ফারুকের চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল। তারানা ওকে লক্ষ করে চিন্তিত হলো। মৃদু স্বরে বলল, 'থাক না, ফারুক। নতুন মানুষ। যেতে চাইছেন না যখন···'

ফারুক বলল, 'ওদের সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি আছে?'

'আপত্তি···মানে···আমি বলছিলাম···'

অধৈর্য হয়ে ফারুক বলল, 'বুঝতে পেরেছি, মিস্টার মাহমুদ। এফ এণ্ড এফ কোম্পানির নিয়ম-শৃঙ্খলা সম্পর্কে আপনাকে কিছু জানানো হয়নি। এখানে এসে পৌঁছনোর আগে যা-ই বলা হোক, এখন আপনি সম্পূর্ণভাবে আমার নেতৃত্বে কাজ করবেন।'

ফারুকের চোখের দিকে তাকিয়ে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল মাহমুদ। কিন্তু সেটা ভয়ে না বিরক্তিতে, বোঝা গেল না।

ছোট তাঁবুটা খাটানোর কাজে খায়ের আর মুজিবরকে সাহায্য করার জন্যে উঠে পড়ল ফারুক। পা বাড়ানোর আগে বলল, 'কাল সকালে মতি আর মুজিবরের সঙ্গে এড়েঙ্গা যাবেন আপনি।'

খাওয়া-দাওয়ার পর তারানা আশা করেছিল, ফারুক ওর কাছে এসে বসবে। কিন্তু অনেকক্ষণ পরেও ফারুককে দেখতে না পেয়ে উঠে পড়ল তারানা। বড় তাঁবুতে উঁকি দিল। তাস খেলছে মুজিবর, মুরাদ, খায়ের আর মাহমুদ।

মাহমুদ বারবার চালে ভুল করছে। মুজিবর চটে উঠল এক পর্যায়ে।

'কী ব্যাপার, মিয়া? রঙের পিটটা ছেড়ে দিলেন কেন?'

'ছেড়ে দিলাম নাকি?'

মাহমুদ আর মুজিবরের বিপরীত পক্ষে বসেছে মুরাদ আর খায়ের। খায়ের সহানুভূতির সুরে বলল, 'বাদ দাও, মুজিবর ভাই। নতুন লোক···নতুন জায়গায় এসে ঘাবড়ে গেছে।'

'ধ্যেৎ! কেবলই ভুল করছে মাহমুদ মিয়া। এমন পার্টনার নিয়ে খেলা যায় নাকি?'

তারানা মজা পেল ওদের কথায়। বসে পড়ল তাসখেলা দেখতে। লক্ষ করল, আসলে খেলায় মন নেই মাহমুদের। বাইরে কখন কিসের শব্দ হচ্ছে, সেটা বোঝার জন্যেই তার আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। বারবার চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কিন্তু পার্টনারদের সেটা বুঝতে দিতে চায় না। হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাঙ্গায় আসতে বাধ্য হয়েছে লোকটা। হয়তো ভয় পাচ্ছে।

ফারুক কোথায় গেল? খোঁজ নেয়া দরকার। উঠে পড়ল তারানা।

তাঁবু থেকে বেশ কিছুটা দূরে ফাঁকা জায়গায় পায়চারি করছে ফারুক। তারানা ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'অ্যাই, কী ভাবছ?'

ফারুক তারানার হাত নিজের মুঠোয় তুলে নিল। কিছু বলল না।

তারানা বলল, 'মন খারাপ?'

ফারুক বলল, 'ডোপার জন্যে খুব খারাপ লাগছে।'

'আমারও।'

ফারুক তারানাকে জড়িয়ে ধরল। কপালের ওপর ওর উষ্ণ নিঃশ্বাস অনুভব করল তারানা। নিঃশ্বাস ক্রমেই উষ্ণতর হয়ে উঠল। ফারুকের মুখ ক্রমেই নিচে নেমে আসছে। তারানার মুখ ছুঁয়ে এক সময় কাঁপতে লাগল সেটা।

অনেকক্ষণ পর তারানা বলল, 'নতুন লোকটার সঙ্গে খুব রূঢ় আচরণ করেছ তুমি। না করলেও পারতে।'

ফারুক চিন্তিত স্বরে বলল, 'পরীক্ষা করছিলাম ওকে।'

'কী মনে হলো?'

'লোকটা সুবিধের নয়।'

তারানা ভয়ে ভয়ে বলল, 'এখন কী করতে চাও?'

'বিজনপুর অপারেশনে ওকে সঙ্গে নেব না। কাছাকাছিও রাখতে চাই না। এড়েঙ্গায় যেতে চাইবে না, এটাই স্বাভাবিক, তবু ওকে জোর করে পাঠাতে হবে।'

'বেশ, মানলাম। কিন্তু ও যদি রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যায়?'

'কাজের কথা বলেছ। সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না। সবাইকে সাবধান করে দিতে হবে। তুমি শোও গিয়ে। আমি ওদের জন্যে অপেক্ষা করব।'

ফারুকের কাঁধে মাথা রাখল তারানা। 'তোমাকে ছেড়ে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না আমার।'

ফারুক একটু ভেবে বলল, 'আমার তাঁবুতে চলো।'

তারানা হেসে ফারুকের বুকে মুখ গুঁজল।

আট

তারানা ফারুকের চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, ' "আজ কিছুতেই মন ভার যায় না," তাই না?'

ফারুক কিছু বলল না।

তারানা ওর পিঠে আলতো করে কিল বসিয়ে বলল, 'তুমি আমার কোন কথাই শুনছ না।'

ফারুক বলল, ' "তুমি কি যে বলো, বুঝি না! তোমার মুখের পানে চাহিলে আমি কিছু শুনি না," বুঝতে পেরেছ?'

'ছেলে-ভুলানো কথা রেখে আসল কথা বলো।'

ফারুক তারানাকে বুকের ভিতর জাপটে ধরে বলল, 'আসল কথাটা এই যে, মনে হচ্ছে, এড়েঙ্গার মাচায় ফিরে যাই আমরা। শুধু তুমি আর আমি। আশেপাশে কেউ থাকবে না। শুধু নিবিড় অরণ্য। রাতজাগা পাখি।'

'আর বাঘ, সাপ, কুমির···'

ফারুক তারানার চিবুকে চিমটি কেটে বলল, 'আমিই তোমার বাঘ। তুমিই আমার সাপ।'

'সত্যি করে বলো তো, ফারুক, জঙ্গল কেন এত ভালবাসো তুমি?'

ফারুক বলল, 'জঙ্গল ছাড়া আর কোথায় তোমাকে এমন নিবিড় করে পাব, বলো তো? আর কোথায় এমন চিৎকার করে ভালবাসার কথা বলতে পারব? এমন শব্দ করে চুমু খেতে পারব?'

তারানা বলল, 'এড়িয়ে যাচ্ছ।'

ফারুক গম্ভীর হয়ে গেল। 'তোমাকে তো একদিন বলেছি, তারানা! মানুষের জঙ্গলকেই আমি সবচেয়ে বে শি ভয় পাই। ওই জঙ্গলের তুলনায় সুন্দরবন অনেক নিরাপদ।'

'মানুষ তোমাকে খুব দুঃখ দিয়েছে?'

ফারুক হাসল। 'শুধু দুঃখ দেয়নি, মানুষ আমার ওপর পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সরীসৃপের মত ছোবল দিয়েছে গোপনে।'

তারানা ফারুকের বুকে মাথা রাখল। 'সব ঠিক হয়ে যাবে, ফারুক। আমরা মানুষের জঙ্গলে উঁচু মাচা বানাব। জানোয়ার আমাদের ছুঁতে পারবে না। মন খারাপ কোরো না।'

বড় তাঁবু থেকে মুজিবরের চিৎকার ভেসে এল। 'রং বের করো।'

ফারুক তারানার কাছে এগিয়ে এল। তারানা ওর নিঃশ্বাসের ওপর ফারুকের নিঃশ্বাস অনুভব করে কাঁপতে লাগল।

ঘুমিয়ে পড়েছিল তারানা। ফারুক ধীরে ধীরে ওর শরীর থেকে হাত সরিয়ে আনল। ওকে জাগানো দরকার। ভোর বেলা কেউ যদি এই তাঁবুতে উঁকি দেয়, বিশ্রী

ব্যাপার হবে। কিন্তু জাগাতে গিয়ে মায়া হলো ফারুকের। অঘোরে ঘুমাচ্ছে তারানা।

তাঁবুর বাইরে পায়ের শব্দ। ফারুক চমকে উঠে বসল। উৎকর্ণ হলো। কে যেন ঘোরাফেরা করছে পা টিপে টিপে। নিঃশব্দে তাঁবুর কোনায় চলে গেল ফারুক। ছোট ছিদ্র খুঁজে বের করে তাকাল বাইরে। চমকে উঠল। মাহমুদ তাঁবুর দরজা খোলার চেষ্টা করছে।

ফারুক দড়িতে ঝোলানো প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বার করে প্রস্তুত হলো। মাহমুদ বোধহয় কোন শব্দ শুনতে পেয়েছে। দরজা না খুলে পিছনে সরে গেল। অপেক্ষা করল কয়েক সেকেণ্ড। ফারুক বুঝতে পারছে না, ও একা কিনা।

ফারুক দরজার কাছে ছিদ্র দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল। হাতে মস্ত একটা ছোরা। লোকটাকে আশ্রয় দেবার আগে ভালভাবে পরীক্ষা করা উচিত ছিল। কামার ফরিদের চিঠির ওপর চোখ বুজে ভরসা করার কোন মানে হয় না। ওকে খুন করতে এসেছে মাহমুদ। আর একটু হলেই প্রাণটা খুইয়েছিল ফারুক।

মুরাদ আর মুজিবরের কোন সাড়া নেই। হয়তো মাহমুদের ওপর পাহারার ভার দিয়ে ঘুমিয়েছে ওরা। এটাও মস্ত ভুল। নতুন লোকটার সঙ্গে ওদের যে কোন একজনের জেগে থাকা উচিত ছিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর আবার দরজা তুলল মাহমুদ। হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়ল। ফারুকের শোবার জায়গাটা পরখ করল। তারানা শুয়ে আছে ওই জায়গায়। ছোরা উঁচু করল মাহমুদ। আর দেরি করা যায় না। ঝুঁকিটা বেশি হয়ে যাচ্ছে।

ফারুক চেঁচিয়ে উঠল, 'এতটুকু নড়লে মাথা দু'ফাঁক করে দেব, হারামজাদা। প্রথম থেকেই তোমাকে আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

মাহমুদ প্রথমে ভয়ে কেঁপে উঠল। তাঁবুর ভিতরে একাধিক মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা হয়তো তার কল্পনায় আসেনি। কিন্তু লোকটা সেয়ানা, কোন সন্দেহ নেই। মুহূর্তে সামলে নিল। বাঁ-হাতে তাঁবু ধরে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে চোখের পলকে বেরিয়ে গেল।

ফারুক বেরিয়ে দেখল, দৌড়ে পালাচ্ছে সে। তারানা বেরিয়ে এল তাঁবুর ভিতর থেকে। ছুটল বড় তাঁবুর দিকে।

ফারুক গুলি করল। সুন্দরবন কেঁপে উঠল গুলির শব্দে। ছুটে পথে নেমে এল ফারুক। পালাচ্ছে মাহমুদ। গুলি লাগেনি। আবার গুলি করল ও।

এলোমেলোভাবে দৌড়াচ্ছে সেয়ানা লোকটা। গুলি করার আশা ছেড়ে ওর পেছন পেছন দৌড়াল ফারুক। যেভাবেই হোক ধরতে হবে ওকে। পালাতে দেয়া চলবে না।

তারানা বড় তাঁবুর দরজা খুলে ধাক্কা দিল মুজিবরের গায়ে। বেহুঁশের মত ঘুমাচ্ছে মুজিবর। মুরাদেরও একই অবস্থা। তাঁবুর ভিতরে সিগারেটের ধোঁয়ার কটু গন্ধ।

ধড়মড় করে উঠে বসল মতি। 'কী হয়েছে, মেমসাহেব?'

'ওই যে···নতুন লোকটা···ফারুককে খুন করতে গিয়েছিল। পারেনি। ফারুক তাড়া করেছে···ওই যে···'

মতি বেরিয়ে পড়ল। আরও অনেক ধাক্কাধাক্কির পর উঠল মুজিবর। তারপর উঠল মুরাদ। বেশ কিছুক্ষণ লাগল ঘুমের ঘোর কাটতে। মতি গেছে সাগরপারের দিকে। মুজিবরকেও ওইদিকে পাঠানো হলো। মুরাদ আর খায়ের গেল বিপরীত দিকে।

সুযোগমত আবার গুলি চালাল ফারুক মাহমুদের পা লক্ষ্য করে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মাহমুদ। ফারুক ধরে ফেলার আগেই উঠে পড়ল আবার। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটল ড. হাশিমের কবরের দিকে। তারপর ধরা পড়ল মুরাদ আর খায়েরের হাতে। ওরা মাহমুদকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এল ক্যাম্পে।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ফারুকের সামনে দাঁড়াল মাহমুদ। মুরাদের মুখে একই সঙ্গে বিজয়ের আনন্দ আর উত্তেজনা। 'এ লোক মাহমুদ না, সাহেব।'

ফারুক শান্ত গলায় বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। কিছুতেই ভাবতে পারছিলাম না, কামার ফরিদ এমন কাজ করতে পারে। ও শয়তান নয়, ইডিয়টও নয়।'

মুরাদ লোকটার মুখ থেকে জোর করে হাত টেনে সরিয়ে দিল। ভয়ে পাংশু মুখে ফারুকের দিকে তাকাল সাজেদ আলী।

এবার ফারুকও চমকে ওঠে। 'তুমি!'

তারানাও ওকে চিনতে পেরেছে। অজান্তে ওর মুখ থেকে বেরিয়ে এল কথাগুলো। 'হোটেল শিবসার সেই···'

ফারুক গম্ভীর মুখে বলল, 'হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছ। ওর নাম সাজেদ। ওয়াজেদের ভাই। মাথা ন্যাড়া করে, নকল গোঁফ লাগিয়ে, চোখের নিচে রং মেখে চমৎকার ধোঁকা দিয়েছে আমাদের। গলার স্বরটা অমন বিকৃত করার কায়দা কোথায় রপ্ত করেছ, ছোকরা?'

ওয়াজেদের মত নার্ভাস হয়ে পড়েনি সাজেদ। তবে ভীষণ হাঁপাচ্ছে।

'স্যার—' স্বাভাবিক স্বরে সাজেদ বলল, 'আমার··· একটা···কথা শুনবেন, স্যার?'

'মাত্র একটা?' কৌতুকের সুরে ফারুক বলল, 'সারাদিন ধরে তোমার কথা শুনব, স্যার সাজেদ আলী। তুমি অতি বড় ওস্তাদের ওস্তাদ। তোমার প্রতিভার তুলনা হয় না। আমার পার্টনার কামার ফরিদ বেচারার জন্যে দুঃখ হচ্ছে। বেচারা হন্যে হয়ে তোমায় খুঁজছে। আমাদের খুবই দরকার ছিল তোমাকে। খুবই ইম্পর্ট্যান্ট মানুষ তুমি।'

তাঁবুর দড়ি খুলে বাঁধা হলো সাজেদকে। ওকে দেখতে লাগছে জবাইয়ের জন্যে বেঁধে রাখা ছাগলের মত।

ফারুক ওর তলপেট লক্ষ্য করে লাথি ছুঁড়ল। সাজেদের মুখ বিকৃত হয়ে জান্তব শব্দ বেরিয়ে এল। চিৎকার বা কান্নাকাটি কিছুই করল না সে। বরং চাপা স্বরে আর্তনাদ করে উঠল তারানা।

ফারুক আরও একটা লাথি বসাল সাজেদের পিঠে। মাটিতে শুয়ে পড়ল সাজেদ। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল।

'আর মারবেন না, স্যার। আমি সব বলব। সব বলব।'

'শুরু করো। আমাকে খুন করতে গিয়েছিলে কেন?'

'আমি···খুন করতে যাইনি, স্যার।'

ফারুক প্রশ্নবোধক দৃষ্টি মেলে সাজেদের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কাঙ্গার আদিবাসীদের নেতা···আমাকে···পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়েছে। বলেছে, "কোন অবস্থাতেই যাতে মেমসাহেব কাঙ্গায় যেতে না পারে, সে-ব্যবস্থা করতে হবে। যদি কোন রকমে গিয়ে পৌঁছতে পারে, তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনাতে হবে।" '

'তারপর!'

'আমি চেষ্টা করেছি, স্যার।'

'কীভাবে?'

'অন্য ট্র্যাভল্ এজেন্সিগুলোকে ভয় দেখিয়েছি; কিছু টাকাও খরচ করেছি। আপনার এজেন্সিতে কাজে লাগিয়েছি ওয়াজেদকে।' ওয়াজেদ ধরা পড়ে গেছে শুনে নিজেই ছুটে এসেছি। আদিবাসীদের কিছু লোকজন মংলায় আছে, স্যার। ওরাই ব্যবস্থা করল।'

তারানা বলল, 'কিন্তু তুমি নিজেই আমাকে বলেছ, এফ এণ্ড এফ লিমিটেডে তোমার ভাই আছে, সে আমাকে কাঙ্গায় নিয়ে যাবার ব্যাপারে ফারুক সাহেবকে রাজি করাতে পারবে!'

সাজেদ দম নিয়ে বলল, 'ও-কথা বলেছিলাম···আপনার কাছে বিশ্বস্ত থাকবার আশায়···যাতে···আপনি আমাকে সন্দেহ না করেন। আমি চাইনি, ম্যাডাম, আপনি সত্যিই কাঙ্গায় যান।'

ফারুক বলল, 'তুমি আদিবাসীদের নেতাকে চেনো?'

'না, স্যার। সবসময় ওর লোকেদের মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়। মংলায় থাকতে গেলে ওদের কথা না শুনে উপায় নেই, স্যার।'

'থামো!' গর্জে উঠল ফারুক। 'নিশ্চয়ই উপায় ছিল। টাকা খেয়েই সব গোলমাল করে ফেলেছ তুমি!'

সাজেদ মাথা নিচু করে রইল।

ফারুক বলল, 'এখানে এসে পৌঁছলে কীভাবে?'

'পুলিসের গানবোটের পিছন পিছন এসেছি, স্যার। মাহমুদকে যখন চর নিহালের ফাঁড়ির কাছে নামিয়ে দিল ওরা, আমিও নেমে পড়লাম। পথেই ধরে ফেললাম মাহমুদকে। মাহমুদ প্রস্তুত ছিল না। সহজেই কাবু করে ফেললাম ওকে।'

'মাহমুদ কোথায়?'

'চর নিহাল ফাঁড়ি থেকে ওকে আবার গানবোটে তুলে দেয়া হয়েছে।'

ভীষণ রুক্ষ শোনাল ফারুকের গলা। 'জানতে চাই, এখন সে কোথায়?'

অসহায় মুখে সাজেদ বলল, 'জানি না, স্যার।'

ফারুক রিভলভারের বাঁট দিয়ে সাজেদের কাঁধে বাড়ি মারল। 'সময় বেশি নেই, সাজেদ আলী। ঝটপট উত্তর দাও।'

সাজেদ ককিয়ে উঠল, 'আমি সত্যিই জানি না, স্যার। যা জানি, সবই বলেছি। আর কিছু জানি না।'

'মিথ্যে কথা!' গর্জে উঠল ফারুক। 'একটা কথা নিশ্চয়ই জানো তুমি! কেন ওরা তারানাকে কাঙ্গায় আসতে দিতে চায় না?'

'জা-জানি না, স্যার।'

সাজেদের পিঠে আবার একটা বাড়ি পড়ল।

'স্যার···আমাকে আর মারবেন না।'

'বেশ!' শান্ত মুখে বলল ফারুক। রিভলভারটা তাক করল সাজেদের বুক লক্ষ্য করে। আঙুল রাখল ট্রিগারের ওপর। সাজেদ অপলক চোখে তাকিয়ে আছে রিভলভারের দিকে। ওর মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে দ্রুত। অসম্ভব ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওকে।

'ঠিক তিন সেকেণ্ড সময় পাবে, সাজেদ আলী। আমার ধৈর্যশক্তি খুব কম,' নির্বিকারভাবে বলল ফারুক।

দু'সেকেণ্ডের মাথায় আর্তনাদ করে উঠল সাজেদ আলী, 'স্যার! মারবেন না। বলছি।'

ফারুক রিভলভার নামাল না।

'ওদের···ধারণা···ড. আবুল হাশিম মৃত্যুর আগে ম্যাডামের কাছে কোন গোপন খবর দিয়ে গেছেন।'

'গোপন খবর মানে?'

'ড. হাশিম "বিজনপুর" নামে একটা পুরানো কেল্লা আবিষ্কার করেছিলেন। ম্যাডাম সেটা জানেন।'

'তাতে ওদের কী লাভ?'

' "বিজনপুর" ওদের। ওরা চায় না, কেউ ওখানে যাক। ড. হাশিম খুন হয়েছিলেন। ম্যাডাম খুন হোক, এটা ওরা চায় না।'

'কেন?'

হাউমাউ করে কেঁদে উঠল সাজেদ। 'আর কিছু জানি না, স্যার, মেরে ফেললেও আর কিছু বলতে পারব না। আমায়···মাফ করে দিন, স্যার। জীবনেও এসব কাজে আর হাত দেব না।'

ফারুক রিভলভার নামিয়ে তারানার দিকে তাকাল। তারানা তাকিয়ে আছে ফারুকের দিকে। চোখে পলক নেই।

ফারুক সঙ্গীদের দিকে ফিরে তাকাল। 'নাশতার পর আগের প্রোগ্রাম অনুযায়ী সব চলবে। অতিরিক্ত কাজের মধ্যে শুধু এই: মুরাদ আর খায়ের যাবে চর নিহাল ফাঁড়ি। পুলিসের সাহায্য নিয়ে মাহমুদকে খুঁজে বার করতে চেষ্টা করবে।'

মুরাদ জিজ্ঞেস করল, 'আর সাজেদ?'

'ও এখানেই বাঁধা থাকবে। ওর চোখে-মুখে শক্ত করে কাপড় বেঁধে দাও।'

নয়

বিকেলবেলা বিজনপুরের পথ খুঁজে পাওয়া গেল। সকাল থেকে প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল ওরা। ফারুকের যতটুকু দ্বিধা ছিল ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে, সাজেদের বিবৃতির পর সেটুকু কেটে গেছে। তারানার ম্যাপের সঙ্গে নিজের ম্যাপ মিলিয়ে ফারুক আরও আশাবাদী হয়ে উঠল।

বিজনপুরের পথ যখন খুঁজে পাওয়া গেছে, তখন ম্যাপ ঠিকই আছে। ফারুকই প্রথম ইঙ্গিত করল জায়গাটার দিকে। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে গিয়ে পথটা মিশেছে একটা গোলপাতার ঝোপে। বাইরে থেকে মনে হয়, শেষ হয়ে গেছে পথ। কিন্তু ম্যাপের বিবরণ অনুসারে বিজনপুরের ধ্বংসাবশেষ ওখান থেকেই শুরু।

'খুব সাবধানে এগোতে হবে,' ফিসফিস করে বলল ফারুক।

তারানা ফারুকের হাত আঁকড়ে ধরল। 'তোমার পাশে দাঁড়িয়ে মরতেও আমার ভয় নেই।'

রিভলভার পকেটে রেখে কোমরে ঝোলানো শক্ত ছুরিটা হাতে তুলে নিল ফারুক। ঝোপ, ডালপালা কাটতে কাটতে লক্ষ করল, শক্ত পাথরের দেয়ালে একটা ফাঁক আছে। টর্চের আলো ফেলতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল সব।

ফারুকের পেছন পেছন দেয়ালের ফোকর গলে ওপাশে গিয়ে তারানা বলল, 'কেউ কল্পনাও করতে পারবে না, এখানে পথ আছে। কপাল ভাল।'

ফারুক তারানার কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, 'দার্শনিক গে বলেছেন, কপাল ভাল হলে একটা পাত্র খুঁজে পেতে পারো, কিন্তু পানিটুকু ফুটিয়ে নিতে হবে পরিশ্রম করেই।'

তারানা বলল, 'চমৎকার! একই সঙ্গে ভাগ্য আর শ্রমের এমন তারিফ খুব কম শোনা যায়।'

এগিয়ে গেল ওরা। চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর বুলিয়ে ফারুক বলল, 'পথটা মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয়, তারানা। একেবারে পরিত্যক্ত নয়।'

তারানা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'বাবা এ-পথ ব্যবহার করেছেন, তার প্রমাণ তো পাচ্ছি!'

'হ্যাঁ। ড. হাশিম এ-পথেই বিজনপুরে ঢুকেছিলেন। কিন্তু তিনিই শেষ যাত্রী নন। আরও অনেকে আসা-যাওয়া করে এ-পথ দিয়ে।'

কিছুদূর যাবার পরই পথটা সিঁড়িতে রূপান্তরিত হলো। তারানা ফারুকের হাত আঁকড়ে ধরে। ফারুক প্রথম সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল। কান পেতে শুনতে চেষ্টা করল, নিচের অন্ধকার এলাকা থেকে কোন শব্দ আসে কি না।

না, কোন শব্দ নেই।

তারানা বলল, 'মানুষ আছে বলে মনে হয় না। মানুষ থাকলে আলোর দিশা পাওয়া যেত!'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেল ওরা।

'সুন্দরবনের পাতালে এমন পাথরের সিঁড়ি, শক্ত দেয়াল আর রাস্তা আছে

জানতে পেলে দেশের মানুষ কেমন উৎফুল্ল হবে, ভাবতে পারো? কেউ কখনও কল্পনাও করেনি।'

ফারুক বলল, 'হুঁ। নিজের অনুভূতি থেকেই বিচার করতে পারছি।'

ইট আর সুরকির ভগ্নস্তূপ চোখে পড়ল। কোন কোন জায়গায় স্তূপের নিচে উঁকি দিচ্ছে কাঠের দরজা আর ভাঙা আসবাব। বোঝা যায়, ওগুলো ঘরবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। একদিন ওখানে মানুষ বাস করত। নারী, পুরুষ আর শিশুর হাসি-কান্না-চিৎকারে ভরে থাকত জায়গাটা। ভেবে রোমাঞ্চিত হলো তারানা। গর্বে বুক ফুলে উঠল। ওর বাবা—ড. আবুল হাশিম আবিষ্কার করেছিলেন এই হারিয়ে-যাওয়া জনপদের অস্তিত্ব। ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন তিনি। নতুন করে লেখা হবে সুন্দরবনের ইতিহাস। দলে দলে আসবেন গবেষকরা। গবেষণা চলবে দিনের পর দিন। ধীরে ধীরে জানা যাবে এ-জনপদের পুরো ইতিহাস। আর তারানা, ফারুকের নাম লেখা হবে নতুন যুগের সেই অকুতোভয় অভিযাত্রী হিসেবে, যারা সবার ভয়, সন্দেহ আর আক্রোশ উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে ড. আবুল হাশিমের বিজনপুর। নতুন করে এর নাম হাশিমপুর রাখা যায় না?

'তারানা, অন্যমনস্ক হয়ো না। এটাকে পাহাড়পুর কিংবা মহাস্থানগড় মনে করার কোন কারণ নেই।'

তারানা হেসে ফেলল। 'সরি, লীডার। হঠাৎ করে খুব ইমোশনাল হয়ে পড়েছিলাম।'

প্রশস্ত পথ শেষ হয়ে এল। দু'দিকে দুটো সরু পথ চলে গেছে দুটো বড় দেয়ালের আড়ালে। দেয়ালের ওপাশে আলো না অন্ধকার, বোঝা যাচ্ছে না।

তারানা বলল, 'ডানদিকের পথটা ধরে যাওয়া যাক, কি বলো?'

ফারুক চিন্তিত স্বরে বলল, 'তার আগে নিশ্চিত হওয়া উচিত ভিতরে কেউ আছে কি না। এখানে যদি কেউ আমাদের আটকে ফেলে, তবে ড. হাশিমের আবিষ্কার আমাদের সঙ্গেই পাতালে পচে মরবে।'

দেয়ালের পাশে ঝোপ-জঙ্গল। একটা সাপ বেরিয়ে সোজা চলে গেল দেয়ালের অপর পাশে।

তারানা চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। ফারুক তারানার মুখে হাত চাপা দিল।

'ফারুক,' কাঁদো কাঁদো স্বরে তারানা বলল, 'সাপকে আমি বড্ড ঘৃণা করি। কিছুতেই ওদের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারি না।'

ফারুক পথের পাশে একটা ভাঙা দেয়ালে ধাক্কা দিল। কিছু সুরকি খসে পড়ল। ফাঁকের ভিতর দিয়ে উঁকি দিল ফারুক।

'কিছু পেলে?'

ফারুক হাত ঝেড়ে বলল, 'নাহ্। বুঝতেই পারছি না, ধ্বংসাবশেষের শেষটা কোথায়! জায়গাটা কত বড়, নিচে আরও দু'এক স্তর আছে কিনা কে জানে?'

বাঁ-দিকের ধ্বংসস্তূপের ভিতর ঢুকে পড়ল ওরা। গাছ-গাছালিতে ভরে গেছে জায়গাটা। সুন্দরবনের মাটির নিচে অন্য এক জঙ্গল! একটা ভাঙা ল্যাম্পপোস্ট চোখে পড়ল। নিচে ড্রেনের চিহ্ন।

'কোন সভ্য সমাজ এখানে বাস করত, ভেবে পাই না,' নিচু স্বরে তারানা বলল, 'যেখানেই যাচ্ছি, কিছু কিছু আধুনিক প্রযুক্তির প্রমাণ পাচ্ছি।'

ফারুক বলল, 'সভ্যতা মানুষের কাছে চিরদিনই আধুনিক। সভ্যতা কখনও বাতিল হয় না। কে জানে, এটা কয়শো বছর আগের, তবু মনে হয় আজকেরই জিনিস।'

তারানা ফারুকের কাঁধে কোমল পরশ রেখে বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। সভ্যতার আসল ক্ষেত্র মানুষের মন। হাজার বছর আগের মানবিকতা, গণতন্ত্র, কল্যাণ রাষ্ট্র, আইন-বিচার, এইসব জ্ঞান এখনও মানুষের সব রাষ্ট্রচিন্তার পাথেয়।'

ফারুক তারানার কাঁধে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'চমৎকার বলেছ। আমরা কিন্তু···'

ফারুকের কথা শেষ হলো না। তারানা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ফারুক! কি বিশাল দালান! আর দেখো, কি চমৎকার মূর্তি!'

ফারুক টর্চের আলো ফেলল পাঁচতলা দালানের খিড়কিতে। একটা সুন্দর কালীমূর্তি বসানো আছে। পথটা এখানে দু'ভাগ হয়ে গেছে। একটা ঢুকে পড়েছে দালানের ভিতর, অন্যটা বেরিয়ে গেছে।

তারানা বলল, 'আমার মনে হয়, এটা ওদের দুর্গ বা ওইরকম কিছু একটা হবে। জানালা নেই। দরজাগুলো বড় বড়। অনেকটা আমাদের জেলখানার মত।'

ফারুক তাকিয়ে রইল প্রবেশ পথের দিকে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তারানা বলল, 'কে জানে, বাবা এর সবটা দেখে যেতে পেরেছিলেন কি না!'

'লুকিয়ে থাকার জন্যে চমৎকার জায়গা, তারানা। নিশ্চয়ই কেউ লুকিয়ে আছে এখানে। অথবা কিছু লুকিয়ে রাখা হয়েছে।'

একটু একটু করে সামনে এগিয়ে চলল ওরা। দু'জোড়া চোখ চঞ্চল দৃষ্টি মেলে খুঁজে ফিরছে প্রমাণ।

'ফারুক, এমনও তো হতে পারে, আমরা যাদের সন্দেহ করছি, তারা এই ধ্বংসস্তূপের খবর জানে না! হয়তো এদিকে আসেনি ওরা!'

'হতে পারে, কিন্তু সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে তো ঝুঁকি নেয়া যায় না! আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। এমনও হতে পারে, আশেপাশেই রয়েছে ওরা। আমাদের গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে। যদি তাই হয়, এখানে বেশিক্ষণ থাকা আমাদের উচিত হবে না।'

তিনটে দালান পার হয়ে এক জায়গায় এসে তারানা থমকে দাঁড়াল। দুটো ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে একটা বিরাট, উঁচু চৌবাচ্চার মত ঘর। কোন দরজা, জানালা বা ছিদ্র নেই। ওপরের দিকে কয়েকটা গোল ছিদ্র। সেখান থেকে লোহার মই নেমে গেছে ভিতরের দিকে। তারানা একবার চট্টগ্রামে জ্বালানী তেলের ইনস্টলেশন্‌স্ দেখতে গিয়েছিল। ঘরটাকে দেখাচ্ছে সেই তেলের ট্যাঙ্কগুলোর মতই।

'এটা নিশ্চয়ই পানির রেজারভয়ার! শহরের সব পানি সরবরাহ হত এখান

থেকে!'

নিরাসক্ত সুরে ফারুক বলল, 'হতে পারে।'

তারানা বেশিক্ষণ চৌবাচ্চার কাছে দাঁড়াল না। এগিয়ে চলল সামনে। হাতে কাগজ-কলম থাকলে বেশ হত! সবচেয়ে ভাল হত ক্যামেরা থাকলে। ঢাকায় ফিরে দেশবাসীকে— শুধু দেশবাসীকে কেন— বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিতে পারত।

ফারুকের চোখে পড়ছে শুধু স্থাপত্যের অদ্ভুত সব কৌশল, প্রযুক্তির নানান প্রয়াণ, কিন্তু যা খুঁজছে, তার কোন চিহ্নই নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল, তারানার অনুমানই ঠিক। দুষ্কৃতকারীরা হয়তো এই জায়গার হদিস পায়নি। কিন্তু তা হলে ড. আবুল হাশিমকে খুন করল কারা? আদিবাসীরাই? নাকি, আগাগোড়া ভুল অনুমানের ওপর এগোচ্ছে ওরা? ড. হাশিম আদৌ খুন হননি? নেহাত একটা দুর্ঘটনা?

একটা ধ্বংসস্তূপের ওপর দুটো বড় শক্ত পাথরের দিকে ফারুকের নজর পড়ল। পাথর দুটোকে ওই জায়গায় অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে, কেউ ওগুলো তুলেছে ধ্বংসস্তূপের ওপর। ফারুক পাথরগুলোর ওপর উঠে বসল। এলাকাটার দিকে নজর রাখার চমৎকার ব্যবস্থা। ইচ্ছে করলে শোয়াও যায়। পাহারা দেয়ার কাজে এটা ব্যবহার করা হয় নাকি?

ভাবতে ভাবতে নেমে পড়ল ফারুক। তারানা ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে পোড়ামাটি আর লোহার তার খুঁজে পেয়েছে। গভীর মনোযোগে দেখছে সেগুলো। জুতোর নিচে একটা শক্ত জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করল ফারুক। হাতে তুলে নিল জিনিসটা।

একটা স্ক্রু।

অনুমান ভুল নয়। ফারুক স্ক্রু নাড়াচাড়া করতে করতে ভাবল, এখানে লোকজন আসে। এখানে বসে যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করে ওরা। হয়তো রিভলভার খুলে পরিষ্কার করার সময় স্ক্রু পড়ে গেছে, আর খুঁজে পায়নি।

'তারানা!'

তারানাকে দেখতে পেল না ফারুক। চমকে উঠল ও। আবার ডাকল নিচু স্বরে।

রেজারভয়ারের কাছে টর্চের আলো জ্বলে উঠল। ফারুক দ্রুত পায়ে ছুটল সেদিকে। ওখানে কেন তারানা?

তারানার মুখে চাপা হাসি। চোখে অনুসন্ধিৎসা। ড. আবুল হাশিমের মেয়েই বটে। 'ফারুক, ছুরিটা দাও না! এর ভিতরে কি আছে, দেখতে চাই।'

ফারুক হতাশ হয়ে ছুরিটা তারানার হাতে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, তাড়াতাড়ি সারবে। আমি ততক্ষণে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিই।'

চৌবাচ্চার পেছনদিকে চলে এল ফারুক। স্ক্রুর ব্যাপারটা ভাবিয়ে তুলেছে ওকে। হাঁটতে হাঁটতে আবার একটা পাথরের বেদী দেখতে পেল। আগের জোড়া পাথরের বিছানার মতই। এখানেও শোয়া বা বসা যায়। ফারুক পাথরের ওপর হাত রাখল। ধুলোর মত কিছু একটা লাগল হাতে। টর্চের আলো ফেলে দেখল, ছাই। গন্ধ শুঁকে বুঝতে পারল, সিগারেটের। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে কেউ এখানে

বসে সিগারেট খেয়েছে। এরপর পাওয়া গেল একটা বুলেটের খোল। অত্যাধুনিক রাইফেলে ব্যবহৃত হয় এ-বুলেট।

পানির মত পরিষ্কার হয়ে গেছে সব। আর এক মুহূর্তও দেরি করা চলবে না। সঙ্গে রয়েছে তারানা। কোন ঝুঁকি নেয়া চলবে না। এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। ফিরে যেতে হবে ক্যাম্পে। তারপর অপেক্ষা। প্রেসিডেন্টের সাহায্য এসে পৌঁছুলে শুরু করতে হবে অ্যাকশন। এলাকাটা ঘিরে ফেলতে হবে।

শত্রুপক্ষ দুর্বল নয়, ফারুক নিশ্চিত জানে। খুব সহজে হার স্বীকার করবে না ওরা। কিন্তু ড. আবুল হাশিমের আত্মত্যাগ বৃথা যেতে দিতে পারে না ফারুক। পরাজিত মুখ নিয়ে ফিরে যেতে পারে না প্রেসিডেন্টের কাছে।

ফারুক বুঝতে পেরেছে, বঙ্গোপসাগরের জলদস্যুদের সাহায্য নিয়ে দেশীয় দুষ্কৃতকারীরা ঘাঁটি স্থাপন করেছে এখানে। এই ধ্বংসস্তূপগুলোর আড়ালে কোথাও লুকানো আছে অস্ত্র।

অতীতের অনেক বিচ্ছিন্ন, টুকরো টুকরো ঘটনার মিল খুঁজে পাচ্ছে ফারুক। এখানে দুর্গ গড়ে তুলছে ওরা। এখান থেকেই ডাকাতদলের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়া হয়। সময় আর সুযোগ পেলেই তারা হামলা করে জাহাজগুলোর ওপর। যাত্রীদের সর্বস্ব কেড়ে নেয়। তা ছাড়া আছে চোরাচালান। গভীর সাগরে এসে পৌঁছয় চোরাই মালবাহী থাই, বর্মী আর অন্যান্য বিদেশী জাহাজ। এরা সেই মালামাল নিয়ে আসে দেশের ভিতরে। বিজনপুরের ধ্বংসাবশেষকে গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। তারপর সেগুলো চালান দেয়া হয় দেশের অন্যান্য জায়গায়।

তারানাকে ডাকার জন্যে উঠে দাঁড়াল ফারুক। দাঁড়িয়েই বুঝতে পারল, দেরি হয়ে গেছে।

নিচু স্বরে পরিষ্কারভাবে নির্দেশ ভেসে এল অন্ধকার থেকে। 'হাতে যা আছে, ফেলে দাও। তারপর আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়াও।'

ফারুকের মনে হলো, ওর শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা স্রোত ওপর দিকে উঠছে। অসাড় হয়ে আসছে হাত-পা।

কথা বলল অপরিচিত কণ্ঠ, 'খবরদার! চালাকির চেষ্টা করবে না। তার চেয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত আমাকে সাহায্য করো। আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে চাই তোমাকে।'

দশ

ফারুককে অবাক করে দেবে ভেবেছিল তারানা। লোহার মই বেয়ে নিচে নেমে ওর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। পুরানো রেজারভয়ার এখন অস্ত্রাগার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তারানা বুঝতে পেরেছে। ভাবল, জায়গাটা আগে ভাল করে দেখে নেবে, তারপর ফারুককে ডাকবে। বিজনপুরের আসল রহস্য ফাঁস হয়ে গেছে। এই অস্ত্রাগার আবিষ্কারের জন্যেই প্রাণ হারিয়েছেন নিরীহ জ্ঞান সাধক ড. আবুল হাশিম। বাবার কথা মনে পড়ছে তারানার। একটুও ভয় করছে না আর। মনে হচ্ছে

না, বাবার মতই নৃশংস পরিণতি হতে পারে ওদেরও। চারদিকের দেয়াল পরীক্ষা করল তারানা। কয়েক জায়গায় ফাটল ধরেছে। এক কোণ থেকে দুটো সুড়ঙ্গ বেরিয়ে গেছে। কে জানে, কতদূর গেছে ওগুলো!

ফারুককে সুড়ঙ্গগুলো দেখানোর জন্যে তারানা অস্থির হয়ে উঠল। এমন সময় অপরিচিত স্বর শুনে থমকে দাঁড়াল দেয়াল ঘেঁষে। দেয়ালের ওপাশে ফারুক, জানে তারানা।

মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। ফারুক এই রকম কিছু একটা আশঙ্কা করেছিল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চেয়েছে ও। তারানার অতি উৎসাহ বিপর্যয় ডেকে এনেছে। রাগে-দুঃখে কান্না পেল তারানার। অপরিচিত লোকটার পরের কথাগুলো শোনার জন্যে কান পাতল ও।

লোকটা চড়া মেজাজে বলল 'ঘুরে দাঁড়াও। কথা কানে যাচ্ছে না?'

ফারুক ঘুরে দাঁড়াল। যাদের খোঁজে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাঙ্গায় এসেছে, তাদের দেখা পেল। আপাতত ওরা সংখ্যায় দু'জন। হয়তো আরও আছে কাছাকাছি কোথাও, ডাক শুনেই ছুটে আসবে। ফারুকের হাত পকেটের কাছে চুলবুল করছে। রিভলভারটা বার করে আনতে পারলেই শক্তির ভারসাম্য হয়ে যাবে। কিন্তু সে-সুযোগ পাওয়া গেল না। ট্রিগারের ওপর আঙুল চেপে ধরে লোকটা বলল, 'পকেটের কাছ থেকে হাত সরাও। নইলে ওই হাত সারাজীবনের জন্যে অকেজো করে দেব। সরে এসো ওখান থেকে।'

রিভলভারওয়ালা লোকটার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা লোক। তার হাতে টর্চ আর একটা লাঠি। মুখে একমুঠো দাড়ি। চোখে রাজ্যের রাগ। যেন পারলে এখুনি ফারুককে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত।

তারানার কথা ভেবে অস্থির হয়ে উঠল ফারুক। সাহস করে যদি ও রেজারভয়ার থেকে বেরিয়ে আসে, তা হলেই ঘটবে বিপদ। বরং সাড়া-শব্দ না করে লুকিয়ে থাকলে এ-যাত্রা বেঁচে যাবে। যতদূর মনে হয়, ওর কথা জানে না লোকগুলো।

রিভলভারওয়ালা সঙ্গীকে ইঙ্গিত করল। সঙ্গী ফারুকের পেছনে দাঁড়িয়ে পকেটগুলো সার্চ করল। রিভলভারটা বার করে আনার সময় সজোরে খোঁচা দিল তলপেটে। ব্যথায় সামনের দিকে নুয়ে পড়ল ফারুক। দাড়িওয়ালা লোকটা ম্যাগাজিন পরীক্ষা করে হাসিমুখে পকেটে পুরল রিভলভার। ফারুক আড়চোখে তাকিয়ে রইল। মায়া হচ্ছে অস্ত্রটার জন্যে। অনেক দিনের সঙ্গী ওটা।

'এদিকে তাকাও,' আদেশ করল রিভলভারওয়ালা।

ফারুক রেজারভয়ারের ওপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে ফিরে তাকাল। তারানার কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বাইরের শব্দ ওর কানে পৌঁছচ্ছে কিনা তা-ও বোঝা যাচ্ছে না।

লোকটা অশ্রাব্য একটা গালি দিয়ে বলল, 'এখানে কী করছিলে?'

ফারুক লোকটার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

'কথা বলো মিয়া,' চেঁচিয়ে বলল লোকটা, 'বাংলা কথা বোঝো না?'

ফারুক বলল, 'শিকারের খোঁজে এসেছিলাম··· এখানে···এসব···পুরানো জমিদার বাড়ি আছে, জানতাম না। ভাবলাম, দেখে যাই, আর কি! দোষের কিছু করিনি নিশ্চয়ই।'

'দোষ করেছ কি না, কী করে বুঝব? কে তুমি?'

'আমার নাম আনোয়ার ফারুক।'

'ব্যস! তাতেই হয়ে গেল?' আবার একটা অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করে লোকটা বলল, 'মিশরের রাজা ফারুক নাকি তুমি, যে নাম বললেই আমি চিনব?'

ফারুক হাসল। 'অপরাধ নেবেন না। আমি কী করে জানব, এখানে আলাদা রাজা, আলাদা রাজত্ব আছে? ছোটকাল থেকে শুনে এসেছি, সুন্দরবনের রাজা বাঘ। রয়েল বেঙ্গল টাইগার।'

'বাজে কথা বন্ধ করো। পরিচয় দাও।'

'আমি একজন ট্র্যাভ্‌ল্ গাইড। যারা দূর-দূরান্ত থেকে সুন্দরবনে বেড়াতে আসে, ওদের গাইড করে নিয়ে আসি, আবার ফিরে যাই। এবারও পেশাগত কাজে এসেছিলাম কাঙ্গায়। ফেরার সময় ঝড়ের মুখে পড়ে সব হারিয়েছি।'

সহানুভূতির আশায় লোকগুলোর দিকে তাকাল ফারুক। কিন্তু কারও চোখে তেমন কোন চিহ্ন দেখা গেল না।

রিভলভারওয়ালা বলল, 'নিজে তো বহাল তবিয়তে আছ দেখছি! ঢুকেছ আবার একটা নিষিদ্ধ এলাকায়! খুব সাহস দেখছি তোমার।'

অকম্পিত হাতে ফারুকের মাথার দিকে রিভলভার তাক করে আছে লোকটা। অ্যামেচার নয়, পাকা বন্দুকবাজ সে, ফারুক বুঝতে পারছে। একে কাবু করা কঠিন হবে।

'দেখুন,' গলা পরিষ্কার করে ফারুক বলল, 'আমি খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে ঢুকিনি। ভাবলাম, নতুন জায়গাটা যদি ট্যুরিস্টদের দেখাতে পারি, কিছু পয়সা বানাতে পারব। অবশ্য, এখন দেখছি এর মালিক আছে। তাঁদের যদি আপত্তি থাকে···'

রিভলভারওয়ালা ফারুকের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, 'কথাটা বিশ্বাসযোগ্য হয়, আলু মিয়া?'

আলু মিয়া তীক্ষ্ণ চোখে ফারুকের দিকে তাকাল। 'এত সহজে লোকের কথায় বিশ্বাস করলে চাকরি থাকবে না, ক্যাপ্টেন সাহেব। এই মিয়া, তোমার সঙ্গে কে কে আছে?'

ফারুক বিনীত, কিন্তু একটু উঁচু স্বরে বলল, 'আমি একাই।'

মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগল ফারুক, তারানা যেন ওর কথাগুলো ঠিকমত শুনতে পায় আর সেগুলো মিথ্যে প্রতিপন্ন করে ছুটে না আসে।

হো হো করে হেসে উঠল ক্যাপ্টেন। 'এই দুর্গম জঙ্গলে একা ঢুকেছ!'

ক্যাপ্টেন আড়চোখে সহকারীর দিকে তাকাল। আলু মিয়া নিচু স্বরে কথা বলছে। প্রথমদিকে ফারুক কিছুই বুঝতে পারল না। শেষের কয়েকটা কথা ওর কানে এল।

'...বদ্রিনাথের গ্রুপের ডিউটি ছিল ওখানে। ঝড়ের সময় পালিয়েছে।'

ক্যাপ্টেন থামিয়ে দিল আলু মিয়াকে। ফারুককে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি একা ছিলে, বলতে চাও?'

'মোটেই না,' স্বাভাবিক সুরে ফারুক বলল, 'ছ'জন ছিলাম আমরা। একা একা কেউ সুন্দরবনে আসে না। জলোচ্ছ্বাসের সময় নৌকা উল্টে যায় আমাদের। সঙ্গীদের খুঁজে পাইনি।'

'তা হলে একা একা শিকার করতে বেরিয়েছ কোন্ সাহসে?'

'ভাবলাম...চর নিহালের দিকে যাব...পথে যদি দু'একটা...'

বাধা দিয়ে আলু মিয়া বলল, 'এ পুলিশের লোক নয় তো, ক্যাপ্টেন সাহেব?'

ক্যাপ্টেন বলল, 'আশেপাশে ঘুরে এসো। দেখো, সন্দেহজনক কিছু পাও কি না।'

আলু মিয়া মুখ ব্যাজার করে চলে গেল। ফারুক ক্যাপ্টেনের ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করে। 'এখানে...যাই বলেন...মানুষের দেখা পাব, ভাবতে পারিনি। একটা উপকার করুন না! বেরোবার পথটা দেখিয়ে দিন।'

ক্যাপ্টেনের চোখে কৌতুক। 'কেন, ট্যুরিস্ট স্পট বানানোর সাধ মিটে গেল? পয়সা কামাতে চাও না?'

আলু মিয়া ফিরে এল কিছুক্ষণের মধ্যেই। 'না, ক্যাপ্টেন সাহেব। আশেপাশে কোথাও কিছু নেই।'

'তুমি এখন দড়ি দিয়ে বাঁধবে ওকে। ওর কাছ থেকে কথা বের করতে হবে। চলো, আস্তানায় যাই। ফারুক মিয়া, আগে হাঁটো। ধান্দা কোরো না যেন। কাজ হবে না। এখান থেকে বেরুনো খুব কঠিন কাজ।'

তারানার মনে হচ্ছিল, ওর শরীর দেয়ালের পাথরের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। নড়াচড়ার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে। রেজারভয়ারের বাইরে অপরিচিত স্বরের প্রথম কথাটা এখনও ওর কানে বাজছে। 'খবরদার! চালাকির চেষ্টা করবে না। তার চেয়ে লক্ষ্মী ছেলের মত আমাকে সাহায্য করো। আরও কিছুক্ষণ বাঁচিয়ে রাখতে চাই তোমাকে।'

প্রত্যেকটা কথা শুনতে পেয়েছে তারানা। বেরিয়ে ফারুকের পাশে দাঁড়ানোর তাগিদ অনুভব করেছে। মই বেয়ে উঠতেও শুরু করেছে। এমন সময় ফারুকের কথাগুলো শুনতে পেয়েছে। 'আমি একাই।'

পা অসাড় হয়ে এল। চুপচাপ নেমে গেল তারানা লোহার মই বেয়ে। দাঁড়িয়ে রইল দেয়াল ঘেঁষে রেজারভয়ারের এক কোনায়। এরপর যা একটা শব্দ শুনল, তাতে ওর পাকস্থলীর ভেতর মোচড় দিয়ে উঠল। মুখ থেকে সরে গেল রক্ত। লাঠির বাড়ি মারা হয়েছে ফারুকের শরীরে। চাপা আর্তনাদ করে উঠল ফারুক।

ক্যাপ্টেন বলল, 'তুমি একা। নিরস্ত্র। আমরা দু'জন। আমাদের হাতে অস্ত্র। বোকামি না করে হাঁটতে থাকো।'

তারানা মই বেয়ে উঠে দেখতে চেষ্টা করল। কিন্তু মনে হলো, ওর শরীরও

যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছে কেউ। ফারুককে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ওরা? রাগে, দুঃখে কান্না পাচ্ছে তারানার। বিজনপুরের সন্ধানে এসে শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারাবে ফারুক! তারানা নিজের বিপদের কথা ভাবার অবকাশ পাচ্ছে না। ভাবছে ফারুকের কথা। তারানার অনুরোধে বিজনপুর অভিযানে রাজি হয়েছিল ফারুক। এখন নিজেকে কী বলে সান্ত্বনা দেবে তারানা?

ক্যাম্পে ফিরে যাওয়া, সঙ্গীদের একত্র করা, এসব তো পরের কথা! এখান থেকে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই হয়তো ধরা পড়ে যাবে সে-ও। তারপর কী হবে, তারানা ভাবতে পারে না। সারা শরীর কাঁপছে। দাঁড়িয়ে থাকাটাও কষ্টকর হয়ে উঠেছে। আস্তে আস্তে মাটিতে বসে পড়ল তারানা।

শক্ত হতে হবে। তারানা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। সুড়ঙ্গের দিকে তাকাল। কতদূরে গেছে সুড়ঙ্গ? একটা চান্স নিয়ে দেখতে চায় তারানা। ধ্বংসাবশেষ এলাকার মধ্যেই কোথাও গিয়ে শেষ হয়েছে সুড়ঙ্গ। এমনও হতে পারে, ফারুককে যেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানেই গিয়ে পৌঁছবে তারানা। চেষ্টা করা ছাড়া বাঁচার আর কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না। এক হাতে ছুরি আর অন্য হাতে টর্চ নিয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে পড়ল সে।

বিজনপুরের শেষ প্রান্তে ক্যাপ্টেনের ক্যাম্প। ফারুককে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো। একটা পড়োবাড়ির ভিতরে কয়েকশো কিংবা হাজার বছরের আবর্জনার স্তূপ সরিয়ে থাকার জায়গা করে নিয়েছে ক্যাপ্টেন আর তার সহকারী। এক কোণে হারিকেন বাতি জ্বলছে। চারদিকে গা-ছমছম-করা ভাব।

আলু মিয়া বাতিটা উস্কে দিল। আলো আরও একটু উজ্জ্বল হলো, কিন্তু আশেপাশের অন্ধকার হয়ে উঠল আরও জমাট। ঘরের পেছনদিকে আরও একটা ভারী পাল্লার দরজা। বাইরে থেকে বন্ধ থাকে সেটা। ওই দরজার পাশে একটা গোলাকার পিলার। তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো ফারুককে।

ফারুক চেয়ে দেখল, লোকদুটো তার সামনে বসে খাবার খেলো। ক্যানের মুখ খুলে দুধ ঢালল গলায়। আড়চোখে ফারুকের দিকে তাকিয়ে রসিকতা করল।

পিঠে শক্ত লাঠির বাড়ি খেয়ে ফারুকের শরীরটা অবশ হয়ে এসেছিল। তারানার চিন্তা ওকে আরও দুর্বল করে দিচ্ছে। রেজারভয়ারের ভিতর থেকে উঠে পথ চিনে পালাতে পারবে সে? পৌঁছতে পারবে ক্যাম্পে? ধরা পড়বে না তো দুষ্কৃতকারী কিংবা আদিবাসীদের হাতে?

নিজের শরীরের দিকে তাকাল ফারুক। মোটা দড়ি দিয়ে পেঁচিয়ে পিলারের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে ওকে। দড়ি ওর মাংসপেশি গেঁথে বসেছে, যন্ত্রণা হচ্ছে সারা শরীরে। লোক দুটোর অন্যমনস্কতার সুযোগে শরীর মোচড়ানোর চেষ্টা করে দেখল। লাভ কিছুই হলো না। শুধু যন্ত্রণাটা বাড়ল।

কিছু করার নেই! অবসাদ নামছে সারা শরীরে। তারানা যদি কোনরকমে পালাতে পারে…পৌঁছতে পারে ক্যাম্পে…যদি সঙ্গীদের পেয়ে যায়…আর প্রেসিডেন্টের নতুন সাহায্য নিয়ে ফরিদ…

এসব আকাশকুসুম ভেবে লাভ নেই। বিজনপুর থেকে বার হবার আগে অথবা পরে লোকগুলোর হাতে ধরা পড়বে তারানা। তারপর···ভাবতে পারছে না ফারুক।

তারানাও আশা ছেড়ে দিয়েছে। সুড়ঙ্গটা এক গোলক ধাঁধার মত মনে হচ্ছে। কিছুদূর গিয়ে হয় পথ হারিয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে, না হয় ফিরে আসছে আগের জায়গায়।

রেজারভয়ারে ফিরে এসে তারানা চারদিকে তাকাল ভালভাবে। দ্বিতীয় সুড়ঙ্গটা চলে গেছে বিজনপুরের প্রবেশ পথের দিকে, অর্থাৎ, ফারুককে যেদিকে নিয়ে গেছে ওরা, তার বিপরীত দিকে। ওদিকে গিয়ে লাভ নেই, তবু কি ভেবে ওই সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল তারানা। তারপর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করল, ওখান থেকে একটা শাখা বেরিয়ে গেছে বিপরীত দিকে। শাখা সুড়ঙ্গে পা দিল তারানা।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই দেখল, সুড়ঙ্গ শেষ হয়ে গেছে। সামনে পাথরের স্তূপ। হতাশায় ভেঙে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে পাথরের স্তূপের ফাঁকে সিঁড়ি চোখে পড়ল। খুব সাবধানে কয়েকটা পাথর সরিয়ে শরীর গলিয়ে দিল। সিঁড়িতে উঠল তারানা। পা টিপে টিপে উঠে এল ওপরে। সিঁড়ির মুখে অজস্র ডালপালা। সেগুলো সরিয়ে মুক্ত বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিল তারানা। আকাশ পানে তাকাল। তারায় ঝলমল করছে আকাশ। কাছে, দূরে ডাকছে রাতজাগা পাখি। আর কোন শব্দ নেই। সাড়া নেই মানুষের। ফারুককে কোথায় নিয়ে গেল ওরা?

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে তারানা একা হেঁটে চলল দূরের একটা আলো লক্ষ করে। ওর কোন ধারণা ছিল না নিজের সম্পর্কে। কে জানে, কোত্থেকে পেল এত সাহস! টর্চ লাইট জ্বালাতে সাহস হচ্ছে না। ফারুক কাছাকাছি কোথাও আছে, ওর মন বলছে। ওই জায়গাটায় পৌঁছতে চায় ও, সবার অগোচরে, নিঃশব্দে। ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

যা ভেবেছিল! ঘুরপথে বিজনপুরের ধ্বংসাবশেষের কাছেই আবার এসে পৌঁছেছে তারানা। এখানেও একটা সুড়ঙ্গ আছে। সুড়ঙ্গের মুখে একটা ভাঙা-চোরা বাড়ি। দেয়াল ফুঁড়ে উঠেছে হাজার গাছপালা। বাইরে থেকে ঝোপ ছাড়া অন্য কিছু মনে হয় না।

বাড়ির ভিতর আলো জ্বলছে। তারানা ছুরির সাহায্যে সাবধানে লতাপাতা আর ঝোপঝাড় কেটে পথ করে পড়োবাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। চোখ রাখল দেয়ালের ফুটোয়।

ফারুক। আনন্দে ভেসে যেতে ইচ্ছে হলো তারানার। খুবই কষ্টে আছে ফারুক। শক্ত, মোটা দড়ি দিয়ে ওকে বেঁধে রাখা হয়েছে ইটের থামের সঙ্গে। ঘুমে ঢলে পড়ছে বেচারা। কিন্তু ঘুমাতে পারছে না। তবে ও বেঁচে আছে, সুস্থ আছে। এর চেয়ে বড় আনন্দ এ-মুহূর্তে আর কী হতে পারে? তারানা মনে মনে চুমু খেলো ওকে। নিঃশব্দে বলল, 'আমি এখানে, ফারুক। তোমার কাছ থেকে মাত্র পাঁচ গজ দূরে। একটু সবুর করো। তোমাকে মুক্ত করব আমি।'

ঘরটা বিজনপুরের অন্য এক প্রবেশ পথ। এখানেই ক্যাম্প করেছে বিজনপুরের বর্তমান কোটাল, ক্যাপ্টেন বলে সহকারী আলু মিয়া ডাকছিল যাকে। অদ্ভুত সব নাম! তারানা নিশ্চিত, এগুলো ওদের আসল নাম নয়। অপরাধীদের ছদ্মনাম থাকে।

দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে লোকগুলো। কে ক্যাপ্টেন সাহেব আর কে আলু মিয়া, জানে না তারানা। একটু অপেক্ষা করতেই বুঝতে পারল। ফারুককে বন্দি করার সময় ওরা বেশ উঁচু স্বরে কথা বলছিল। সবই শুনেছে তারানা। ওদের কথা শুনে লোকগুলোকে চিনে ফেলল ও। মোটা, বেঁটে মতন লোকটার নাম ক্যাপ্টেন। লম্বা, রোগা, দাড়িওয়ালা লোকটা তার সহকারী। নাম আলু মিয়া।

'এরাই বাবার হত্যাকারী!' মনে মনে বলল তারানা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রমাণ পেল। ফারুককে সকাল পর্যন্ত আটকে রাখার ব্যাপারে ওদের দ্বিমত নেই। কিন্তু মতের মিল দেখা দিয়েছে কাল ওকে নিয়ে কি করা হবে, তাই নিয়ে।

'বেত্রাকোলের লীডারদের অপেক্ষায় থেকে লাভ নেই, আলু মিয়া। একটা লোককে "খরচা" করার জন্যে আমরাই যথেষ্ট, কি বলো?'

আলু মিয়া আপত্তি জানাল। 'না, নিজেদের ঘাড়ে এত দায়িত্ব নেয়া ঠিক না। আগের কেসটার ধাক্কা এখনও সামলাতে পারিনি আমরা।'

তারানার রক্তে স্রোত বইতে শুরু করেছে। ইচ্ছে হচ্ছে রিভলভার কেড়ে নিয়ে ওদের বুকে একটার পর একটা গুলি ছুঁড়তে···যতক্ষণ না মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওরা। 'আগের কেসটা' কি, বুঝতে বাকি নেই তারানার।

ফারুকের দিকে তাকিয়ে সে মাথা ঠাণ্ডা করল। আগে ওকে মুক্ত করতে হবে। সময় আর সুযোগ পাওয়া যাবেই। তখন প্রতিশোধ নিতে একটুও দেরি করবে না তারানা।

ক্যাপ্টেন বিরক্তির সঙ্গে বলল, 'কেন, সবই তো চুকেবুকে গেছে!'

'না, ক্যাপ্টেন সাহেব। শুনলাম সরকারের উঁচু মহলে ব্যাপারটা নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে। আর্মি ইন্টেলিজেন্স এর তদন্ত করবে। প্রেসিডেন্ট এরফান নিজে "টেক আপ" করেছেন কেসটা। তা ছাড়া "নেংটি"-র ব্যাপারটাও পুলিশ ভোলেনি। এখনও লাশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

হাসল ক্যাপ্টেন। 'দূর! কোত্থেকে শুনেছ এসব বাজে কথা?'

'বেত্রাকোলে ওরা বলাবলি করছিল।'

'তাহলে তুমি চাও ওকে এমনি ছেড়ে দিতে?'

'না, তা-ও চাই না। আমি চাই আরও দু'এক দিন আটকে রাখতে। বেত্রাকোল থেকে আমাদের লোক আসবে কাল। ওদের ফেরত পাঠাতে চাই বেত্রাকোলে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। পরের চালান আসার আগেই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কারণ···'

সহকারীর পেটে ঘুসি মারল ক্যাপ্টেন। 'অনেক বেশি কথা বলে ফেলেছ, মিয়া। মুখ সামলাও।'

গাঁই গুঁই করল আলু মিয়া। 'ও ব্যাটার···অবস্থা কাহিল।··· কিছু শুনতে পাচ্ছে

না।'

তারানা লক্ষ করল, সত্যিই শুনতে পাচ্ছে না ফারুক। ওর সারা শরীর বেদনায় অবশ হয়ে গেছে। ঘুমিয়ে না অজ্ঞান হয়ে গেছে, বোঝা যাচ্ছে না।

আরও আধঘণ্টা কাটল। কথাবার্তা বন্ধ করে ঘুমিয়ে পড়ল লোকগুলো। তারানা পা টিপে টিপে চলে এল ঘরের পেছন দিকে। ফারুকের পাশের দরজাটা বাইরে থেকে শক্ত কাঠের খিল দিয়ে বন্ধ করে রেখেছে ওরা। কপাটের মাঝ বরাবর খিলের ওপর ছুরি চালাল তারানা। একটু একটু করে কাটতে লাগল। এতটুকু শব্দ হলেই বিপদ হতে পারে। পুরো এক ঘণ্টা লাগল খিল কেটে দু'ভাগ করতে।

কিন্তু তারপরও দরজা খোলা গেল না দেখে চিন্তায় পড়ল তারানা। ঘুরে সামনের দিকে চলে এল। দেয়ালের ফাটলে চোখ রেখে তাকাল দরজার দিকে। ছোট একটা হুড়কো লাগানো আছে ভিতরের দিকে। এইসব ছোটখাট জিনিস বিপদের সময় মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

জঙ্গলের ভিতর ছুটল তারানা। সরু, লম্বা ডাল জোগাড় করল। ফিরে এসে ডালটা ঢুকিয়ে দিল ফাঁক দিয়ে। হাত কাঁপছে থরথর করে। ডালটা যে-কোন মুহূর্তে হাত ফস্কে পড়ে যেতে পারে লোকগুলোর গায়ে। সব কষ্ট মিছে হয়ে যাবে। ধূলিসাৎ হয়ে যাবে ফারুককে মুক্ত করার স্বপ্ন, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সংকল্প। তারানা দু'হাতে শক্ত করে ডালটা ধরে রেখে বিশ্রাম নিল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর শক্তি সঞ্চয় করে আবার ঠেলে ঢোকাতে লাগল ডালটা। আর একটু···আর একটু···

হুড়কোর প্রান্তে ঠেলা দিতেই খুলে গেল হুড়কো। ডাল সরিয়ে আনল তারানা। ঘুরে দরজার কাছে চলে এল আবার। আস্তে ধাক্কা দিল কপাটে। খুলে গেল দরজা।

ফারুক চোখ মেলল। 'নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর মুখে। তারানা ওর নিঃশ্বাসের আওতায় এসে দাঁড়িয়েছে। বেচারির চোখের কোণে কালি; কাঁপছে সারা শরীর। দড়ির দিকে ইঙ্গিত করল ফারুক। তারানা ছুরি বসাল দড়ির ওপর। প্রথমে ডান হাতটা বন্ধনমুক্ত করল। ফারুক ছুরিটা নিজের হাতে নিয়ে বাকিটুকু কাটল নিজেই। তারপর দড়িগুলো সরিয়ে রেখে তারানাকে জাপটে ধরল বুকের সঙ্গে। বেরিয়ে এল ওরা।

রেজারভয়ারে পৌঁছে তারানা মই বেয়ে ওপরে উঠল। ক্যাপ্টেন বা তার সহকারীর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় কিনা দেখার জন্যে। ফারুক নিচে টর্চের আলোয় দেখে নিচ্ছে জায়গাটা। আরও একটা বুলেট কুড়িয়ে পেল সে। কিছুদূর এগোতেই পেল আরও একটা।

চাপা স্বরে বলে উঠল ফারুক, 'আরও···আরও আছে এখানে।'

তারানা নেমে এল নিচে। 'কী?'

'অস্ত্র। গোলা-বারুদ।'

তারানা কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলল।

রেজারভয়ারের নিচের অংশে রাইফেল আর গুলির বাকস সারি সারি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একটা বাকস নামিয়ে খুলে ফেলল ফারুক। চমকে উঠল দু'জনেই। একটা কঙ্কাল। হাতে এখনও বালা ঝুলছে। বাকসের নিচে পড়ে আছে জট-বাঁধা চুল।

তারানা আর একটু হলেই চিৎকার করে উঠেছিল। ফারুক ওকে জাপটে ধরে মুখে হাত চাপা দিল। তারানা ফারুকের বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত বারবার বলতে লাগল, 'নেংটি! নেংটি!'

ওকে স্থির হবার জন্যে সময় দিল ফারুক। মাথায়, পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। তারপর বলল, 'নেংটি কি, তারানা?'

'ওরা···ওরা··খুন করেছে এই আদিবাসীকে। নাম উচ্চারণ না করে বলছিল নেংটি। বাবা···বাবাকেও···ওরাই খুন করেছে। শোধ না নিয়ে আমি ফিরে যাব না, ফারুক।'

ফারুক অনেকক্ষণ কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে রইল। তারানা ঠিকই শুনেছে। নিজে ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে দুঃখ হলো ফারুকের। নিশ্চয়ই অনেক কথা বলাবলি করেছে লোকগুলো! কিন্তু মিলে যাচ্ছে সব। ড. আবুল হাশিমকেও খুন করেছে ওরা, কোন ভুল নেই। ড. হাশিম প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করতে এসে ওদের অস্ত্রাগার কিংবা চৌরাই মালপত্রের আমদানি-রপ্তানি দেখে ফেলেছিলেন। হয়তো এ ধরনের কোন কারণে প্রাণ হারিয়েছে ওই আদিবাসী।

কঙ্কালের বাকস আলাদা করে সরিয়ে রাখল ফারুক। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ওপরে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে চিহ্ন বসাল।

'চলো তারানা, বেরিয়ে পড়ি।'

'না!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল তারানা, 'ওরা আমার বাবাকে খুন করেছে!'

ফারুক বলল, 'জঙ্গলে জংলী আইনে অপরাধীর বিচার হয়। ক্যাপ্টেন সাহেব আর আলু মিয়ার বিচার হবে জংলী আইনে। আমাদের কাজ শুধু নিরাপদে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া আর মজা দেখা।'

প্রথম সুড়ঙ্গের মুখে চলে এল ওরা। ফরসা হয়ে উঠেছে আকাশ।

'তোমার ম্যাপ অনুসারে এবার কোনদিকে, দেবী?'

তারানা ডানদিকে পা বাড়াল। তারপর বাঁ-দিকে ঘুরতেই মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। ফারুক তারানার কাঁধে হাত রেখে অভয় দিল। তবু কাঁপতে লাগল তারানা।

ত্রিশজন সশস্ত্র আদিবাসীর একটা দল ঘিরে ফেলেছে ওদের। প্রত্যেকের হাতে আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। ট্রিগারে হাত রেখে নল তাক করেছে ওদের দিকে। এক পলকেই চিনতে পারল ফারুক। রেজারভয়ারের নিচের ভাণ্ডার থেকে সরবরাহ করা হয়েছে ওগুলো।

স্থানীয় ভাষায় চেঁচিয়ে উঠল ফারুক, 'একটু দাঁড়াও। কেন মারতে চাও আমাদের?'

'তোমরা দুশমন,' উত্তর দিল ওদের নেতা, 'তোমাদের আমরা বিশ্বাস

করেছিলাম।'

তারানা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

ফারুক বলল, 'বিশ্বাস হারানোর মত কী করেছি আমরা?'

'তোমরা আমাদের দেবতার গুহায় ঢুকে পড়েছ।'

'কে বলল?'

'ক্যাপ্টেন সাহেব। একটু আগে লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছে। ওরা নিজেরা ভিতরে ঢুকেছে তোমাকে খুঁজতে। তুমি আমাদের ধাপ্পা দিয়েছ। বলেছ, সিনেমার শুটিং-এর কাজে কাঙ্গায় এসেছ। ওদেরও ধাপ্পা দিয়েছ।'

তারানা সম্ভাব্য বিপদের কথা আঁচ করে ফারুককে আঁকড়ে ধরে চোখ বুজল।

ফারুক চেঁচিয়ে বলল, 'দাঁড়াও। গুলি করে মারতে চাও, মারো। কিন্তু আমার শেষ কথাটা শোনো। অনেকদিন আগে তোমাদের একটা লোক গুম হয়েছিল।'

'হ্যাঁ,' অবাক হয়ে বলল দলনেতা, 'আমার ছোটভাই। দেবতা স্বর্গে নিয়ে গেছে ওকে। কেউ ওর লাশ দেখতে পায়নি।'

'আমি ওর লাশ দেখেছি। তোমাকেও দেখাতে পারি।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

ফারুক ক্লান্ত স্বরে বলল, 'ঠিক আছে, বিশ্বাস করার দরকার নেই। সোজা ভিতরে চলে যাও। কালীমূর্তি পার হয়ে তিনটে ভাঙা দালান পাবে। মাঝখানে একটা চৌবাচ্চার মত ঘর আছে। ওপরের ছিদ্র দিয়ে মই বেয়ে নামতে হয়। ভিতরে একটা দাগ-দেয়া বাকস আছে। দেখে এসো।'

নেতার মুখে চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল। তার ইঙ্গিত পেয়ে আট জন আদিবাসী ঢুকে পড়ল ভিতরে। বাইরে পঁচিশটা উদ্যত রাইফেলের মুখে ফারুক আর তারানার জীবন গাড়ির স্পীডোমিটারের কাঁটার মত নড়ছে।

'আর একটা কথা,' নীরবতা ভেঙে ফারুক বলল।

'বলো।'

'ড. আবুল হাশিম···ওই জোড়া সুন্দরী গাছের মাঝখানে যাঁর কবর,···তাঁর মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল, জানো?'

'কালী দেবীর অভিশাপে। দেব-দেবীর গুহায় ঢুকে পড়ার শাস্তি।'

ফারুক মাথা নাড়ল। 'না। ওটাই আসলে ধাপ্পা।'

'কী বলতে চাও তুমি?'

'ক্যাপ্টেন আর তার দোসর তোমাদের ভাঁওতা দিয়ে কাজ আদায় করে নিয়েছে। ওরা আমাদের দেশটা ধ্বংস করার জন্যে বিদেশ থেকে অস্ত্র আর চোরাই মাল আমদানি করে। মজুদ করে তোমাদের "দেবতার গুহায়" আর তোমাদের হাতে দু'চারটে অস্ত্র তুলে দিয়ে ওদের অস্ত্রাগার পাহারা দেয়ার কাজটা করিয়ে নেয় তোমাদের দিয়ে। তোমরা সরল, বোকা। দেবতার নামে বিভ্রান্ত হয়ে ওদের সেবা করে যাচ্ছ। যে যখনই ওদের গোপন রহস্য টের পেয়ে যায়, তখনই তাকে খুন করে ওরা। একই কারণে খুন হয়েছেন ড. আবুল হাশিম আর তোমার ভাই। আমাকেও খুন করতে চেষ্টা করেছিল।'

সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে প্রচণ্ড চিৎকার ভেসে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে এল দু'জন আদিবাসী। নেতাকে কঙ্কাল দেখার জন্য ডাক দিল ওরা।

বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে নেতা।

তারানা চেঁচিয়ে উঠল, 'ফারুক! ওই যে···ওই যে বাবার গলার সেই লকেট···আধখানা পয়সা···'

ফারুক আদিবাসীটিকে কাছে ডাকল। 'এটা কোথায় পেয়েছ?'

'ক্যাপ্টেন সাহেব যখন অস্ত্র বিলি করছিল, তখন গুদামের মেঝেতে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

তারানার গলা থেকে বাকি আধখানা পয়সা লাগানো লকেটটা উঁচু করে ধরল ফারুক। 'এই দেখ। এটা ড. আবুল হাশিমের লকেট। আধখানা ওঁর মেয়ের কাছে থাকে। বাকি আধখানা ছিল ওঁর কাছে। ক্যাপ্টেন ড. হাশিমকে খুন করে ওঁর লকেটটা লুকিয়ে রেখেছিল অস্ত্রাগারে। বিশ্বাস হচ্ছে?'

বিজনপুরের অপর প্রান্ত থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। ক্যাপ্টেন আর আলু মিয়া পালাতে চেষ্টা করেছিল। বাধা দিয়েছে ভিতরের আদিবাসীরা। গুলি করেছে ক্যাপ্টেন আর আলু মিয়া।

নেতা চেঁচিয়ে উঠল, 'ক্যাপ্টেন আর তার চেলাকে ধরা চাই, যেভাবেই হোক।'

তারানা ফারুককে আঁকড়ে ধরল। বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলল, 'বাবার হত্যাকারীদের শাস্তি আমি নিজের হাতে দিতে চেয়েছিলাম, ফারুক।'

ফারুক ওর কাঁধে হাত বুলিয়ে বলল, 'প্রকৃতির প্রতিশোধের ওপর হস্তক্ষেপ করতে নেই।'

বিজনপুরে গুলির শব্দ হবার পর ক্যাম্পের দিক থেকে গুলির শব্দ শোনা গেল। ফারুক আর তারানা দ্রুত পা চালাল ক্যাম্পের দিকে।

প্রেসিডেন্টের সাহায্য এসে পৌঁছেছে। বনদেবী-র জিনিসপত্র উদ্ধার করে এড়েঙ্গা থেকে ফিরে এসেছে মুজিবর আর মতি। চর নিহাল ফাঁড়ি থেকে দু'জন কনস্টেবল আর উদ্ধারকৃত মাহমুদকে নিয়ে মুরাদ আর খায়ের ক্যাম্পে ফিরে এসেছে।

বিশেষ বাহিনী ফারুক আর তারানার সঙ্গে পরামর্শ করে ছুটল বিজনপুরের দিকে।

'ফিরে যাবার আয়োজন করো, মুজিবর।'

নৌবাহিনীর গানবোটে মালপত্র তোলার কাজ শুরু হলো। সেটা শেষ হতেই বিজনপুর থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ফিরে এল বিশেষ দলটি। সঙ্গে ক্যাপ্টেন আর আলু মিয়া—আহত, রক্তাক্ত।

কাঙ্গায় উৎসব শুরু হয়ে যায়।

উপসংহার

হিরণ পয়েন্টে যাত্রাবিরতি।

জেটিতে ওদের স্বাগত জানালেন রফিক নওয়াজ, কামার ফরিদ আর আলাউদ্দিন। রফিক নওয়াজের মুখে হাসি নেই। তারানাকে দেখে ওঁর আরও বেশি করে ডোপাকে মনে পড়ছে।

বাড়ির ভিতরে গেল ওরা। আসিয়া তারানাকে জড়িয়ে ধরলেন। কেঁদে ফেলল তারানা। ফারুক বিব্রত মুখে পাশে দাঁড়াল।

'আমার একটা অনুরোধ রাখবেন, ভাই?' ছলছল চোখে বললেন আসিয়া, 'আমার পাগলী বোনটার আত্মা শান্তি পাবে।'

'বলুন।'

'বিয়ে করুন আপনারা।'

ফারুক কথা বলতে পারল না। তারানা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। রফিক নওয়াজ তারানার মাথায় সস্নেহে হাত রাখলেন।

'কাঙ্গা বিজয়ী বীরাঙ্গনাও বিয়ের কথায় লজ্জা পায়।'

এগিয়ে এল কামার ফরিদ। 'দায়িত্বটা আমাকে দিন। যাঁরা অনেক বড় দায়িত্ব পালন করে ক্লান্ত, এসব ছোটখাট কাজে তাঁদের আগ্রহ একটু কমই হবে।'

রফিক বললেন, 'তাহলে আপনি আর আলাউদ্দিন ভাগাভাগি করে নিন দায়িত্বটা। ঢাকায় তারানার ফুফুর সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি।'

নিজের কামরায় এসে কামার ফরিদ আলাউদ্দিনকে বলল, 'তুমি কি এখনও ফারুকের সম্মতির অপেক্ষায় আছ? যদি দৈবক্রমে ও "না" বলে বসে, তুমি একটা চান্স নেবে, তাই না?'

আলাউদ্দিন খেপে আগুন হলো। 'তোমার এত মাথাব্যথা কেন তার জন্যে? লাইনে তুমিও আছ নাকি?'

তারানা মুখে রুমাল গুঁজে পালিয়ে বাঁচল। ফারুকের বন্ধুদের খুব ভাল লেগেছে ওর।

ফরিদ বলল, 'তোমার জন্যে মস্ত সুখবর আছে, ফারুক। প্রেসিডেন্ট তোমাদের অভিনন্দন বার্তা পাঠিয়েছেন। তিনি তোমাকে ঢাকায় চলে যেতে বলেছেন। খুব সম্ভব একটা চাকরি পাচ্ছ তুমি।'

ফরিদ বলল, 'আমার এফ এণ্ড এফ লিমিটেডের কী হবে?'

'কী আবার হবে? আমি আসার আগে যেমন চলছিল, তেমন চলবে।'

আলাউদ্দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার হোটেলের বোর্ডার একজন কমল। সোজা ক্ষতি নয়।'

ফরিদ বলল, 'পেটে পেটে এত ঘটনা ছিল! বাইরে থেকে মনে হচ্ছিল, টিভি স্টারের ঝামেলা থেকে বাঁচতে চাও। সুমতি হলো কবে?'

ফারুক হাসল। কিছু বলল না।

ফারুকের পিঠে বিরাশি সিক্কার কিল বসিয়ে ফরিদ বলল, 'আলাউদ্দিন, তুমি আর দীর্ঘশ্বাস ফেলো না, ভাই। তোমার চান্স কোনদিনই ছিল না। তারানা হাশিমের নাটকের এ-পর্বের চিত্রনাট্য আগেই তৈরি হয়েছিল। আমরা শুধু পার্ট আউড়ে গেছি।'

ফারুক গিয়ে দাঁড়াল তারানার পাশে। তারানা ফারুকের কাঁধে মাথা রাখল।

'সত্যিই তুমি ঢাকায় ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

ফারুক বলল, 'তোমাকে ছাড়া জীবনের বাকি দিনগুলোর কথা ভাবতে পারছি না।'

তারানা ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। 'ফারুক, দুটো মৃত্যুর বিনিময়ে তোমাকে পেয়েছি। আমার জীবনে তোমার ভূমিকাটা অনুভব করতে পারো?'

'তা হলে নতুন জীবনে পা বাড়াই, চলো।'

ওদের সামনে আদিগন্ত নীল সাগরের প্রাণোচ্ছল জীবনের ডাক; পেছনে নিবিড় অরণ্যের গান।

তারানা উঠল। ফারুকের বুকে মাথা গুঁজে গানের সুরে বলল, 'শুনছি তোমার ডাকে জীবনই ডাকছে যেন···মরণের সীমানাটা ছাড়িয়ে···'

—ঃ শেষ ঃ—